কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

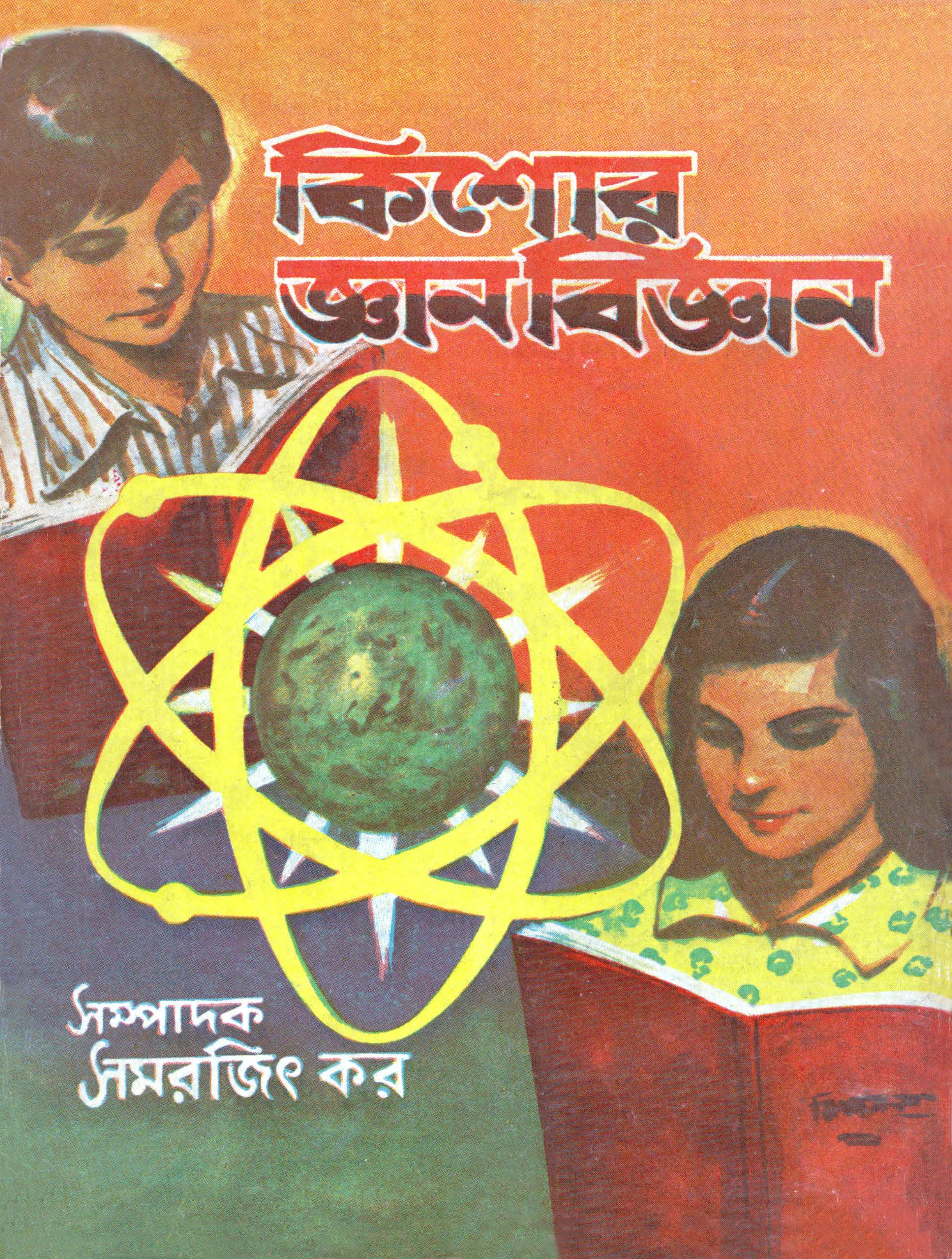

সম্পাদক
সমরজিৎ কর

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান

শৈব্যা

কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান

কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সম্পাদক : সমরজিৎ কর

কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান

সম্পাদক : সমরজিৎ কর

শৈব্যা □ প্রকাশন বিভাগ
৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট • কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

অলঙ্করণ □
সত্যজিৎ রায়
ধীরেন বল
বিমল দাস
দেবাশিষ দেব
পঞ্চানন মালাকর

প্রচ্ছদ □ ধীরেন বল

প্রকাশকাল ১৩৮৭

মূল্য □ পনের টাকা মাত্র

প্রকাশক □ রবীন বল
শৈব্যা • প্রকাশন বিভাগ
৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩

মুদ্রাকর □
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন কলকাতা
নিউ মানস প্রিন্টিং
১বি গোয়াবাগান স্ট্রীট কলকাতা
তাপসী প্রিন্টার্স
৬ শিবু বিশ্বাস লেন কলকাতা
সাধনা প্রেস প্রাঃ লিমিটেড
৭৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলকাতা ১২

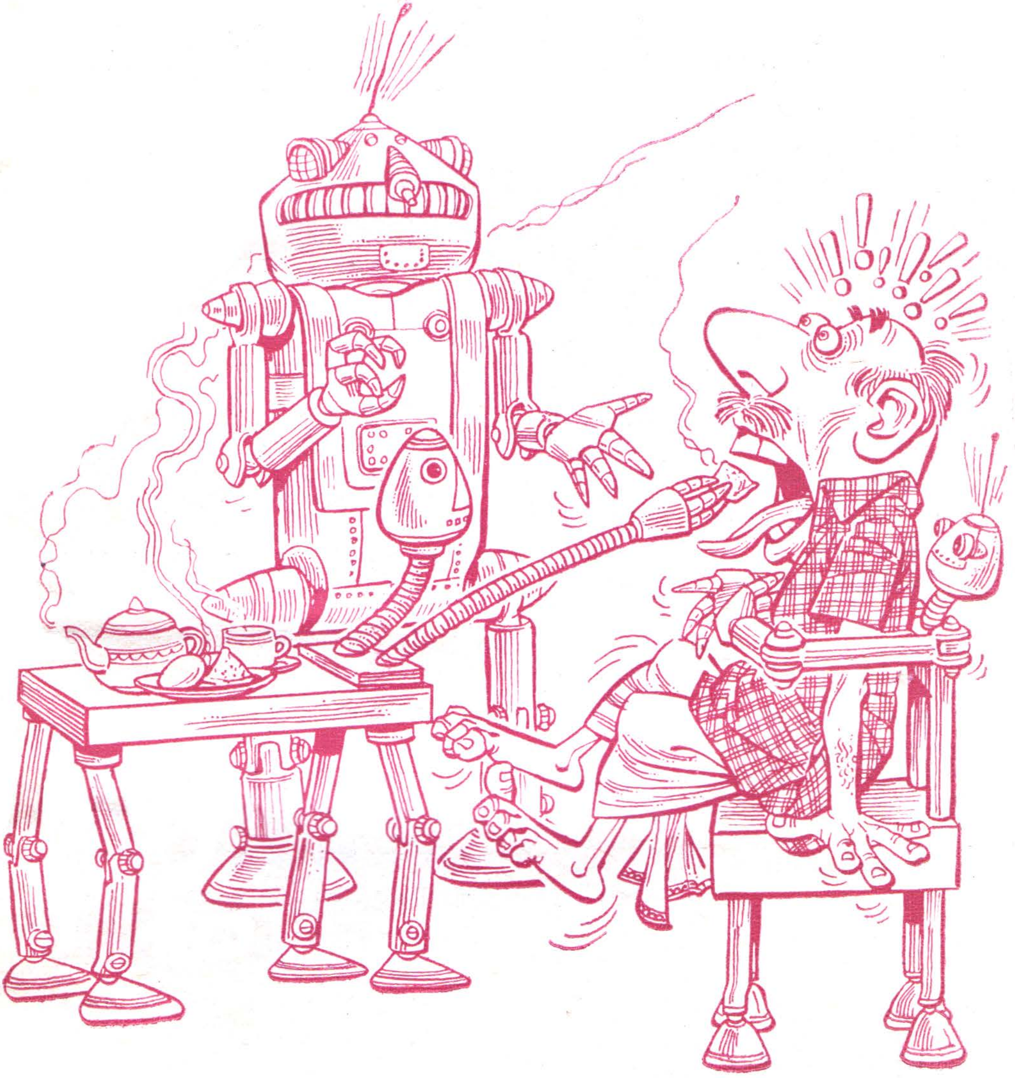

নিজের ঘরে বিপিনবাবু গ্রহণ করেন আপ্যায়ন
বাধ্য হয়েই, নইলে রোবট হয়তো হবে 'খাপ্পায়ন' !

ছবি : বিমল দাস

ছড়া : রঞ্জন ভাদুড়ী

ছোটদের বই

কিশোর ক্লাসিক্‌স

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

ছোটদের কাশীনাথ	৬-০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কিশোর অপু	১২-০০
অপুর ছেলেবেলা	৬-০০
ছোটদের অপরাজিত	৬-০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ছোটদের কাজল	৬-০০

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের

বনে জঙ্গলে	১৫-০০
পশু ও পক্ষী	১৫-০০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

তেপান্তর	১৫-০০

ঘনাদার গল্প ও উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ঘনাদার জুড়ি নেই	৫-০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা	৫-০০

টেনিদার গল্প ও উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

টেনিদার অভিযান	১০-০০
কম্বল নিরুদ্দেশ	৫-০০
চারমূর্তি	৫-০০
ঝাউবাংলোর রহস্য	৫-০০

ডাকাত ও দস্যুকাহিনী

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

বাঙলার ডাকাত

চারখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৬-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার **মণি বাগচি** প্রণীত

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন	৮-০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪-০০
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ	৪-০০
পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা	৪-০০

বাংলা ভাষায় 'সায়েন্স ফিকশন'-এর পথিকৃত

সমরজিৎ করের

ভয়ংকর সেই অভিযান	১০-০০
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	১০-০০

সাধন দাসগুপ্তের দু'খানি জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই

আলো আরও আলো	১২-০০
রোমাঞ্চকর রসায়ন	১০-০০

জীবনচরিতমালা

[illegible]র শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনকথা। যুগযুগ ধরে যাঁরা আমাদের জীবনের উৎস হয়ে আছেন, তাঁদের কথা অপরূপ ভাষায় লিখেছেন প্রখ্যাত জীবনীকার মণি বাগচি। ভূমিকা লিখেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

রাজা রামমোহন	৫-০০
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ	৫-০০
শরৎচন্দ্র	৫-০০
পরমাপ্রকৃতি সারদামণি	৫-০০
আলোকময়ী শ্রীমা	৬-০০
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ	৫-০০
জীবনীশতক	২০-০০

শৈব্যা পুস্তকালয়
কলকাতা ৭০০০৭৩

সম্পাদকীয়

আমার প্রিয় ভাইবোনরা !

নিজেদের মধ্যে আমরা কথা বলছিলাম কয়েক মাস আগে। বলছিলাম, পুজো আসছে। ওই সময় কত রকম বই বেরোয় তোমাদের জন্যে। গল্পের বই, কবিতার বই, নানান সংকলন বা পত্রপত্রিকা। সেই সময় শৈব্যার অন্যতম কর্ণধার রবীন বল বললেন, সবাই তো সেই গল্প কবিতার সংকলন বের করছেন। আসুন না, এবার আমরা একটি বিজ্ঞান-সংকলন বের করি। যাতে থাকবে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, বিজ্ঞানবিষয়ক নানা রকম ঘটনা, বৈজ্ঞানিক ধাঁধা, প্রবন্ধ এই সব। রূপকথার গল্পের মতই যাদের হবে স্বাদ। হাতে সময় ছিল অত্যন্ত কম। তবু যাঁদের লেখা তোমরা ভালোবাসো এই সংকলনটি প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁদের প্রত্যেকেই লেখা দিয়ে এবং অন্যভাবে আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছেন। সম্পাদনার কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীজয়ন্ত দত্ত এবং শ্রীদুলাল বল। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সংকলনটি তোমাদের কেমন লাগলো জানাবে ; খুবই খুশি হবো।

আমার প্রাণভরা ভালবাসা নাও।

সমরজিৎ কর

সূচীপত্র

প্রোফেসর শঙ্কুর কাহিনী

প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা/সত্যজিৎ রায় ১৮

ঘনাদার ফ্যান্টাসী

মাপ/প্রেমেন্দ্র মিত্র ৭

পশুপাখি ও গাছপালার কথা

গাছের কথা/জগদীশচন্দ্র বসু ১
পশুপাখির পরিচয়/যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৩৫
সেকালের লড়াই/সুকুমার রায় ৩৩
বঙ্কুবাবুর গল্প/বিমলেন্দু মিত্র ১৬৭
যে গাছে বিষ আছে/পবিত্রানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ২৬৭
উদ্ভিদের আত্মরক্ষা/প্রমীলা বসু ও সুনন্দা মুখোপাধ্যায় ১০

বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস

একটি আষাঢ়ে গল্প/লীলা মজুমদার ১৯৩
হাঙর/সমরজিৎ কর ২৮৯
যে মেশিন ভাবতে পারে/অদ্রীশ বর্ধন ২৭৩

কল্পবিজ্ঞান কাহিনী

ডঃ ত্রিভুবনের স্বপ্নাদ্য যন্ত্র/নিরঞ্জন সিংহ ১৪৫
শব্দের নাম বিষ/অনীশ দেব ৭৮
গবেষক/অলক চক্রবর্তী ১২৬

বিজ্ঞাননির্ভর গল্প

অভিশপ্ত পুতুল/ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ১৫৪
তলোয়ার থেকে ফুল/ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী ২১৯
গোল রহস্য/সিদ্ধার্থ ঘোষ ৬৮
কলম্বাসের বাবা/এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ৯৮
নীল মানুষ/মোহিত রায় ৩১১

দুঃসাহসিক অভিযান

উত্তরমেরু অভিযান/পৃথ্বীরাজ সেন ১৬২

বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার

বিজ্ঞানের টুকিটাকি/সুনীল সরকার ৬৩
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প/অমরনাথ রায় ৮৪
আকস্মিক আবিষ্কার/ডঃ সমীরকুমার ঘোষ ২২৫
অন্ধকারের রাজা/রথীন সরকার ১০৬
হীরক খনির সন্ধানে/দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০

মহাজীবন কাহিনী

আধুনিক বিজ্ঞান জগতে ভারত/রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৭

ধাঁধার মজা ও সংখ্যার খেলা

লুইস ক্যারলের ধাঁধা/সুনীত রায় ২২
সংখ্যা নিয়ে/বিবেক রায় ৩৯
শব্দকূট ও সংখ্যাকূট/অসিতকুমার চক্রবর্তী ২৭১
ধাঁধার মজা/অমিতায়ু চক্রবর্তী ৪৪

চিত্র কাহিনী

রোমাঞ্চকর/ধীরেন বল ১৮৫

পড়াশোনা

বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান/ডঃ অলক চক্রবর্তী ২৪৪
বিদ্যালয় পর্যায়ে জীবন বিজ্ঞান/ডঃ তারকমোহন দাস ২৬৪
বাস্তব কল্পনা যুক্তি গণিত ও বিজ্ঞান/বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ১১১
আমার পড়াশোনা/তমোঘ্ন চট্টোপাধ্যায় ৩০৯

নির্বাচিত প্রবন্ধ

জীব ও জড়/জগদানন্দ রায় ৪
আমাদের পৃথিবী/ডঃ জয়ন্ত বসু ৪১
রিকেটস বা অস্থি বিকৃতি রোগ/ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ ৫৬
সেকালে এদেশের জ্যোতির্বিজ্ঞান/অরূপরতন ভট্টাচার্য ১১৭
এই বিজ্ঞান/সাধন দাশগুপ্ত ২৩৭
সংখ্যাতত্ত্ব কি ও কেন/অমূল্য গুপ্ত ২৫০
ক্রিকেট খেলা কি বিজ্ঞান/অজয় দাশগুপ্ত ২৮৭
ভারতের প্রাচীন মানমন্দির/পরিতোষ পাল ২২৯
ফটোগ্রাফীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস/ডঃ অজিতকুমার চৌধুরী ১৭৬
কলকাতায় প্রথম শবব্যবচ্ছেদ/ডাঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী ২১১

বিশেষ রচনা

অজানার পথে রোগ/আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য ৪৫

অনুবাদ

সেই যে মজার দিনগুলো/আইজ্যাক অ্যাসিমভ অনুঃ চিরন্তন সান্যাল ৪৯
বড়দিনের উপহার/রে ব্র্যাডবেরী অনুঃ সম্রাট নারায়ণ চৌধুরী ৫৩
আমি কি যাদুকর/এইচ জি ওয়েলস্ অনুঃ চণ্ডী সেনগুপ্ত ৮৮

বিজ্ঞানের ছড়া

রোবটের যুগে/রঞ্জন ভাদুড়ী
প্রশমন, সমযোজ্যতা/কমল চক্রবর্তী ২৭০
বিজ্ঞান ভাবনা/ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত ৩১২

বিজ্ঞান সুভাষিত

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬২ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ৬
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৬৭ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৪৮ মেঘনাদ সাহা ২৪৩

রোবটের যুগে

বিপিনবাবু ভাবেন, শেষে স্বপ্ন হল সত্যি—
ড্রইংরুমে তাই তো হঠাৎ রোবটের উৎপত্তি!
চাকর বাকর বেপাত্তা সব, পাশেই যেটা দাঁড়িয়ে
আসল মানুষ নয়কো মোটেই—কলকব্জার কাঁড়ি এ।
টেবিলে চা ধোঁয়া ছড়ায়, পিরিচে ব্রেকফাস্টো—
গরমাগরম শিঙাড়া আর ডিমসেদ্ধ আস্ত।
সম্মোহিত বিপিনবাবু বসেন গিয়ে চেয়ারে,
কিন্তু সেটার কাণ্ড দেখে চেঁচিয়ে ওঠেন—'কেয়া রে?
চেয়ার সেজে কোন্ বেয়াদপ জাপটে ধরিস আমাকে?'
তারস্বরে ডাকেন তিনি খাস-বেয়ারা রামাকে।
কোথায় রামা? তার বদলে হাজির দুটি কুত্তা—
তারাও রোবট-গায়ে তাদের ইলেকট্রনিক কুর্তা।

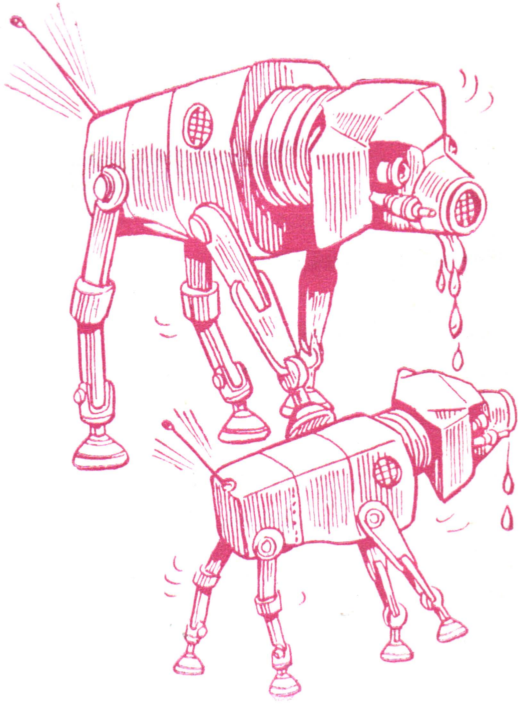

এদিকে তখন আরেক কাণ্ড
টেবিলে গজালো হাত প্রকাণ্ড
সেই হাতখানা তুলল খাবার
বিপিনবাবুকে কিছুই ভাবার
সুযোগ না দিয়ে এগিয়েছে যেই
হাঁ করেন তিনি আপনা থেকেই
গলধঃকরণ করেন সিঙাড়া
কুত্তা যুগল নাল ফেলে সারা!

গাছের কথা

জগদীশচন্দ্র বসু

গাছেরা কি বিছু বলে ? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন ? গাছ কি কোনও দিন কথা কহিয়া থাকে ? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে ? আর যাহা ফুটিয়া বলে না, তাহা কি কথা নয় ? আমাদের একটি খোকা আছে, সে সব কথা ফুটিয়া বলিতে পারে না ; আবার ফুটিয়া যে দুই চারিটা কথা বলে, তাহাও এমন আধ আধ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা যে, অপরের সাধ্য নাই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের খোকার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি। কেবল তাহা নয়। আমাদের খোকা অনেক কথা ফুটিয়া বলে না ; চক্ষু, মুখ ও হাত নাড়া, মাথা নাড়া প্রভৃতির দ্বারা আকার ইঙ্গিতে অনেক কথা বলে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না। একদিন পার্শ্বের বাড়ী হইতে একটি পায়রা উড়িয়া আসিয়া আমাদের বাড়ীতে বসিল ; বসিয়া গলা ফুলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। পায়রার সঙ্গে খোকার নূতন পরিচয় ; খোকা তাহার অনুকরণে ডাকিতে আরম্ভ করিল। পায়রা কি-রকম ভাবে ডাকে ? বলিলেই ডাকিয়া দেখায় ; তদ্ভিন্ন সুখে দুঃখে, চলিতে বসিতে, আপনার মনেও ডাকে। নূতন বিদ্যাটা শিখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই।

একদিন বাড়ী আসিয়া দেখি, খোকার বড় জ্বর হইয়াছে ; মাথার বেদনায় চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। যে দুরন্ত শিশু সমস্ত দিন বাড়ী অস্থির করিয়া

তুলিত, সে আজ একবার চক্ষু খুলিয়াও চাহিতেছে না। আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার হাতের স্পর্শে খোকা আমাকে চিনিল এবং অতি কষ্টে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর পায়রার ডাক ডাকিল। ঐ ডাকের ভিতর আমি অনেক কথা শুনিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, খোকা বলিতেছে, 'খোকাকে দেখিতে আসিয়াছ? খোকা তোমাকে বড় ভালবাসে।' আরও অনেক কথা বুঝিলাম, যাহা আমিও কোন কথার দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

যদি বল, পায়রার ডাকের ভিতর এত কথা কি করিয়া শুনিলে? তাহার উত্তর এই—খোকাকে ভালবাসি বলিয়া। তোমরা দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন, ছেলে কি চায়। অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না। ভালবাসিয়া দেখিলেই অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম তখন সব খালি-খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখী, কীট-পতঙ্গদিগকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোন কথা বলে না, ইহাদের যে একটা জীবন আছে, আমাদের মত আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এ সব কিছুই জানিতাম না; এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মত অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবন-ধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ স্বার্থত্যাগ—গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন-দান উদ্ভিদে সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনেরই ছায়া মাত্র। ক্রমে এ সব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর, কোন গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময়ে এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে

ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বল ত— এই গাছ আর এই মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে, আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একে জীবন আছে আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়ে চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়; জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখীর ছানা জন্ম লাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটির উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাক্‌না; তাহার মধ্যে বৃক্ষ-শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানা প্রকার—কোন্‌টি অতি ছোট, কোনটি বড়। বীজ দেখিয়া, গাছ কত বড় হইবে, বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বটগাছ সরিষা অপেক্ষা ছোট বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এত বড় গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয় ত কৃষকদিগকে ধান্যের বীজ ক্ষেতে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছপালা, বন-জঙ্গল, দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায় পাখীরা ফল খাইয়া দূর দেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জন মানব শূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূর-দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমুল-ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায়। তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস, তুলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিন-রাত্রি দেশ-দেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কি না, কেহ বলিতে পারে না। হয়ত কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে আর অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই। (সংক্ষেপিত)

জীবজন্তু

জগদানন্দ রায়

আমরা প্রতিদিন চারিদিকে ইট্-কাঠ, ছাগল-গরু, বিছে-ব্যাঙ, মাটি-পাথর গাছ-পালা ইত্যাদি যে কত জিনিস দেখি তাহা গুণিয়াই শেষ করা যায় না। এই সব জিনিসের মধ্যে সবগুলিই কি জ্যান্ত ? তোমরা যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে সব জিনিসই জ্যান্ত নয়। জ্যান্ত জিনিস কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। যাহা একটু চলা-ফেরা বা নড়া-চড়া করে, আমরা মনে করি তাহাই বুঝি জ্যান্ত। কিন্তু তাহা ঠিক্ নয়। এক বাটি জলের উপরে একটু কর্পূর ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কর্পূরের কণাগুলি জলের উপরে ভাসিয়া ঠিক জলের পোকার মতো কিল্‌বিল্ করিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা কর্পূরকে কি জ্যান্ত জিনিস বলিবে ? কর্পূর জ্যান্ত জিনিস নয়।

গাছ-পালা এবং জন্তু-জানোয়ারেরই জ্যান্ত জিনিস। ইহাদিগকে জীব নাম দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া মাটি-পাথর, সোনা-লোহা, ইট্-কাঠ ইত্যাদি জিনিস জ্যান্ত নয়। ইহাদের নাম দেওয়া হয় জড়। ইহারা মরা।

জীব অর্থাৎ জ্যান্ত জিনিসের কতকগুলি লক্ষণ আছে। এই সব লক্ষণ দেখিয়া

কোন্ জিনিসকে তোমরা জীব বলিবে এবং কোন্ জিনিসকেই বা জড় বলিবে, তাহা সহজে ঠিক্ করিতে পারিবে।

জীবমাত্রেরই এক-একটা নির্দিষ্ট আকার আছে। ইঁদুর কত ছোট জীব তোমরা তাহা দেখিয়াছ। খুব ভাল করিয়া খাবার দিলে, সে কখনই হাতীর মতো বড় হয় না। বাচ্চা ইঁদুর একটু একটু করিয়া বড় হয় বটে, কিন্তু কখনই তাহাকে ধাড়ী ইঁদুরদের চেয়ে বড় হইতে দেখা যায় না। আমরা কেবল ইঁদুরদের কথা বলিলাম। তোমরা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবে কাক-বক, শেয়াল-কুকুর, মানুষ-ভেড়া আমগাছ, কাঠাল গাছ প্রভৃতি কোন জীবই, তাহাদের বংশের যে এক-একটা আকৃতি ধরা আছে তাহা ছাড়াইয়া যায় না। মানুষকে তোমরা কখনো তাল গাছের মতো উঁচু হইতে দেখিয়াছ কি? সে হাতীর মত মোটাও হয় না। কিন্তু যে-সব জিনিস জ্যান্ত নয়, তাহাদের আকৃতির সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাথর জ্যান্ত জিনিস নয়, তাই ইহার আকৃতির সীমা পাওয়া যায় না; ছোট ঢিলের মতো পাথরও আছে, আবার হিমালয় পর্বতের মতো বড় বড় পাথরও দেখা যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এক-একটা নির্দিষ্ট আকৃতি জীবের প্রথম লক্ষণ।

জীবের দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে, তাহাদের নির্দিষ্ট অবয়ব অর্থাৎ চেহারা। মানুষ, গরু, হাতী, ঘোড়া, চামচিকা, বিছা প্রভৃতি প্রত্যেকরই এক-একটা নির্দিষ্ট চেহারা নাই কি? মানুষের দুইখানি হাত, দুইখানি পা, দুইটি চোখ, একটা নাক আছে। ইহার অন্যথা কোনো মানুষেই দেখা যায় না। বাদুড়ের মতো ডানাওয়ালা, হাতীর মতো শুঁড়ওয়ালা এবং প্রজাপতির মতো ছয়খানা পা-ওয়ালা মানুষ তোমরা সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও বাহির করিতে পারিবে না। আবার, বিড়ালের মতো থাবাওয়ালা, গরুর মতো শিঙ্ওয়ালা হাতীও খুঁজিয়া মিলিবে না। সুতরাং দেখ, আমরা যাহাদিগকে জ্যান্ত অর্থাৎ জীব বলি, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক-একটা ধরা-বাঁধা চেহারা আছে। কিন্তু ইট, পাথর, কাঠ, জল ইত্যাদি জড় জিনিসের সে-রকম বাঁধা চেহারা নাই।

যাহারা জ্যান্ত, তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাবারের দরকার হয়। এই খাবার শরীরের ভিতরে লইয়া তাহারা শরীরকে পুষ্ট করে। একবেলা না খাইলে কি রকম কষ্ট হয়, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? ছাগল, গরু ভেড়া, গাছ-পালা

সকলেরি সেই রকম খাবারের দরকার হয়। খাবার না পাইলে তাহারা কষ্ট পায় এবং বড় হইতে পারে না,—শেষে দুর্বল হইয়া মারা যায়। কিন্তু যে-সব জিনিস জড় তাহাদের খাবারের দরকার হয় না এবং তাহারা জীবদের মতো বাড়েও না। তোমাদের পড়িবার ঘরে যে টেবিলখানি রহিয়াছে, তাহাকে তোমরা কি রোজ খাবার খাইতে দাও? তোমাদের পোষা বাচ্চা কুকুরটি খাবার চায়, কিন্তু টেবিলখানি খাবার চায় না। তাই কুকুরটি যেমন দিনেদিনে বড় হয়, টেবিল সে-রকম বড় হয় না। এই জন্যই কুকুরকে আমরা জীব বলি এবং টেবিল-খানিকে বলি জড়।

সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করা জীবের আর একটা লক্ষণ। তোমাদের বাড়ীর আঙিনায় যে চারিখানি ইট্ পড়িয়া আছে, তাহা দুই মাস পরে, আপনা হইতেই আটখানা হইয়া দাঁড়াইল, ইহা তোমরা দেখিয়াছ কি? এ-রকম ঘটনা কখনই ঘটে না। কিন্তু তোমরা যদি এক জোড়া সাদা ইঁদুর বা গিনিপিগ্ পুষিয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, এক জোড়া ইঁদুর বা গিনি-পিগ্ কয়েক মাসের মধ্যে অনেক বাচ্চা প্রসব করিয়া দশ-বারোটা হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা হইলে দেখ,—সন্তান উৎপন্ন করা জীবের আর একটা প্রধান লক্ষণ।

এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিয়াছ, আমরা প্রতিদিন যে সব জিনিস দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে একদল জীব এবং আর এক দল জড় আছে।

বিজ্ঞান সুভাষিত

* পূর্ণ সত্য কত দূরে? যত দিন যাচ্ছে ততই মানুষ বিশ্ব সম্বন্ধে নতুন নতুন জ্ঞান, গভীরতর জ্ঞান আহরণ করছে বটে, কিন্তু সে তার অজ্ঞানতার অন্ধকার উপলব্ধি করছে। বহুকাল আগে নিউটন বলেছিলেন, আমি তীরে দাঁড়িয়ে দু-একটা শামুকের খোলা, দু-একটা পাথরের টুকরা কুড়িয়ে পেলুম মাত্র, জ্ঞানসমুদ্র সামনে পড়ে রয়েছে। নিউটনের পর দুশ বছর চলে গিয়েছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে সাধারণ মানুষ আজ স্তম্ভিত। কিন্তু তবুও আজ বিজ্ঞানী নিউটনের কথা একই ভাবে মনে করছে।

—চারু চন্দ্র ভট্টাচার্য

মাপ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কাঁচা ইট পোড়ালে যদি শক্ত হয় তাহলে দুর্গাপুরের দুটো সাদা বেড়াল তিনটে নেংটি ধরবে না কেন ?

কি রকম লাগছে যুক্তিটা ?

আবোল-তাবোল আর হ-য-ব-র-ল-এর জট-পাকানো হারানো পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়ে, তা থেকে টাটকা আমদানি করলাম মনে হচ্ছে ?

সন্দেহ হচ্ছে কি যে হঠাৎ দুনিয়ার মাথার ঘিলু মেরে কেউ ঘোল বানিয়ে ফেলেছে ?

এমন যুক্তি কারুর পক্ষে দেওয়া সম্ভব ? সম্ভব বই কি ! এমন যুক্তি দিতে পারেন শুধু একজন, আর সেই যুক্তির প্যাঁচে ফেলে নয়-কে-হয় করে ফেলতে পারেন কথার ভেলকিবাজিতে। তাল নয়, সুতোয় একটু ঢিল পেলেই তিনি তিলকে পিষে একেবারে মোরগ-তন্দুরী আদায় করে ছাড়তে পারেন তা থেকে।

চালের ভুলে কি বিনা খেয়ালে তাঁর যুক্তির জাঁতাকলে একবার আটকা পড়লে আর রক্ষা নেই।

সেই বিপদ ঠেকাবার জন্যেই বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের একটা দিশেহারা অবস্থা চলেছে ক'দিন।

বুধ বৃহস্পতি শুক্র, গত এই তিন দিন আমাদের চেহারা চাল-চলন দেখে কেউ কেউ বেশ একটু তাজ্জব হয়েছে নিশ্চয়ই। বনমালী নস্কর লেনের মেস-বাড়িতে নয়, আমাদের দেখাও গেছে বেপোট বেয়াড়া এমন সব জায়গায় যেখানে আমা[illegible] উপস্থিতি সন্দেহজনক যদি না হয় তাহলে রহস্যজনক নিশ্চয়।

চেনা দু'চারজনের চোখে পড়ে তাদের প্রশ্নবাণে বেশ একটু বিব্রত হতে হয়েছে আমাদের সকলকেই।

তা প্রশ্ন যারা করেছে তাদেরই বা দোষ কি!

এই গরমের ঠা ঠা রোদ্দুরে ভরা দুপুর বেলা শিবুকে যদি হঠাৎ বৈঠকখানা বাজারে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়, তাহলে চোখ একটু কপালে ওঠা অন্যায় নয়। একটু সন্দিগ্ধ প্রশ্নও তারপর স্বাভাবিক।

বয়স্ক কেউ হলে বলেছেন—কি হে শিবদাস, ব্যাপার কি? দুপুরবেলা এ বাজারে কেন?

তা আপনিই বা এ বাজারে দুপুরবেলা করছেন কি?—পাল্টা প্রশ্ন করবার ইচ্ছে হলেও বয়সের মর্যাদা দিয়ে শিবুকে সে লোভ সামলাতেই হয়।

তাছাড়া তার নিজের অবস্থা যে অত্যন্ত কাহিল। দুপুর রোদে বাজারে কেন সে যে ঘুরে মরছে তার কৈফিয়ত কি সে সোজাসুজি দিতে পারবে? বলতে পারবে যে এক বিশেষ রঙের আর গড়নের এমন একটি মাটির তৈরী আধার সে খুঁজছে যার মধ্যে টিকের আগুনের ওপর তাম্রকূটের বটিকা সলিল সহযোগে পান করে স্বর্গীয় আনন্দ পাবার মত ধূমরাশির সৃষ্টি হয়?

চোখ কান বুজে মরিয়া হয়ে এ বাজারে এমন সময়ে মধ্যাহ্ন ভ্রমণের উদ্দেশ্য স্বীকার করে ফেললেও যে রেহাই নেই। তার পরের প্রশ্নের ফ্যাঁকড়া সামলাতেই যে প্রাণান্ত হবে।

অ্যাঁ! কলকে! কেন কলকে? এ রোগ আবার কবে থেকে হল? তা এই কাঠফাটা রোদে না কিনতে বার হলে নয়, এমন বেয়াড়া মৌতাত?

এমন অসময়ে বদ্‌নামের পয়লা ছোপ লাগানো কলকের মত জিনিস কেন যে বাধ্য হয়ে খুঁজতে বেরুতে হয়েছে তা যখন বলা যাবে না তখন ধরাপড়া চোরের মত

কাচুমাচু মুখ করে যা হোক কিছু বিড়বিড় করে ব'লে সরে পড়া ছাড়া আর কি উপায় আছে ?

বৈঠকখানার বাজারের বদলে কালিঘাটের মন্দিরের রাস্তায় ফুটপাতে পাতাওয়ালাদের সওদা ঘাঁটতে বসলেও নিস্তার নেই।

আরে গৌর না ?

নিজে থেকে দেখাতে চাইলে চৌরঙ্গী দিয়ে ক্যাডিল্যাক হাঁকিয়ে গেলেও হয়ত কারুর চোখে পড়ে না, কিন্তু ঠিক এই বেয়াড়া সময়টিতে ঠাসা ভিড়ের মাঝখানেই হয় ভোর যার সঙ্গে দেখা নেই এমন চেনা লোকটির চোখে নির্ঘাৎ পড়ে যেতে হয়।

গৌর নিজের পরিচয়টা আর অস্বীকার করে কি করে ? 'হ্যাঁ, ভালো ত !'—গোছের কিছু লৌকিকতার জবাব দিয়ে তাকে সরে পড়বার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু কমলী ছাড়বে কেন ? বেয়াড়া প্রশ্নগুলো শুরু হয় এবার-ই।

তা এখানে রাস্তায় বসে কি কিনছিলি ? এখানে ত পাড়াগাঁ মফঃস্বলের যাত্রী মেয়েছেলেরা ঠাকুর দেখে ফেরবার সময় ফিতেটা, মাথার কাঁটাটা, সস্তা আয়নাটা কিনে নিয়ে যায়। তোর সে সব দরকার না কি ?

বিদ্রূপটা বেমালুম হজম করে, 'না, মানে,—এই'—বলে আমতা আমতা করে আবোল-তাবোল একটা কিছু বলে গৌর সরে পড়তে দেরী করে না।

শিবু কি গৌরের যেমন, আমাদের অবস্থা কি তার চেয়ে ভালো কিছু ? মোটেই না।

বৈঠকখানা বা কালিঘাটের বদলে বাঁটরা কি বেলেঘাটায় শিশির বা আমার সমান অপ্রস্তুত চেহারা।

শহর থেকে শহরতলির অমন সব বেয়াড়া বেপোট জায়গায় অসময়ে ঘুরে ফিরে আমরা খুঁজছি কি ?

ঠিক জানি না।

কিন্তু কেন যে আমাদের এই দিশাহারা হয়ে ঘোরা-ফেরা তা বলতে পারি।

গোড়ায় যা দিয়ে শুরু করেছি ক্ষ্যাপার মত এ টহলদারী শুধু সেই ঘিলু-ঘোলানো যুক্তির জাঁতাকল এড়াবার জন্যে। কি আমরা চাই তা ঠিক জানি না, তবে

জাঁতাকলের ঝাঁপটায় পড়া যাতে ঠেকানো যায়, তার জন্যে যতটা সম্ভব সাজসরঞ্জাম নিয়ে তৈরী হয়ে থাকতে চাই।

কাঁচা ইট পোড়ালে যদি শক্ত হয়, তাহলে দুর্গাপুরের দু'টা সাদা বেড়াল তিনটে নেংটি ধরবে না কেন।—এই ত যুক্তির নমুনা।

যত আজগুবিই হোক এ যুক্তি শেষ প্যাঁচ পর্যন্ত যাতে না পেঁছাতে পারে তার জন্যে একেবারে গোড়াতেই কোপ বসাতে চাই আমরা।

ইট শক্ত কি না বলবার সুযোগ না দিলে সাদা বেড়ালের নেংটি ধরার কথা ত আসে না। যুক্তি-প্রলাপের প্রথম ধাপটাই তাই আমরা পাততে দেব না ঠিক করেছি। পাততে দেব না কাকে তা আর বোধ হয় বলে বোঝাতে হবে না।

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঘনাদা ছাড়া আর কার পক্ষে ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে এমন ছিনিমিনি সম্ভব?

যুক্তির প্রথম ধাপটি পাতবার জন্যে তিনি যে তৈরী হচ্ছেন, বুধবার সকালেই তা টের পেয়েছি আমাদের বনোয়ারীলালের ভগ্নদূতের চেহারা নিয়ে ঘরে ঢোকা থেকেই।

ছুটির দিন নয়, কিন্তু কি একটা দারুণ কারণে বুধবারটা আমাদের পাড়া বন্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। সারা বাংলা কি কলকাতা নয়, বন্ধ্ শুধু আমাদের বারো তেরো চোদ্দ পল্লী। এখন থেকে পল্লী ধরেই নাকি বন্ধ্ চালু রাখা হবে। কাজে কর্মে যাবার তাড়া না থাকায় সকাল বেলাই আড্ডা ঘরে এসে জমায়েৎ হয়েচি টঙের ঘর থেকে নামবার সিঁড়ির দিকে কান পেতে রেখে।

ঘনাদা নয়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরে ঢুকছে বনোয়ারীলাল। একেবারে কাঁদো কাঁদো চেহারা!

মুখে সে কিছু বলে নি। করুণ নিবেদনটা নীরব মুখেই ফুটিয়ে এসেছে।

কি রে হল কি! আমাদেরই জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে সন্ত্রস্ত হয়ে,—বড়বাবুর মেজাজ গরম না কি?—হাঁ,বড়া গরম। বনোয়ারী সরল ভাবে অপরাধ স্বীকার করেছে।

—হামার কসুর হোইয়ে গেছে।

কি কসুর হল? আজ এই এমন দিনে সকাল বেলাই গণ্ডগোল বাধিয়ে বসলি। দিনটাই দিলি মাটি করে।

একসঙ্গে আমাদের সকলের প্রশ্নবাণের সামনে হতভম্ব হয়ে বনোয়ারীলালের

প্রায় বোবা হবার অবস্থা। অনেক কষ্টে তারা সাড়া ফেরাবার পর সে জানালে যে সকালে বড়বাবুর ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে সে তাঁর একটা লোকসান করে ফেলেছে।

কি লোকসান? কি? আমরা উদ্বেগে ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলাম।

সে হামি জানে না। বনোয়ারী যথাযথ বিবরণ প্রকাশ করলে, হামি ঝাড়ু দিতে আছিলাম, বড়বাবু আচানক গোসা হয়ে হামাকে বাহার যেতে বোললে। বোললে হামি বহুৎ লোকসান করে দিয়েছি।

কি করেছিস কি? ভেঙেছিস কিছু?

বনোয়ারী আমাদের প্রশ্নে প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে জানালে যে জ্ঞানত কোনো কিছু সে ভাঙে নি, নষ্টও করে নি কিছু।

তাহলে?

বনোয়ারীকে বিদায় দিয়ে তখনই আমাদের মন্ত্রণা সভায় বসতে হল। ব্যাপারটা আসলে যে কি তা আমাদের আর বুঝতে বাকি নেই। আহম্মক বনোয়ারীর দোষে কোন কিছু লোকসান হয়েছে এই হল প্রথম ধাপ। এই ধাপটুকু পাততে দিলেই 'কাঁচা ইট পোড়ালে শক্ত হয়',-এর পর 'সাদা বেড়ালের ইঁদুর ধরা'র মীমাংসায় ঘনাদা আমাদেরও ঠেলে তুলবেন।

প্রথম ধাপ পাতাটাই ভেস্তে দিতে হবে।

কি লোকসান হয়েছে ঘনাদার? তাঁর কোন্ রাজকীয় ঐশ্বর্যই বা খোয়া যেতে পারে?

যাক্ বা না যাক্ বনোয়ারীর ঘাড়ে দোষ চাপাবার সুযোগই তাঁকে দেওয়া হবে না। যা কিছু হারিয়েছে বা লোকসান হয়েছে তিনি বলতে পারেন, সব আগে থাকতে এমন মজুত রাখব যে মুখের কথা খসতে না খসতে হাজির করব সামনে। বনোয়ারীর ঘর সাফের গলতি থেকে ঘরের দেওয়ালে একটা জানালা ফোটাবার আবদারে কিছুতে তিনি যাতে না পৌঁছোতে পারেন।

হ্যাঁ, এই আবদারই ধরেছেন ঘনাদা আজ কয়েকদিন হল। তাঁর ঘরে একটা মাত্র জানালা। হাওয়া খেলবার জন্যে আরেকটা না খোলালে নয়।

বোঝাতে কিছু তাকে বাকী রাখি নি। বলেছি যে বাড়িওয়ালা অতি সজ্জন ব্যক্তি। পুরোন হোক সেকেলে হোক বছরের পর বছর নামমাত্র ভাড়ায় এ বাড়ি

আমরা প্রায় মৌরসীপাট্টা নিয়ে ভোগদখল করে আসছি। ভাড়া বাড়াবার কথা তিনি ভুলেও একবার উচ্চারণ করেন নি, কিন্তু ঘনাদার টঙের ঘরে দক্ষিণের জানালা ফোটানো তাঁর সাধ্যের বাইরে। আগের আমলের বাড়ি। এখনকার আইনে জানালা খুলতে যতখানি জমি ছাড় দরকার তাই দক্ষিণ দিকে নেই। সুতরাং জানালা ফোটানোর কথা উঠতে পারে না।

কিন্তু ঘনাদা তাঁর সেই এক আবদার ধরে বসে আছেন। বাইরে কদিন একটু চুপচাপ থাকলেও ভেতরে ভেতরে যে তিনি ধোঁয়াচ্ছেন বনোয়ারীর ওপর সেদিন সকালের হম্বিতম্বি থেকেই তা টের পাওয়া গেছে।

ঘরের জিনিস হারানো ব্যাপারটাই যুক্তির প্যাঁচে পাকিয়ে পাকিয়ে এবার তিনি দেওয়াল ফুঁড়ে জানালা ফোটাবার অস্ত্র করে তুলবেন।

কিন্তু সেটি হতে দেব না, আমাদেরও পণ।

ঘনাদার পক্ষে কি হারিয়েছে বলা সম্ভব?

আমরা তালিকা করে ফেলেছি তৎক্ষণাৎ। তক্তপোশ তোরঙ্গ শেল্‌ফ আলনা বাদে হারাতে পারে এমন অস্থাবর জিনিস মাত্র কটিই পেয়েছি। তাঁর হুঁকোর কলকে মাথার চিরুনি, নখের নরুণ, সেলাই-এর ছুঁচ আর-আর-আর···কান খুশকির কাঠি! হ্যাঁ, নিরিবিলিতে ঘনাদাকে চোখ বুজে তন্ময় হয়ে এই শলাকাটি কানে দিয়ে যেন তুরীয় আনন্দ পেতে দেখা গেছে। শুধু একটু ঝাঁটা চালানোতে এই কটি ছাড়া হারাবার তাঁর কিছু নেই।

ক'জনে মিলে বাজার চুঁড়ে ওই কটা জিনিস কিনতে বেরিয়েছি সেদিন দুপুরেই। জিনিস অতি সামান্য, কিন্তু ওই সামান্য জিনিস কেনারই এত ঝামেলা তা আগে ভাবতে পেরেছি। শুধু জিনিসটা হলেই তো হবে না, ঘনাদার নিজস্ব সম্পত্তির সঙ্গে তার হুবহু মিল হওয়াও চাই।

কলকের কথাই ধরা যাক না। বাজারে অভাব নেই। কিন্তু ঘনাদার স্পেশ্যাল ব্র্যাণ্ডের গড়ন রঙ মাপ ত আর মুখস্থ করা নেই। কলকের বেলা যেমন চিরুনি নরুন খুশ্‌কির কাঠির বেলাতেও তাই। কান-খুশকি, তামা না পেতল না নিকেলের, কি তার মাপ অত কি লক্ষ্য করে দেখেছি।

তা মাপ এক চুল এদিক ওদিক হলে, ঘনাদাই বা ধরবেন কিসে? তিনি ত আর হিসেব দেখে রাখেন নি। সেই ভরসাতেই ঘনাদার উদ্ভট ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম চালের

জন্যে তৈরী হয়েছিলাম। বনোয়ারী করুণ কাতর মুখে ওপর থেকে নেমে জানিয়েছে যে বড়বাবু সকালের চা জলখাবার ফেরত দিয়েছেন।

ফেরত দিয়েছেন! কিন্তু এ পাড়ায় নয়, চার চারটে পল্লী ছাড়িয়ে ডাকসাইটে দোকান থেকে স্পেশ্যাল লড়াই-এ চপ ভাজিয়ে এনে প্রায় এক ধামা মশলা মুড়ির সঙ্গে পাঠান হয়েছে যে।

যেতে হল তখুনি টঙের ঘরে! না, ডিমোক্রেসী অর্থাৎ রাজনীতির চালে আমরাও ভুল করব না। মশলা মুড়ি আর লড়াই-এ চপ এর খবরই আমরা যেন রাখি না। আমরা শুধু গেছি আজকের খ্যাঁটের 'মেনু'টা কি হবে পরামর্শ করতে।

তপ্‌সে উঠেছে নাকি শেয়ালদার বাজারে। শিশির যেন ডায়মণ্ডহারবারে পেট্রোলের খনি আবিষ্কারের খবর জানিয়েছে। পোস্তায় বেগুনফুলিও পৌঁছে গেছে। শিবু তাল দিয়েছে সমান উৎসাহের সঙ্গে।

ঘনাদা কি বধির হয়ে থেকেছেন? না। তিনি শুধু নির্বিকার নির্লিপ্ত। আমাদের দিকে একবার চোখ তুলে চেয়ে আবার তাঁর খবরের কাগজে মনোনিবেশ করেছেন।

সকালের লড়াই-এর চপ হার মেনেছে। শেয়ালদা বাজারের তপ্‌সে আর পোস্তার নতুন আমদানি বেগুনফুলি আমও বিফল। তাই আর একটু কড়া উস্‌কানি দিতে চেয়েছি। বলেছি,—সকাল থেকে একটু মেঘলা মেঘলা আছে। ভাবছি ঠিক পোলাও-টোলাও নয়, আজ একটু ঘি-ভাত করা যাক। কি বলেন ঘনাদা?

ওই ঘি-ভাতের কথাতেই কাজ হয়েছে। ঘি-টা ভাতে নয় যেন ঘনাদার ভেতরে এ কয়দিন ধরে ধোঁয়ানো আগুনের ওপরই পড়েছে। ঘনাদা একেবারে দপ করে জ্বলে উঠেছেন,—আমায় এসব কি শোনাচ্ছ? তোমরা আমায় এখানে খেতে বলো?

ঘনাদার মুখটা সত্যি দেখবার মত। ইলেকশনের পর বিজয়ী পার্টির নেতাকে যেন দলত্যাগ করতে বলেছি, ভাবখানা এই রকম।

কেন? কি হয়েছে ঘনাদা!—আমরা তারস্বরে হাহাকার করে উঠেছি।

এর পর চার মাথা এক করে যেমন এঁচে রেখেছিলাম ঠিক তেমনিই সব ঘটেছে, একেবারে দাগে দাগ মিলিয়ে।

তবু শেষ পর্যন্ত ঘনাদার কাছে থেকে একেবারে কুপোকাত হয়ে ফিরতে হয়েছে।

দোষটা পুরোপুরি গৌরের। কি দরকার ছিল তার পাকামি করে ওই পাঁচকড়া-র বিদ্যে জাহির করতে যাওয়ার।

নইলে, সব ঘুঁটি ত আমাদের জিবের মুখেই নড়ছিল। আমাদের হাহাকারের ফল ঠিক ফলেছে। ঘনাদা গণনা মাফিক বেকুব বনোয়ারীর মুণ্ডপাত করতে করতে তাঁর লোকসানের কথা জানিয়েছেন।

কি লোকসান গেছে?—আমরা উদ্বেগে সমবেদনায় গলা ধরিয়ে ফেলেছি।

আশ্বস্ত হয়েছি, আমাদের হিসেব ভুল হয় নি জেনে। হারিয়েছে ঘনাদার সেই মহামূল্য কান খুশ্‌কি।

আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছি,—অমন জিনিসটা হারিয়ে গেল! ভালো করে খুঁজে দেখেছেন ত?

তা আর দেখি নি!—বলে ঘনাদা সন্দেহের ওদিকটায় দাঁড়ি টানতে চেয়েছেন। আমরা যেন শুনতেই পাই নি। এক একজন পকেটে এক একটি মুশকিল আসান নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলাম। কান খুশ্‌কি খুঁজে পাওয়ার বরাত ছিল আমার উপর। ঘরের মেঝের কোণ কানাচগুলো একটু দেখতে দেখতে হঠাৎ তোরঙ্গের তলা থেকেই যেন বার করে ফেলেছি খুশকিটা।

এই! এই ত আপনার খুশকি!

ঘনাদাও খুশ্‌কি হাতে নিয়ে একটু হকৃচকিয়ে গেছেন। দু' আঙুলে ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখেছেন মাত্র। মুখে আর কথা সরে নি।

শিবুর ফোড়নটাও জুতসই হয়েছে,—পা গলালেই যেমন জুতোর, কানে দিলেই তেমনি খুশ্‌কির বিচার। একবার কানে দিয়েই দেখুন না, ক'দিন হারিয়ে পড়ে থেকেও সেই আগের সুখই দিচ্ছে!

ঘনাদা খুশ্‌কিটা বুঝি কানে ঢোকাতেই যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে গৌরের হিমালয়-প্রমাণ আহাম্মকি!

সুখ দেবে না মানে! গৌর যেন খুশ্‌কিটাকেই ধমক দিয়েছে—যে হালেই থাক্, খুশ্‌কি সুখ দেয় কানের সঙ্গে মাপের মিলে। ঘনাদা ত আর লম্বকর্ণ নন। ওঁর খুশকির মাপ একেবারে পাক্কা আট দশমিক উনআশি।

তার মানে ?—একটু অবাক্ হয়ে আমাদেরই জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে,—আট দশমিক উনআশি আবার কি ?

কি আবার ? সেন্টিমিটার ! গৌর মাতব্বরের মত বলেছে, আদর্শ খুশকির মাপ হল পাক্কা আট দশমিক উনআশি সেন্টিমিটার ! একেবারে দাগে দাগে মিলে যাওয়া চাই ।

কিসের দাগে দাগে ?

প্রশ্নটা ঘনাদার । তিনি তখন সত্যিই খুশ্‌কিটা কানে ঢুকিয়েছেন ।

বিছে জাহির করবার এমন সুযোগ গৌর আর ছাড়তে পারে। মরক্কোয় বাঁধানো ঘনাদারই যেন কাগজের মলাট দেওয়া সংস্করণ হয়ে বলেছে—যে জিনিসটি দিয়ে তুনিয়ার মাপ নির্ভুল বলে মঞ্জুর হয়, প্যারিসের কাছে ইণ্টারন্যাশন্যাল বুরো অফ্ ওয়েট্স অ্যাণ্ড মেজার্স-এ রাখা প্ল্যাটিনম্ ইরিডিয়ম-এর সেই 'বার'টির গায়ে টানা তুটি দাগের।

ঘনাদার মৃত্নু নাসিকাধ্বনি শোনা গেছে। এটা কানের সুখের উচ্ছ্বাস না গৌরকে উপহাস চট্ করে বোঝা যায় নি। ঘনাদা চোখ বুজে খুশকি নাড়তে নাড়তে থেমে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছেন। তারপর কান থেকে খুশ্কি বার করে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ গম্ভীর স্বরে বলেছেন—না, তিয়াত্তর ঢেউ বেশী।

অ্যাঁ!—আমাদের সকলের চোখ ছানাবড়া।

তিয়াত্তর ঢেউ-এর ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে ঘনাদা আরেকটি যা আই-সি-বি-এম ছেড়েছেন তাতে আমরা একেবারে সসেমিরে!

মেম্ব্রানা টিম্পানি ফুঁড়ে রেসেসস্ এপিটিম্প্যানিকস্ কি ইউস্টেকিয়ান টিউবে গিয়ে গোল বাধাতে পারে।—বলেছেন ঘনাদা।

বুদ্ধিশুদ্ধির মত জিভটারও সাড় ফিরতে বেশ সময় লেগেছে। ঘনাদা ততক্ষণে খুশ্কিটার দিকে বার কয়েক ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছেন,—না, এটা আমার নয়।

কি করে বুঝলেন ঘনাদা। একটু ধাতস্থ হয়ে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করতে পেরেছি এবার—শুধু কানে দিয়ে?

হ্যাঁ।—ঘনাদা জলন্ত ক্ষুব্ধ স্বরে জানিয়েছেন, এই জলো খুশকি দিয়ে আমায় কালা করবার একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।

যথার্থই প্রমাদ গুণে আমরা প্রাণপণে তাঁকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেছি,—না, না, সে কি বলছেন। ষড়যন্ত্র কে করবে। আর একটা খুশকি কানে দিলে কি কালা হতে হয়?

হয়!—ঘনাদার স্বর জলদ গম্ভীর—এ খুশকি আমার কানের পর্দা ফুটো করে ভেতরের নলে চলে যেতে পারে। এক আধটা নয়, দস্তুর মত তিয়াত্তর ঢেউ বড় এটা!

আমাদের বিহ্বল বিমূঢ় মুখগুলোর দিকে চেয়ে এবার বুঝি ঘনাদার একটু দয়া

হয়েছে। করুণা করে বলেছেন,—তিয়াত্তর ঢেউ বুঝতে পারছ না বোধ হয়। ওটা হল সবচেয়ে হালফিল মাপের একটা হিসেব। এখন আর প্যারিসের কাছে রাখা দু' জায়গায় লাইন কাটা প্ল্যাটিনম ইরিডিয়ম-এর 'বার' দিয়ে নিখুঁত মাপ ঠিক করা হয় না। ১৯৬০ সালেই ও ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেছে। এখন এক মিটারের মাপ ঠিক করা হয় আলোর ঢেউ দিয়ে। তাও সাধারণ যে কোনো আলোর নয়, দুর্লভ গ্যাস ক্রীপ্‌টন ৮৬, তারই বাতি জলের মত তরল করা নাইট্রোজেনের মধ্যে রাখবার পর যে জরদা-লাল আলো বার হয় তার-ই ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশ তেষট্টি দশমিক তিয়াত্তর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল এক মিটার।

মাথায় চরকিপাক্ লাগার দরুনই শুধু কানে দিয়ে খুশ্‌কিটা লম্বায় তিয়াত্তর ঢেউ কম কি করে বুঝলেন তা আর ঘনাদাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি নি।

ক্লোরোফর্ম গোছের অ্যানেসথেসিয়ার ওষুধে একবার অসাড় করে যা খুশি কাটা-ছেঁড়া করতে পারে ডাক্তারেরা। আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই!

টঙের ঘর থেকে একরকম পাকা কথা দিয়েই নেমে এসেছি।

আমাদের সদাশিব বাড়িওয়ালাকে চটাতে হয় চটাব। করপোরেশনের সঙ্গে মামলায় আসামী হতে হয় তাও সই। যা ঝক্কি নিতে হয় সব নিয়ে ঘনাদার ঘরের দক্ষিণের দেয়ালে জানালা একটা ফোটাবই।

কাঁচা ইট পোড়ালে যদি শক্ত হয়, তাহলে দুর্গাপুরের দুটো সাদা বেড়াল তিনটে নেংটি ধরবে না কেন।

কেন ধরবে ঘনাদা তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর অকাট্য যুক্তির শৃঙ্খলে। বনোয়ারীর বেকুফি-তে ঘনাদার মহামূল্য কান খুশ্‌কি হারালে কেন তাঁর ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে জানালা না ফোটালে নয়, তা বোঝবার ধাপগুলো হল এই: [ক] বনোয়ারী ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে কান খুশ্‌কি হারিয়েছে। [দুই] কান খুশ্‌কি ঘরে না থাকলে হারাত না। [তিন] কান খুশ্‌কি ঘরে থাকে কেন? [চার] কান চুলকোয় বলে। [পাঁচ] কান চুলকোয় কেন? [ছয়] চোখের কাজ কম। [সাত] কেন কম? [আট] ঘরে আলোর অভাব। [নয়] আলো বাড়বে কেমন করে? [দশ] দক্ষিণের দেয়ালে জানালা ফুটিয়ে!

প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা

সত্যজিৎ রায়

৭ই সেপ্টেম্বর

আজ এক মজার ব্যাপার হল। আমি কাল সকালে আমার ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি, এমন সময় আমার চাকর প্রহ্লাদ এসে খবর দিল যে একটি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কে লোক জিগ্যেস করতে প্রহ্লাদ মাথা চুলকে, বলল 'আজ্ঞে, সে তো নাম বলেনি, বাবু। তবে আপনার কাছে সচরাচর য্যামন লোক আসে ঠিক ত্যামনটি নয়।'

আমি বললাম, 'দেখা না করলেই নয়? বড় ব্যস্ত আছি যে।'

প্রহ্লাদ বলল, 'আজ্ঞে বলতেছেন বিশেষ জরুরী দরকার। না দেখা করি যাইতে চায়েন না।'

কি আর করি, কাজ বন্ধ করেই যেতে হল।

গিয়ে দেখি একটি অতি গোবেচারা সাধারণ গোছের ভদ্রলোক, বছর ত্রিশেক বয়স, পরণে ময়লা খাটো ধুতি হাতকাটা সার্টের চারটে বোতামের দুটো নেই, মুখে তিনদিনের দাড়ি, হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কি ব্যাপার জিগ্যেস করাতে ভদ্রলোক ঢোক গিলে বললেন, 'আজ্ঞে, আপনি যদি দয়া করে একবার আমাদের বাড়িতে আসতে পারেন ত বড় ভালো হয়।

আমি বললাম, 'কেন বলুন ত? আমি ত এখন বিশেষ ব্যস্ত।'

ভদ্রলোক যেন আরো খানিকটা কঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'আপনি ছাড়া আর কার কাছে যাব বলুন। আমি থাকি ঝাঝায়। আমার ছেলেটির ব্যারাম—কি যে ব্যারাম তা বুঝতেও পারছি না। আপনি হলেন এ মুল্লুকের সবচেয়ে বড় ডাক্তার, তাই আপনার কাছেই—'

আমি অনেক কষ্টে হাসি চেপে ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে বললাম 'আপনার একটু ভুল হয়েছে। আমি ডাক্তার নই, বৈজ্ঞানিক।'

ভদ্রলোক একেবারে যেন চুপ্‌সে গেলেন।

'ভুল হয়েছে? বৈজ্ঞানিক! ও, তাহলে বোধহয় ভুলই হয়েছে, কিন্তু তাহলে কোথায় যাব বলুন ত?'

'কেন, আপনাদের ওদিকে ত আরো অন্য ডাক্তার রয়েছেন।'

'তা আছে। তবে তারাও কিছু করতে পারল না আমার খোকার জন্য।'

কি হয়েছে আপনার ছেলের? কত বয়স?

'আজ্ঞে, ছেলের আমার চার পুরেছে গত জষ্টি মাসে, খোকা বলে ডাকি, ভালো নাম অমূল্য। হয়েছে কি—এই সেদিন—এই গত বুধবার সকালে—আমার উঠোনের একটা কোণে শেওলা ধরে ভারী পেছল হয়ে আছে—সেখানে খেলা করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মাথার এই বাঁ দিকটায় একটা চোট লাগল, খুব কান্নাকাটি করলে খানিকটা। পরে দেখলাম মাথার ওইখানটা ফুলেওছে বেশ। ফোলা অবিশ্যি দু'দিনেই কমে গেল, কিন্তু সে থেকে কি যে আবোল তাবোল বকছে তা বুঝতেই পারছি না। অমন কথা সে এর আগে কক্ষনো বলেনি বাবু! তবে কেমন যেন মনে হয়—বুঝতে পারি না—তবু মনে হয়—সে কথার যেন মানে আছে। তবে আমরা ত মুখ্যুসুখ্যু মানুষ পোষ্টাপিসের কেরাণী আমরা তার মানে বুঝিনা।'

'ডাক্তার বোঝেনি তার মানে?'

'আজ্ঞে না। আর সে ডাক্তার তো তেমন নয়, তাই ভাবলাম যে···আপনার কাছে···'

আমি বললাম, 'কেন, ঝাঝার ডাক্তার গুহ মজুমদারকে ত আমি চিনি, তিনি ত ভালো চিকিৎসক।'

তাতে ভদ্রলোক খুব কাতরভাবে বললেন, 'আমার কি তেমন সামর্থ্য আছে বাবু, যে আমি বড় ডাক্তারকে ডাকব! আমায় সবাই বললে যে গিরিডির শঙ্কু ডাক্তারের কাছে যাও—তিনি দয়ালু লোক, বিনি পয়সায় তোমার ছেলেকে দেখে দেবেন! তাই এলুম আর কি।'

লোকটিকে দেখে মায়া হচ্ছিল, তাই আমার ব্যাগ থেকে কুড়িটা টাকা বার করে

বললাম, 'আপনি গুহ মজুমদারকে দেখান। তিনি নিশ্চয়ই আপনার ছেলেকে ভালো করে দেবেন'।

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞভাবে টাকাটা পকেটে পুরে হাত জোড় করে মাথা হেঁট করে বললেন, 'আসি তাহলে। আপনাকে অযথা বিরক্ত করলুম—মাপ করবেন।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর নিশ্চিন্ত মনে হাঁফ ছেড়ে ল্যাবরেটরিতে ফিরে এলাম। এরা আমাকে ডাক্তার বলে ভুল করল কি করে, সেটা ভেবে যেমন হাসি পাচ্ছে, তেমন অবাকও লাগছে।

১০ই সেপ্টেম্বর

সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠা আমার চিরকালের অভ্যাস। উঠে হাত মুখ ধুয়ে একটু উশ্রীর ধারে বেড়াতে যাই। আজ প্রাতভ্রমণ সেরে ফিরে এসে দেখি ঝাঝার ডাক্তার প্রতুল গুহ মজুমদার ও সেদিনের সেই ভদ্রলোকটি আমার বৈঠকখানায় বসে আছেন। আমি ত অবাক। প্রতুলবাবু এমনিতে বেশ হাসিখুশি, কিন্তু আজ দেখলাম তিনি রীতিমত গম্ভীর ও চিন্তিত। আমাকে দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে নমস্কার করে বললেন, 'আপনি ত মশাই বেশ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন, এ-চিকিৎসা ত আমার দ্বারা সম্ভব নয়, প্রোফেসার শঙ্কু!'

আমি প্রহ্লাদকে ডেকে কফি আনতে বলে সোফায় বসে প্রতুলবাবুকে বললাম, 'কি অসুখ হয়েছে বলুন ত ছেলেটির। কষ্টটা কি?'

'কোন কষ্ট আছে বলে মনে হয় না।'

'তবে? মাথায় চোট লেগে ব্রেনে কিছু হয়েছে কি? ভুল বকছে?'

'বকছে—তবে ভুল ঠিক বলা শক্ত, এখন পর্যন্ত এমন কিছু বলতে শুনেনি যেটাকে জোর দিয়ে ভুল বলা চলে, এমন কিছু বলতে শুনেছি যেগুলো একেবারে অবিশ্বাস্য রকম ঠিক।'

'কিন্তু আমিই বা এ ব্যাপারে কি করতে পারি বলুন।'

প্রতুলবাবু ও অন্য ভদ্রলোকটি পরস্পরের দিকে চাইলেন। তারপর প্রতুলবাবু বললেন, 'আপনি একবার আমাদের সঙ্গে চলুন। আমার গাড়ি আছে—একবার দেখে আসুন অন্তত। আমার মনে হয়—আর কিছু না হোক আপনার খুব আশ্চর্য ও

ইণ্টারেষ্টিং লাগবে। সত্যি বলতে কি, কেউ যদি এর একটা কিনারা করতে পারে, তবে সেটা, আপনিই পারবেন।'

খুব একটা জরুরী কারণ না থাকলে প্রতুলবাবু আমাকে এমন অনুরোধ করতেন না সেটা জানি কাজেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গ নিতেই হল। ফিয়াট গাড়িতে করে গিরিডি থেকে ঝাঝা পেঁছাতে আমাদের লাগল ত্থ'ঘণ্টা।

পথে আসতে আসতেই জেনেছিলাম অন্য ভদ্রলোকটির নাম দয়ারাম বোস। সাত বছর হল ঝাঝার পোষ্টাপিসে চাকরি করছেন।

বাড়িতে স্ত্রী আছেন, আর ওই একটিমাত্র ছেলে অমূল্য ওরফে খোকা, বাড়িটাও দেখলাম ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে মানানসই। খোলার ছাতওয়ালা একতলা বাড়ি, ত্নটি মাত্র ঘর, আর একটা আট হাত বাই দশ হাত উঠোন—যে উঠোনে খোকা পিছলে পড়েছিল। পূব দিকে ঘরের একটা ছোট্ট খাটের উপর বালিশে মাথা দিয়ে 'খোকা' শুয়ে আছে। রোগা শরীর, মাথাটা আর চোখত্নটো বড়, চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই খোকা বলল, 'স্বাগতম'।

আমি একটু হেসে বললাম, 'তুমি সংস্কৃতে অভ্যর্থনা জানাতে শিখলে কি করে?

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে খোকা কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'সিক্স্ অ্যাণ্ড সেভেন পয়েণ্ট টু ফাইভ?'

পরিষ্কার ইংরিজি উচ্চারণ—কিন্তু এ প্রশ্নের মানে কি?

আমি দয়ারাম বাবুর দিকে চেয়ে বললাম, 'এসব কথা ও কোত্থেকে শিখল?'

দয়ারামের বদলে প্রতুলবাবু ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'যা বুঝছি যে ও সমস্ত কথা কদিন থেকে বলছে, তা ওকে কেউ শেখায় নি। ও নিজে থেকেই বলছে। সেই-খানেই ত গণ্ডগোল, অথচ খাচ্ছে দাচ্ছে ঠিকই! ঘুমটা বোধ হয় একটু কমেছে। আমরা যখন বেরিয়েছি, পাঁচটায় তখনই ও উঠে গিয়ে কথা শুরু করেছে।'

আমি বললাম, 'সকালে কি বলছিল?'

এ প্রশ্নের উত্তর খোকা নিজেই দিল। সে বলল, 'করভাস্ স্প্লেণ্ডেন্ পাসের ডোমেস্টিকাস্। আমার পিছনেই একটা চেয়ার ছিল; আমি সেটায় ধপ্ করে বসে পড়লাম, এ যে আমাদের অতি পরিচিত সব পাখির ল্যাটিন নামগুলো বলছে। ভোরে

ঘুম থেকে উঠে যে সব পাখিকে প্রথম ডাকতে শুনি সেগুলোরই ল্যাটিন নাম হল এই দুটো। করভাস্ স্প্লেণ্ডেন্ হল কাক আর পাসের ডোমেস্টিকাস্ হল চড়াই।

এবারে আমি খোকাকে জিগ্যেস করলাম, 'তোমাকে এসব নামগুলো কে শেখালে বলতে পার?'

কোন উত্তর নেই। সে একদৃষ্টে একটা দেয়ালের টিকটিকির দিকে চেয়ে রয়েছে। এবার বললাম, 'একটুক্ষণ আগে আমাকে দেখে যে কথাটা বললে সেটা কি?'

'সিক্স, এ্যাণ্ড সেভেন পয়েণ্ট টু ফাইভ।'

'তাতো বুঝলাম, কি সেটার—'

কথা শেষ করলাম না, কারণ আমার হঠাৎ খেয়াল হল আমার চশমার দুটো লেন্সের পাওয়ার হল মাইনাস সিক্স ও মাইনাস সেভেন পয়েণ্ট টু ফাইভ?

এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আর আমার জীবনে কখনো হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

এবার বিছানার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে খোকার উপর একটু ঝুঁকে পড়ে প্রতুলবাবুকে জিগ্যেস করলাম, 'ব্যথাটা মাথার ঠিক কোনখানটায় লেগেছিল বলুন ত।'

প্রতুল ডাক্তারের মুখ খোলার আগেই খোকাই জবাব দিল, 'অস্ টেমপোরালে।'

নাঃ, একেবারে অবিশ্বাস্য অভাবনীয় ব্যাপার মাথার হাড়ের ডাক্তারি নামও জেনে ফেলেছে এই সাড়ে চার বছরের ছেলে।

আমি ঠিক করলাম খোকাকে আমার বাড়িতে এনে কয়েকদিন রাখব, তাকে পর্যবেক্ষণ করব পরীক্ষা করব। মানুষের ব্রেন সম্বন্ধে অনেক কিছু স্ট্যাডি করা হয়ত এ থেকে সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমার হয়ত অনেক উপকারও হবে।

দয়ারাম ও প্রতুলবাবু দুজনেই আমার কথায় রাজি হয়ে গেলেন।

খোকার মা কেবল বললেন, 'আপনি ওকে নিয়ে যেতে চান ত নিয়ে যান, কিন্তু দয়া করে ঠিক যেমনটি ছিল, তেমনটি করে আমাদের আবার ফেরত দিয়ে যাবেন। চার বছরের ছেলের চার বছরের বুদ্ধিই ভালো ও যা কথা বলছে আজকাল, সে তো আর আমাদের সঙ্গে নয়, সে ওর নিজের সঙ্গে। আমরা ওর কথা বুঝিই না। ছেলে যেন আর আমাদের ছেলেই নেই। এতে মনে বড় কষ্ট পাই, ডাক্তারবাবু, আমার ওই একমাত্র ছেলে, তাই আমাদের কথাটা একটু ভেবে দেখবেন।'

এ রোগের ওষুধ আমারও জানা নেই তবে আমার মত বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মাথা খাটিয়ে চেষ্টা করলে এর একটা চিকিৎসা বার করা সম্ভব নয়—সেটাই বা ভাবি কি করে? তবে মুশকিল হয়েছে কি, খোকার যে জিনিসটা, হয়েছে, সেটাকে ব্যারাম বলা চলে কিনা সেখানেই সন্দেহ। তবু বুঝতে পারি, ছেলে বেশি বদলে গেলে বাপ-মায়ের কখনো ভালো লাগে না—বিশেষ করে রাতারাতি বদলালে ত কথাই নেই।

ঝাঝা ছাড়লাম প্রায় দুপুর সাড়ে এগারটায় প্রতুলবাবুই পৌঁছে দিলেন। পথে সাতাশ মাইলের মাথায় গাড়িটা হঠাৎ একটু বিগড়ে থেমে গিয়েছিল, তাতে খোকা শুধু একবার বলে, 'স্পার্কিং প্লাগ।' বনেট খুলে দেখা যায় স্পার্কিং প্লাগেই গণ্ডগোলটা হচ্ছে, এবং সেটা ঠিক করাতেই গাড়িটা চলে। এ ছাড়া আর কোন ঘটনা ঘটেনি, বা খোকাও কোন কথা বলেনি।

কাল থেকেই খোকা আমার এখানে আছে। আমার দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটায় ওকে রেখেছি। দিব্যি নিশ্চিন্তে আছে। বাড়ির কথা বা মা-বাবার কথা একবারও উচ্চারণ করেনি। আমার বেড়ালের নাম নিউটন শুনে খোকা খালি বলল 'গ্রাভিটি'। বুঝলাম স্যার আইজ্যাক নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন সেটাও খোকা কি করে জানি জেনে ফেলেছে।

বেশির ভাগ সময় খোকা চুপচাপ খাটেই শুয়ে থাকে, আর কি জানি ভাবে। আমার চাকর প্রহ্লাদ ত ওকে পেয়ে ভারি খুশি। আমি যেটুকু সময় ঘরে থাকি না, সে সময়টুকু প্রহ্লাদ ওর কাছে থাকে। তবে খোকার সঙ্গে কোন কথাবার্তা চলে না এইটেতেই তার দুঃখ। আমার কাছে তাই নিয়ে আপসোস করাতে আমি বললাম, 'কিছুদিন এখানে থাকলে আশা করছি ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।' কথাটা বলেই অবিশ্যি মনে হল যে সেটা সত্যি হবে কিনা আমার জানা নেই।

খোকার মাথাটা যাতে একটু ঠাণ্ডা হয় তার জন্য দুটো নাগাৎ ওকে একটা ঘুম পাড়ানো বড়ি গুলে খেতে দিয়েছিলাম। খোকা গেলাসটা হাতে নিয়েই বলল, 'সম্নোলিন!' অথচ দুধটা দেখে বা শুঁকে ওষুধের অস্তিত্বটা টের পাবার কোন উপায় নেই! এদিকে আমি ত মিথ্যে কথা বলতে পারি না! ধরা যখন পড়েই গেছি, তখন সেটা স্বীকার করেই বললাম, 'তোমার ঘুমলে ভাল হবে। ওটা খেয়ে নাও।'

খোকা শান্ত স্বরে বলল, 'না, ওষুধ দিও না। ভুল কোর না।'

আমি বললাম, 'তুমি কি করে জানলে আমি ভুল করেছি? তোমার কি হয়েছে তুমি জান?'

খোকা চুপ করে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। আমি আবার বললাম, 'তোমার কি কোন অসুখ করেছে? সে অসুখের নাম তুমি জান?'

খোকা কোন কথা বলল না। এ প্রশ্নের উত্তর কোনদিন তার কাছে পাওয়া যাবে কিনা জানি না। দেখি, বই পত্তর ঘেঁটে যদি কোন কুলকিনারা করতে পারি।

আজ সকাল থেকে খোকার কথা ও জ্ঞানের পরিধি অসম্ভব বেড়ে গেছে।

কাল সারাদিন নানান ডাক্তারি ও বৈজ্ঞানিক বই ঘেঁটেও খোকার এই অদ্ভুত 'ব্যারাম' সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। দুপুরবেলা আমার দোতালার স্টাডিতে বসে জুলিয়াস রেডেলের লেখা মস্তিষ্কের ব্যারামের উপর বিরাট মোটা বইটা একমনে পড়ছি, এমন সময় হঠাৎ খোকার গলা কানে এলো—'ওতে পাবে না।'

আমি অবাক হয়ে মুখ তুলে দেখি সে কখন জানি তার ঘর থেকে উঠে চলে এসেছে। এর আগে এখানে এসে অবধি সে তার নিজের ঘরের বাইরে কোথাও যায় নি, বা খাবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি।

আমি বইটা বন্ধ করে দিলাম। খোকার কথার মধ্যে এমন একটা স্থির বিশ্বাসের সুর, যে সেটা অগ্রাহ্য করার কোন উপায় নেই। একজন ষাট বছর বয়সের বুদ্ধিমান বুড়ো যদি আমায় এসে গম্ভীর গলায় বলত রেডেলের বই-এ কোন একটা জিনিস নেই, আমি হয়ত তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস নাও করতে পারতাম। কিন্তু সাড়ে চার বছরের খোকার কথায় আমার হাতের বইটা যেন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

খোকা কিছুক্ষণ ঘরে পায়চারি করে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বলল, 'টির্যানিয়াম ফসফেট।'

আশ্চর্য! এক তলায় আমার ল্যাবরেটরিতে রাখা আমার তৈরি নতুন অ্যাসিডের নাম খোকা জানল কি করে। আমি বললাম, 'ভারী কড়া অ্যাসিড।'

খোকার মুখে যেন এই প্রথম একটু হাসির আভাস দেখলাম। সে বলল, 'ল্যাবরেটরি দেখব।'

এই সেরেছে! ওকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই আমার! এ অবস্থায় ওকে ওই সব কড়া কড়া অ্যাসিড, গ্যাস ইত্যাদির মধ্যে নিয়ে গেলে যে কখন কি ক'রে বসবে তার কি ঠিক আছে? আমি তাই একটু ইতস্তত করে বললাম, ওখানে গিয়ে কি হবে?—ধূলো, তাছাড়া গন্ধও ভালো নয়। নানারকম আজে বাজে ওষুধ পত্র।'

খোকা কিছু না বলে আবার পায়চারি শুরু করল। আমার টেবিলের উপর একটা গ্লোব ছিল, সেটা সে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। গ্লোবটায় সাউথ আমেরিকার একটা জায়গায় খানিকটা রং চটে গিয়েছিল, ফলে কিছু জায়গার নাম চিরকালের মত সেটা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। খোকা কিছুক্ষণ সেই ছোট্ট রং ওঠা জায়গাটার দিকে চেয়ে থেকে, তারপর আমার টেবিলের উপর থেকে ফাউন্টেন পেন তুলে খুদে খুদে অক্ষরে সেই জায়গাটায় কি জানি লিখল। শেষ হলে পর গ্লোবটার উপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলাম লিখেছে Serinha, Jacobina Campo, Formosa। এই তিন তিনটে নামই গ্লোবটা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে নিয়ে আজ সারাদিন খোকা যে কত কি বলেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। আইনস্টাইনের ইকুয়েশন, আমার নিজের পোলার রিপলেয়ন থিয়োরি, চাঁদে কোন উপত্যকা সব চেয়ে বড়, কোন পাহাড় সব চেয়ে উঁচু, বুধগ্রহের আবহাওয়ায় কেন এত কার্বন ডায়ক্সাইড, এমন কি আমার ঘরের বাতাসে কি কি জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ সবই খোকা আউড়ে গেছে। এক ফাঁকে একটা আস্ত মাদ্রাজি গান গেয়েছে ও হ্যামলেট থেকে 'টু বী অর নট টু বী' আবৃত্তি করেছে। বিকেল চারটে নাগাদ আমি আমার ঘরে বসে কাজ করছিলাম, প্রহ্লাদ খোকার কাছে বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আর সেই ফাঁকে খোকা তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে প্রহ্লাদ ঘুম থেকে উঠে ওকে দেখতে না পেয়ে আমার কাছে এসেছে। তারপর আমরা দুজনে নিচে গিয়ে দেখি সে আমার ল্যাবরেটরির তালা দেওয়া দরজাটা ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখছে।

আমি অবশ্যি তাকে ধমক টমক কিছুই দিলাম না, কেবল ওর হাতটা ধরে বললাম, 'চল, আমরা পাশের বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।' সে অমনি বাধ্য ছেলের মত

আমার সঙ্গে বৈঠকখানায় সোফায় গিয়ে বসল, আর ঠিক সেই সময়ই এসে পড়লেন আমার পড়শী অবিনাশবাবু।

তাঁর আবির্ভাবটা আমার কাছে খুব ভাল লাগল না, কারণ অবিনাশবাবু ভারি গল্পে মানুষ ; খোকাকে দেখে এবং তার কীর্তি-কলাপ শুনে যদি আর পাঁচজনের কাছে গল্প করেন তাহলে আর রক্ষে নেই। আমার বাড়িতে একেবারে দেখতে দেখতে মেলা বসে যাবে, আর সেই মেলার প্রধান ও একমাত্র আকর্ষণ হবে খোকা। বলা বাহুল্য খোকাকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে অবিনাশবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন ইনি আবার কোত্থেকে আমদানি হলেন? গিরিডি শহরে ত এনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না!

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'ও আমার কাছে এসে কিছুদিন রয়েছে। এক জ্ঞাতির ছেলে?' অবিনাশবাবু বাচ্চাদের আদর করার মত করে তাঁর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে খোকার গালে একটা টোকা মেরে বললেন, 'কি নাম তোমার খোকা, অ্যাঁ?' খোকা কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে অবিনাশবাবুর মুখের দিয়ে চেয়ে বলল, 'এক্টামরফিক সেরিপ্রেটনিক।'

অবিনাশবাবু চমকে উঠে দুচোখ বড় বড় করে বললেন, 'ও বাবা এ কোন দিশি নাম ও অধ্যাপক মশাই!'

আমি একটু হেসে বললাম, 'ওটা ওর নাম নয় অবিনাশবাবু, ও যেটা বলল সেটা হচ্ছে আপনার বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা। ওর নাম আসলে, অমূল্যকুমার বসু, ডাকনাম খোকা।'

'বৈজ্ঞানিক নাম?' অবিনাশবাবু দেখলাম বেশ অবাক হয়েছেন। 'আপনি আজকাল কচি খোকাদের ধরে ধরে ওই সব শেখাচ্ছেন নাকি?'

এ কথার উত্তরে হয়ত আমি চুপ করেই থাকতাম, কিন্তু আমার বদলে খোকাই মন্তব্য করে বসল।

'উনি আমায় কিছুই শেখান নি।'

এই বলেই খোকা চুপ করে গেল।

এরপরেই অবিনাশবাবু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চা কফি কিছু না খেয়ে উঠে পড়লেন। যে রকম ভাব নিয়ে গেলেন, তাতে আমার ভয়

হচ্ছে উনি খোকার খবরটা না রটিয়ে ছাড়বেন না। তেমন উৎপাত আরম্ভ হলে বাড়িতে পুলিশ রাখবার বন্দোবস্ত করব। এখানকার ইন্‌স্‌পেক্টর হালদারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট খাতির আছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর

খোকার বিচিত্র কাহিনীর যে এইভাবে পরিসমাপ্তি ঘটবে তা ভাবতেই পারিনি। গত দু'দিন এক মুহূর্ত ডায়রি লেখার ফুরসৎ পাইনি। কি ঝক্কি যে গেছে আমার উপর দিয়ে সেটা একমাত্র আমিই জানি। কারণটা অবিশ্যি যা ভয় পেয়েছিলাম। তাই-ই। সেদিন অবিনাশবাবু আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে ফেরার আগে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে খোকার কীর্তির বর্ণনা দেন। সেদিন সন্ধ্যা থেকে লোকজন উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করে। খোকাকে আমি তার দোতলার ঘরেই রেখেছিলাম, এবং সে ঘুমোচ্ছে এই বলে লোক তাড়ানোর মতলব করেছিলাম। কিন্তু সারাক্ষণই ঘুমোচ্ছে একথাটা ত লোকে বিশ্বাস করবে না। রাত আটটা নাগাদ যখন আমার নিচের বৈঠকখানায় রীতিমত ভীড় জমে গেছে, আর লোকেরা শাসাচ্ছে যে খোকাকে না দেখে সেখান থেকে তারা নড়বে না, তখন বাধ্য হয়েই খোকাকে নিয়ে আসতে হল। আর অমনি সকলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কি। আমি যথা সম্ভব দৃঢ়ভাবে বললাম, 'দেখুন-মাত্র সাড়ে চার বছরের ছেলে—আপনারা যদি এভাবে ভীড় করেন, তাহলে ত আলোবাতাস বন্ধ হয়ে এমনিতেই তার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

তখন তারা বলল 'তাহলে ওকে বাইরে আপনার বাগানে নিয়ে আসুন না।'

শেষ পর্যন্ত তাই হল। খোকাও বাগানে আসেনি কখনো—এসেই তার মুখে কথা ফুটল। সে ঘাস থেকে আরম্ভ করে যত ফুল ফল গাছ পাতা ঝোপ ঝাড় বাগানে রয়েছে, তার প্রত্যেকটির ল্যাটিন নাম আউড়ে যেতে লাগল। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবার এখানকার মিশনারি ইস্কুলের হেডমাস্টার ফাদার গলওয়ে ছিলেন। তিনি আবার বটানিস্ট। খোকার গুণের বহর দেখে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে আমার বেতের চেয়ারে বসে পড়লেন।

এই ত গেল পরশুর কথা। কাল আমার বাড়িতে কত লোক এসেছিল সেটা খোকা নিজে রাত্রে বিছানায় শোবার সময় বলল। তার কথায় জানলাম, লোকের হিসেব হচ্ছে—সবশুদ্ধ তিনশ' ছাপান্ন জন, তার মধ্যে তিনজন সাহেব, সাতজন উড়িয়া,

পাঁচজন আসামী, একজন জাপানী, ছাপান্নজন বিহারী, তুজন মাদ্রাজী আর বাকী সব বাঙালী।

গতকাল সকালে কলকাতা থেকে তিনজন খবরের কাগজের রিপোর্টার এসে হাজির। তারা খোকার সঙ্গে কথা না বলে ছাড়বে না। খোকা কথা বলল ঠিকই, কিন্তু তাদের কোন প্রশ্নের জবাব সে দিল না। কেবল তিনজনকে আলাদা করে, তাদের কাগজে কত ছাপার কালি খরচ হয়, ক'লাইন খবর তাতে থাকে আর কত সংখ্যা কাগজ ছাপা হয়—এই সমস্ত হিসেব তাদের দিয়ে দিল।

একজন রিপোর্টারের সঙ্গে একটা ফটোগ্রাফার এসেছিল, সে একসময় ফ্ল্যাশ-ক্যামেরা দিয়ে খোকার একটি ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা উঁচিয়ে দাঁড়াল। খোকা বলল, 'ফ্ল্যাশ না। চোখে লাগে।'

ফটোগ্রাফার একটু হেসে খোকা-খোকা গলা ক'রে বলল, 'একটা ছবি, খোকাবাবু। দেখনা কেমন সুন্দর ছবি হবে তোমার।'

এই বলে তুলতে গিয়ে কিছুতেই আর ফ্ল্যাশ জ্বলে না—অথচ বাল্‌ব ঠিকই পুড়ে যাচ্ছে। এই করে সাতখানা বাল্‌ব পুড়ল—কিন্তু ফ্ল্যাশ আর জ্বলল না।

বিকেলে এক ভদ্রলোক এলেন যিনি সমীরণ চৌধুরী বলে নিজের পরিচয় দিলেন, কলকাতা থেকে আসছেন। বললাম, 'কি প্রয়োজন আপনার?'

ভদ্রলোক বললেন তিনি নাকি একজন ইম্প্রেসারিও। অর্থাৎ বড় বড় নাচিয়ে বাজিয়ে গাইয়ে ম্যাজেশিয়ান ইত্যাদির শো-এর বন্দোবস্ত করে দেন। তাঁর ইচ্ছে খোকাকে-তিনি কলকাতার নিউ এম্পেয়ার স্টেজে উপস্থিত করবেন। খোকা সেখানে প্রশ্নের জবাব দিয়ে, মন থেকে অঙ্ক কষে, ল্যাটিন আউড়ে, গান গেয়ে লোককে অবাক করে দেবে। এথেকে খোকার খ্যাতিও হবে, রোজগারও হবে। তেমন বুঝলে বিলেতে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করা যেতে পারে।

আমি বললাম, 'খোকার মা-বাবার অনুমতি ছাড়া আমি এ ব্যাপারে মত দিতে পারি না। ওর বাবার ঠিকানা আমি দিয়ে যাচ্ছি, আপনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলুন।'

সন্ধ্যার দিকে পাঁচ-ছশো লোকের সামনে বসে নানারকম আশ্চর্য কথা বলার পর খোকা হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'মির ইস্ট্ মুয়েডা।'

আমার ভাষা অনেকগুলোই জানা আছে—জার্মানটা রীতিমত সড়গড়। বুঝলাম খোকা জার্মানে বলছে—'আমি ক্লান্ত'।

আমি তৎক্ষণাৎ সমবেত লোকদের বললাম যে খোকা এখন ভেতরে যাবে, সে বিশ্রাম করতে চায়। লোকেরা হয়ত এ কথায় একটু গোলমাল করতে পারত, কিন্তু পুলিশ থাকায় ব্যাপারটা বেশ সহজেই ম্যানেজড্ হয়ে গেল।

খোকাকে শোয়ালাম।

প্রায় যখন বারোটা বাজে, তখন দেখে মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি হাতের বইটা রেখে বাতিটা নিবিয়ে দিলাম, আমার মনটা ভালো ছিল না। আমি নিজে নির্জনতা ভালোবাসি। গত দু-দিন ভীড়ের ঠেলায় আমারও ক্লান্ত লাগছিল, যদিও ক্লান্তি জিনিসটা আমার সহজে আসে না, চার দিন চার রাত্রি না ঘুমিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে, এবং কোনবারই কাবু হইনি।

আসলে কাল খোকার ক্লান্তির আভাস পেয়েই আরো চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কি উপায় হবে এই আশ্চর্য খোকার? তার মা বাবার কাছে যদি তাকে ফেরত দিয়ে আসি, তাহলেই বা সে রেহাই পাবে কি করে? সেখানেও ত উৎপাত শুরু হবে। এর একটা ব্যবস্থা করব বলে ত আমি নিজেই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। আর এমনও নয় যে অন্য কোন একটা বড় ডাক্তারের পরামর্শ নিলেই একটা উপায় হয়। ব্রেনে কি কি জাতীয় গোলমাল হতে পারে না-পারে সেই নিয়ে আগেই আমার অনেক পড়াশুনা ছিল। তাছাড়া গত কদিনে আমি একমাত্র এই বিষয়টা নিয়েই এগারো-খানা বই পড়ে ফেলেছি। কোনখানেই খোকার যেটা হয়েছে সে জাতীয় ঘটনার কোন উল্লেখ পাই নি। পৃথিবীর ইতিহাসে খোকার এ ঘটনা একেবারে অনন্য ও অভূতপূর্ব এ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই।

এইসব ভাবতে ভাবতে আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়াল নেই! ঘুমটা ভাঙল আচমকা একটা বাজ পড়ার শব্দ। উঠে দেখি ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জন এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় পাশের বিছানার দিকে চেয়ে দেখি খোকা নেই!

আমি ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। কি জানি কি মনে হল—আমার বালিশটা তুলে দেখি, তার তলা থেকে আমার চাবির গোছাটাও উধাও। আর

এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে এসে ল্যাবরেটরির দিকে গিয়ে দেখি দরজা হাঁ করে খোলা, আর ভিতরে বাতি জ্বলছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে যা দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে এলো। খোকা আমার কাজের টেবিলের সামনে টুলের উপর বসে আছে। তার সামনে টেবিলের উপর সার করে সাজানো আমার বিষাক্ত, মারাত্মক অ্যাসিডের সব বোতল। বুনসেন বারনাটোও জ্বলছে, আর তার পাশেই ফ্লাস্কে কি যেন একটা তরল পদার্থ সবে মাত্র গরম করা হয়েছে। খোকার হাতে এখন টির‍্যানিয়াম ফসফেটের বোতল। সেটা কাৎ করে তার থেকে কয়েক ফোঁটা অ্যাসিড সে ফ্লাস্কটার মধ্যে ঢেলে দিতেই তার থেকে ভক্ ভক্ করে হলদে রং-এর ধোঁয়া বেরোল, সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভরে গেলো একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে, যাতে আমার প্রায় চোখে জল এসে গেল। এবার, আমি ঘরে ঢুকেছি বুঝতে পেরে খোকা আমার দিকে ফিরে চাইল।

'অ্যানাইহিলিন কোথায়?' খোকা গর্জন করে উঠল।

অ্যানাইহিলিন? খোকা আমার অ্যানাইহিলিন চাইছে? তার মত সাংঘাতিক অ্যাসিড ত আর নেই। ও অ্যাসিড দিয়ে খোকা করবে কি? ওটা ত আমার আলমারির উপরের তাকে বন্ধ থাকে। কিন্তু যে সব জিনিস খোকা এতক্ষণ ঘাঁটা-ঘাঁটি করছে তাতেও প্রায় খান ত্রিশেক হাতিকে অনায়াসে ঘায়েল করা চলে!

আবার আদেশ এলো—'অ্যানাইহিলিন দাও। দরকার এক্ষুনি!'

আমি নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে খোকার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'খোকা তুমি যে সব জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ, সেগুলো ভালো না। হাতে লাগলে হাত পুড়ে যাবে, ব্যথা পাবে। তুমি আমার সঙ্গে ওপরে ফিরে চলো, এসো।'

এই বলে হাতটা বাড়িয়ে ওর দিকে একটু এগিয়ে গেছি, এমন সময় খোকা হঠাৎ টির‍্যানিয়াম ফসফেটের বোতলটা হাতে নিয়ে এমন ভাবে সেটাকে তুলে ধরল, যে আর এক পা যদি এগোই আমি তাহলেই যেন সে সেটা আমার দিকে ছুঁড়ে মারবে। আর তাহলেই—মৃত্যু না হলেও—আমি যে চিরকালের মত পুড়ে পঙ্গু হয়ে যাব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

খোকা অ্যাসিডের বোতলটা আমার দিকে তাগ করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল 'অ্যানাইহিলিন দাও—ভালো চাও ত দাও।'

সত্যজিৎ রায়

এ অবস্থা থেকে আর বেরোবার কোন উপায় নেই দেখে—এবং এত অ্যাসিড হ্যাণ্ডল করেও খোকা জখম হয়নি দেখে একটা ভরসা পেয়ে আমি আলমারিটা খুলে একেবারে ওপরে তাকের পিছন থেকে অ্যানাইহিলিনের বোতলটা বার করে খোকার সামনে রেখে মনে মনে ইষ্ট নাম জপ করতে লাগলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম, যে অ্যাসিডের বোতলটা খুলে তার থেকে অত্যন্ত সাবধানে ঠিক তিন ফোঁটা অ্যাসিড খোকা তার সামনের ফ্লাস্কটায় ঢালল। তারপর আমি কিছু করতে পারার আগেই অবাক হয়ে দেখলাম যে খোকা তার নিজের তৈরি সবুজ রঙের মিক্‌সচার ঢক্ ঢক্ করে চার ঢোকে গিলে ফেলল। আর পরমুহূর্তেই তার শরীরটা টেবিলের উপর কাৎ হয়ে এলিয়ে পড়ল।

আমি দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে একেবারে সোজা দোতলায় তার খাটে নিয়ে গিয়ে ফেললাম। তার নাড়ী আর বুক পরীক্ষা করে দেখলাম কোন গোলমাল নেই, ঠিক চলছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসও ঠিক চলছে, মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন নেই, বরং বেশ শান্ত বলেই মনে হচ্ছে। অজ্ঞান যে হয়েছে তাও মনে হল না। ভাবটা ঘুমের—গভীর ঘুমের।

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। আমিও চুপ করে খোকার খাটের পাশে বসে রইলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে বৃষ্টি থেমে মেঘ কেটে যেতে দেখলাম ভোর হয়ে গেছে। কাক চড়ুই ডাকতে শুরু করেছে।

ঠিক ছটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় খোকা একটু এপাশ ওপাশ করে চোখ মেলে চাইল। তার চাহনিতে কেমন যেন একটা নতুন ভাব। একটুক্ষণ এদিক ওদিক দেখে একটু কাঁদো কাঁদো ভাব করে খোকা বলল, 'মা কোথায়? মা'র কাছে যাব।'

আধ ঘণ্টা হল খোকাকে ঝাঝায় তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। ঝাঝা যাবার পথে গাড়িতেই খোকার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। যখন চলে আসছি, তখন সে তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত নাড়িয়ে বলল, 'আমায় লজঞ্চুস এনে দেবে দাদু, লজঞ্চুস?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয় দেবো। কালই আবার গিরিডি থেকে এসে তোমায় লজঞ্চুস দিয়ে যাব।'

মনে মনে বললাম, 'খোকাবাবু, একদিন আগে হলেও তুমি আর লজঞ্চুস চাইতে না—তুমি চাইতে দাঁতভাঙ্গা ল্যাটিন নামওয়ালা কোন এক বিচিত্র, বিজাতীয় বস্তু।

পুরনো প্রাণীদের কাহিনী

সেকালের লড়াই

সুকুমার রায়

সন্দেশে তোমরা নানারকম জানোয়ারের লড়াইয়ের কথা পড়েছ। কিন্তু বাস্তবিক লড়াইয়ের মতো লড়াই কাকে বলে যদি জানতে চাও তবে সেকালের জানোয়ারদের খোঁজ নিতে হয়। যে কালের কথা বলছি সে সময়ে মানুষের জন্ম হয়নি—সে প্রায় লাখ লাখ বছরের কথা। সে সময়কার জন্তুরা ত এখন বেঁচে নেই, তাদের খোঁজ নেবে কি করে? খোঁজ নেবার উপায় আছে।

যে-সকল পণ্ডিতেরা নানারকম জানোয়ারের শরীর পরীক্ষা করে থাকেন তাঁরা এক একটা জানোয়ারের সামান্য দু-একটা হাড়, দাঁত শরীরের কোন টুক্‌রো দেখে সেই জানোয়ার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলে দিতে পারেন যে শুনলে অবাক হতে হয়। সে আমিষ খায় কি নিরামিষ খায়, জলে থাকে কি ডাঙায় থাকে, দু পায়ে চলে না চার পায়ে চলে, সে কোন জাতীয় জন্তু, এসব কথা শুধু খানিকটা কঙ্কাল পরীক্ষা করে চট্ করে বলা যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় পাহাড় কাটতে বা মাটি খুঁড়তে গিয়ে এমন সব হাড় পাওয়া যায় যেটা আমাদের জানা কোন জন্তুর হাড় হতেই পারে না। মনে কর, একটা পায়ের টুকরা পাওয়া গেল প্রায় পাঁচ হাত লম্বা আর একটা হাতির পায়ের

চেয়েও মোটা। সে হাড় আর এখন হাড় নেই, সে কোন্‌কালে পাথর হয়ে গিয়েছে কিন্তু তার চেহারাটা সেই রকমই আছে। এই সব হাড় পরীক্ষা করে সেকালের অদ্ভুত জন্তু সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানা গিয়েছে।

মনে কর, একটা পাথর কাটতে গিয়ে তার মধ্যে একটা জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেল—সে পাথর এক সময়ে নরম মাটি ছিল—জানোয়ারটা তার মধ্যে মারা যায়। ক্রমে সেই নরম মাটি জমে সেই হাড়গোড় শুদ্ধ পাথর হয়ে গেছে। মাটি জমে পাথর হতে হয়ত কত লাখ বৎসর লেগেছে, তারপরে কত হাজার বৎসর কেউ তার কথা জানতে পারেনি। এতদিন পরে মানুষ আবার জানোয়ারের সন্ধান পেল! পণ্ডিতেরা সেই পাথর পরীক্ষা করে হয়ত বলবেন এটা অমুক যুগের পাথর। তারপর হাড় পরীক্ষা করে জানোয়ারটার সম্বন্ধেও নানা কথা বলবেন। যদি অনেকগুলো হাড় পাওয়া যায় তবে হয়ত জানোয়ারটার একটা মোটামুটি চেহারাও খাড়া করতে পারবেন।

এই রকম করে কত অদ্ভুত জানোয়ারের যে খবর পাওয়া গেছে সে কথা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। প্লীসিও সরাস (অর্থাৎ 'প্রায় কুমির জাতীয়') জানোয়ারটির গলা সরু ছিল আর লম্বায় প্রায় ২৫।৩০ হাত হলেও মোটের উপর নিরীহ ছিল। আরেকটা ছিল ইকথিয়ো সরাস (মাছ কুমির)। আর দুটো জানোয়ার ছিল মেগালোসরাস আর ইগুয়ানোডন, ইগুয়ানোডন দেখতে ভয়ানক বটে, কিন্তু নিরামিষ ভোজী, মেগালোসরাস আমিষ ভোজী। এরা দুজনেই হাতির চেয়ে বড় ছিল।

সেকালের কুমিরদের পিছনের পা দুটোর গড়ন সাংঘাতিকরকম মজবুত—লড়ায়ের সময় পিছনের পা দুটোই আক্রমণ কিংবা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করত। এদের নাম টিরানোসরাস অর্থাৎ অত্যাচারী কুমির। এরাও হাতীর চেয়ে বড় ছিল।

এরকম আরও কত জানোয়ার সেকালে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমরা যদি তখন বেঁচে থাকতাম তাহলে কি মুশকিল হত বল দেখি? এতগুলো হাতির চেয়ে বড় হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে আমাদের দশাটা কেমন হত একবার ভেবে দেখ। কয়েক বৎসর আগে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়া জঙ্গলে সেকালের জন্তু এখনও আছে। একজন সাহেব অনেক লোকজন নিয়ে খুঁজতে গিয়েছিলেন; কিন্তু তাদের দেখা পেলেন না।

প্রাণী জগতের কাহিনী

পশুপাখীর পরিচয়

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

তোমাদের মধ্যে যাহারা মাছ ও চিংড়ি খাও, তাহারা একটা বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। মাছের শরীরে কাঁটা অর্থাৎ হাড় আছে, কিন্তু চিংড়ির তাহা নাই। মাছও এক রকম প্রাণী, চিংড়িও এক রকম প্রাণী ; অথচ একটির হাড় আছে, অন্যটির তাহা নাই। এইরূপ কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, পাখী, সাপ, ব্যাঙ্ প্রভৃতির শরীর পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের সকলেরই হাড় আছে ; কিন্তু মশা মাছি, পিঁপড়া, ফড়িং, কেঁচো, শামুক প্রভৃতির শরীরে হাড়ের কোন চিহ্নই নাই। এখন বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, পৃথিবীতে যত রকম জীবজন্তু আছে, তাহাদিগকে মোটামুটি দুই দলে ভাগ করা যায়। এক দলের শরীরে অস্থি অর্থাৎ হাড় আছে, আর এক দলের তাহা নাই।

সম্প্রতি আমরা কেবল হাড়ওয়ালা জন্তুদিগের কথাই বলিব। ইহাদের সকলেরই পিঠে লম্বালম্বি একটা অস্থিমালা থাকে ; উহা অনেকগুলি ছোট ছোট অস্থিখণ্ডে গ্রথিত। ঐ অস্থিমালার নাম **মেরুদণ্ড** বা পিঠের দাঁড়া। যে কোন জন্তুর দেহে হাড় আছে তাহারই এই মেরুদণ্ড আছে ; আর যাহার হাড় নাই, তাহার মেরুদণ্ডও নাই। সুতরাং জন্তুগণের এক দলকে **মেরুদণ্ডবিশিষ্ট** এবং অপর দলকে **মেরুদণ্ডহীন** বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুগণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে—

কাহারও কাহারও একেবারে ছানা হয়, আর সেই ছানা শৈশবে কেবল মায়ের স্তনের দুগ্ধ পান করিয়াই বাঁচিয়া থাকে। ইহাদিগকে স্তন্যপায়ী বলে। যেমন: মানুষ, বানর, কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভালুক, গরু, ছাগল, বাদুড়, তিমি প্রভৃতি।

কোন কোনটার সর্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। ইহাদের একেবারে ছানা হয় না; প্রথমে ডিম হয়, পরে সেই ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইয়া থাকে। ইহাদিগকে পক্ষী বলে। যেমন: কাক, চিল, শালিক, ময়না, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি।

কোন কোনটা বুকে ভর দিয়া চলে। ইহারাও পাখীদের মত ডিম পাড়ে। পরে সেই ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। ইহাদিগকে সরীসৃপ বলে। যেমন: টিকৃটিকি, কুমীর, সাপ, গোসাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি।

কোন কোনটা নিতান্ত ছোটবেলা মাছের মত জলের মধ্যে বাস করে এবং মাছেরই মত ফুল্‌কা দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে, কিন্তু কিছুকাল পরে ইহাদের আকার একেবারে বদলাইয়া যায়; তখন ফুস্‌ফুস্ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে। ইহাদিগকে উভচর বলে। যেমন: ব্যাঙ্, নিউট্।

কোন কোনটা বরাবর জলেই বাস করে। জল ছাড়া বেশীক্ষণ বাঁচে না। ইহাদের কানকুয়ার নীচে লাল রঙের ফুল্‌কা থাকে। সেই ফুল্‌কা দিয়াই ইহারা জলের মধ্যে নিশ্বাস গ্রহণ করে। ইহাদিগকে মৎস্য বলে। যেমন: রুই, কাত্‌লা প্রভৃতি।

পক্ষীর পরিচয়

পক্ষী মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণিগণের দ্বিতীয় শাখার অন্তর্গত। পশুদের প্রায় সকলেরই শরীরে লোম আছে, পাখীদের কিন্তু লোম নাই। লোমের পরিবর্তে ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পাখীর পালক তিন রকমের হইয়া থাকে। ইহাদের ডানা ও পুচ্ছে যে সকল বড় বড় পালক দেখা যায় সেগুলিকে ইংরাজিতে 'কুইল' এবং বাঙ্গলায় 'বীয়ের' পালক বলে; আর অন্যান্য অঙ্গে পশমের মত যে সকল ছোট ছোট কোমল পালক থাকে সেইগুলিকে 'আচ্ছাদক' বা 'পর' বলে। আরেক রকম পালক হয় মাথার চুলের ন্যায় তাহাকে 'ফিলো' (Filo) বলে। অন্যান্য পালক তুলিয়া ফেলিলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পায়রার পালক তুলিয়া ফেলিলেই এই পালক সর্বাপেক্ষা ভাল বুঝা যায়। এই তিন রকম পালকই খুব হাল্কা।

শুধু যে পাখীর পালকই হাল্কা তাহা নহে, ইহাদের শরীরের অনেকগুলি বড় বড় হাড় ঠিক বাঁশের মত ফাঁপা সুতরাং বিলক্ষণ হাল্কা। পাখী শূন্যে বিচরণ করিয়া থাকে। শরীর হাল্কা না হইলে বাতাসের মধ্যে ভাসিবে কিরূপে? ফাঁপা ও হাল্কা হইলেও এই সকল হাড় কিন্তু বেশ শক্ত।

সকল পাখীর বুকের হাড় এক রকম নহে। যাহারা উড়িতে পারে, তাহাদের বুকের হাড় চওড়া এবং ঐ সকল হাড়ের তলদেশের মধ্যস্থল 'জলিবোট'-নৌকার তলার মত প্রলম্বিত। উড়িবার সময় ইহাদিগকে ক্রমাগত ডানা নাড়িতে হয়; তাহাতে যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন। বুকের চওড়া হাড় ও তৎসংলগ্ন মাংসপেশী হইতেই ইহারা সেই শক্তি সংগ্রহ করে। কিন্তু যে সকল পক্ষী উড়িতে পারে না, তাহাদের বুকের হাড় সাধারণ নৌকার তলদেশের ন্যায় গোলাকার।

মানুষ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতির যেমন হাত বা সম্মুখের পা আছে, পাখীদেরও তেমনি ডানা আছে। পশু ও পক্ষীর এই দুই অঙ্গে কোন প্রভেদ নাই। একের হাত বা পা অপরের ডানাতে পরিণত হইয়াছে। কেবল পাখীদের উড়িবার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া উহা ভিন্ন আকার পাইয়াছে মাত্র। ডানার পালকগুলি ইহাদিগকে উড়িতে এবং পুচ্ছের পালকগুলি, নৌকার হালের মত, গতি নিয়মিত করিতে ও ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঘুরিতে ফিরিতে সাহায্য করে।

পশুদের যেমন ঠোঁট, পাখীদের তেমনি চঞ্চু। পাখীর উপর ও নীচের চোয়াল শৃঙ্গময় পদার্থে আবৃত হইয়া চঞ্চুতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের চঞ্চুর মূলে নাসিকার এবং চক্ষুর পাশে কর্ণের ছিদ্র থাকে। পালক সরাইয়া ফেলিলেই তাহা দেখা যায়। পাখীর দাঁত নাই, জিভ্ আছে। কেবল ঈগল, বাজ-জাতীয় পক্ষীদের চঞ্চুতে একটি দাঁতের মত আছে তাহাকে 'ফেস্টন' বলে। আর দাঁত আছে 'করমোরাণ্ট'দের। বেশীর ভাগ পাখীর জিভও শৃঙ্গময় পদার্থে গঠিত। উহা খাদ্য-দ্রব্য গিলিতে সাহায্য করে বটে, কিন্তু আস্বাদ গ্রহণের পক্ষে কোন কাজেই আসে না।

পাখীর পায়ের কাজও অদ্ভুত। পায়ের মাংসপেশী এরূপ ভাবে গঠিত যে, পাখী পা বাঁকাইলে, উপরদিক হইতে উহাতে টান পড়ে। তাহার ফলে পায়ের আঙ্গুলগুলি মুড়িয়া দুমড়াইয়া বন্ধ হইয়া যায়। পাখীর ইচ্ছাপূর্বক পা সোজা বা বন্ধ হয় বলিয়া, ঘুমন্ত অবস্থাতেও গাছের শাখা হইতে ইহাদের পড়িয়া যাইবার

সম্ভাবনা নাই ! কারণ, ডালে বসিবামাত্র শরীরের ভারে ইহাদের পা আপনা-আপনি বাঁকিয়া যায়, আর আঙ্গুলগুলিও সেই মুহূর্তে তুমড়াইয়া খুব জোরে শাখা আঁকড়াইয়া ধরে। সুতরাং ইহারা পড়িয়া যাইবে কিরূপে ?

পশু অপেক্ষা পাখীর রক্ত গরম। সরীসৃপ ও মাছের রক্ত ঠাণ্ডা। ইহাদের একেবারে ছানা হয় না। প্রথমে ডিম হয়। ধাড়ী পাখী ডানায় ঢাকিয়া সেই ডিমে তা দিয়া থাকে। পাখীর শরীরের উত্তাপে ডিমের ভিতর ছানা বর্দ্ধিত হয় এবং যথা সময়ে চঞ্চুর দ্বারা খোলা ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসে।

পাখীর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি খুবই উন্নত ধরনের এবং প্রখর, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি একেবারে নাই। ইহাদের চক্ষুর কার্য্য খুব আশ্চর্য্যজনক। অপর কোন প্রাণীরই এইরূপ অদ্ভুত শক্তি নাই। নিমেষের মধ্যে ইহাদের চক্ষু দূরবীণ হইতে অনুবীক্ষণে পরিণত হয়।

পক্ষীর পূর্বপুরুষ

পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ হাজার রকমের পক্ষী আছে। এখন বিভিন্ন পক্ষীদের সম্বন্ধে কিছু জানিবার পূর্বে আকাশে উড্ডীয়মান এই জীবটির উৎপত্তির বিবরণ জানিয়া রাখ।

বর্তমান কালে আমরা যে সকল জীব-জন্তু দেখিতে পাই, ইহারা যে ঠিক ইহাদের আদি পূর্বপুরুষের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা এই সকল জীবের সুদূর ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা যে ঠিক ইহাদের আকার প্রাপ্ত হইবে, তাহা নহে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, এক জাতীয় জীব কালক্রমে বংশপরম্পরায় এতটা পরিবর্তিত হইয়া যায় যে, উহাদের পূর্বপুরুষ এবং পরবংশীয়দের মধ্যে আকৃতিগত কোনই সাদৃশ্য থাকে না। এইরূপে এক জাতি হইতে ক্রমে ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়।

পক্ষীর পূর্বপুরুষ সরীসৃপ। টিক্‌টিকি, গিরগিটির বংশ হইতেই পক্ষী উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমেই আমাদের মনে বিস্ময় জাগে যে সুন্দর সাবলীল গতি বিশিষ্ট গরমরক্ত পক্ষী আর কোথায় কদাকার ঠাণ্ডারক্ত সরীসৃপ ! কিন্তু এই পরিবর্তন এক বৎসরে বা এক শত বৎসরে হয় নাই ; অতি অল্পে অল্পে বহু যুগ ধরিয়া এই পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। এ কথা আজ অবিশ্বাস করিবার কোন উপায়ই নাই। [সংক্ষেপিত]

সংখ্যার ফ্যালাসি নিয়ে

সংখ্যা নিয়ে

বিবেক রায়

ইংরাজীতে ফ্যালাসি (fallacy) নামে একটি শব্দ আছে। বাংলায় এর মানে করলে দাঁড়ায় 'ভুল যুক্তি'। গণিতের ক্ষেত্রে এই ভুল যুক্তি প্রয়োগ করলে অঙ্কের উত্তর ভুল হবেই। কিন্তু 'ফ্যালাসি'র মজা হ'চ্ছে এই যে, যুক্তিতে ভুল থাকলেও চট্ ক'রে তা ধরা যায় না। আমাদের কাছে ভুল উত্তরটাকেই তখন ঠিক বলে মনে হয়। আমরা হই বিভ্রান্ত।

নীচের উদাহরণটি দেখলেই এই 'ফ্যালাসি' বা 'ভুল যুক্তি' সম্পর্কিত ধারণাটা স্পষ্ট হবে।

মনে কর $x=0$

$\therefore\ (x)(x-1)=(0)(x-1)$

$\therefore\ (x)(x-1)=0$

$\therefore\ x-1=0$

$\therefore\ x=1$

$\therefore\ 0=1$ (x এর মান 0 বসিয়ে)

কিন্তু শূন্য তো কখনই 1 এর সমান হতে পারে না!

নিচের অংক কয়টি দেখলে ফ্যালাসি সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

(i) $2=0$

আমরা জানি $\sqrt{m}\times\sqrt{n}=\sqrt{mn}$

আবার $\sqrt{-1}\times\sqrt{-1}=\sqrt{(-1)(-1)}$

$\therefore \quad (\sqrt{-1})^2 = \sqrt{1^2}$

$\therefore \quad -1 = 1$

$\therefore \quad -1 - 1 = 0$

$\therefore \quad -2 = 0$

বা $2 = 0$ (প্রমাণিত)

(ii) $2 = 1$

মনে করি $x = 2$

উভয় পক্ষকে $(x - 1)$ দিয়ে গুণ করে পাওয়া যায় :

$x^2 - x = 2x - 2$

উভয় পক্ষ থেকে x বিয়োগ করে পাওয়া যায় :

$x^2 - 2x = x - 2$

উভয় পক্ষকে $(x - 2)$ দিয়ে ভাগ করে পাওয়া যায় :

$x = 1$

কিন্তু ধরে নেওয়া হয়েছে যে $x = 2$

সুতরাং উপরোক্ত সমীকরণে $x = 2$ বসিয়ে পাওয়া যায় $2 = 1$ (প্রমাণিত)

(iii) $3 = 5$

$9 - 24 = 25 - 40$

উভয় পক্ষে 16 যোগ করে পাওয়া যায় :

$9 - 24 + 16 = 25 - 40 + 16$

$\therefore \quad (3 - 4)^2 = (5 - 4)^2$

$\therefore \quad 3 - 4 = 5 - 4$

$\therefore \quad 3 = 5$ (প্রমাণিত)

(iv) $5 = 4$

$-20 = -20$ বা $-45 + 25 = -36 + 16$

উভয় পক্ষের সঙ্গে $\frac{81}{4}$ যোগ করে পাওয়া যায় :

$(25 - 45 + \frac{81}{4}) = (16 - 36 + \frac{81}{4})$

বা $(5 - \frac{9}{2})^2 = (4 - \frac{9}{2})^2$

বা $5 - \frac{9}{2} = 4 - \frac{9}{2}$

বা $5 = 4$ (প্রমাণিত)

ডঃ জয়ন্ত বসু

পৃথিবী সমস্ত জীবের মায়ের মতন। তার অনুকূল পরিবেশে জীব জন্মগ্রহণ করে, লালিত পালিত হয়। কিন্তু এই পৃথিবী যখন ভয়ংকর হয়ে ওঠে—যেমন প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময়—তখন জীবের পক্ষে সমূহ বিপদ। কবি তাই পৃথিবীকে বন্দনা করে বলেছেন, 'বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে।'

স্বভাবতঃই পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অপরিসীম। দূর-দূরান্তে সে অভিযান চালিয়েছে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের উন্মাদনায়, ঢুকেছে গহন অরণ্যে, উঠেছে সুউচ্চ পাহাড়ে, জাহাজ ভাসিয়েছে অকূল সাগরে। নানান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাপজোক চালিয়েছে। এইভাবে সারা ভূপৃষ্ঠের মানচিত্র সে নিখুঁত ভাবে জেনে নিয়েছে। জানা গেছে ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭১ ভাগ জল, ২৯ ভাগ স্থল। একদিকে যেমন সর্বোচ্চ স্থান হিমালয়ের মাউণ্ট এভারেস্ট শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৮৪০ মিটার উচ্চে, অন্যদিকে তেমনি সমুদ্রগর্ভে গভীরতম স্থান হল প্রশান্ত মহাসাগরে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ—১০,৮৬৩ মিটার যার গভীরতা। সাম্প্রতিক কালে সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সমুদ্রের নিচে রয়েছে বড় বড় পাহাড়, আগ্নেয়গিরি, বিরাট বিরাট ফাটল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল অতলান্তিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ইত্যাদির নিচ দিয়ে ৭৫,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক পর্বতমালা, যা সমস্ত পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, ভূপ্রকৃতিতে এর গুরুত্ব খুব বেশি।

পৃথিবীর আকার যে মোটামুটি গোলকাকৃতি, প্রাচীন কালেই মানুষ তা আবিষ্কার করেছিল, পরে জানা গেল, পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা অর্থাৎ তার আকৃতি কমলালেবুর মত। নিরক্ষরেখা অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬,৩৭৮ কিলোমিটার, মেরুর দিকে ব্যাসার্ধ এর চেয়ে ২১-২২ কিলোমিটার কম। মহাকাশ বিজ্ঞানের দৌলতে আমরা জানতে পেরেছি, পৃথিবীর আকৃতি ঠিক কমলালেবুর মত নয়, বরং খানিকটা ন্যাসপাতির মত—দক্ষিণ দিকের তুলনায় উত্তর দিক একটু বেশি চাপা।

পৃথিবীর গড় ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ৫$\frac{১}{২}$ গ্রাম। পৃথিবীর যা আয়তন, ততখানি যদি জল নেওয়া যেত, তার যা ভর হত, তার ৫$\frac{১}{২}$ গুণ হল পৃথিবীর ভর।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে যা জানা গেছে, তা হল এইরকম :

স্থলভাগের মাটি, বালি ইত্যাদির নিচে কিছুটা গভীরতা পর্যন্ত রয়েছে গ্র্যানাইট জাতীয় শিলা। এই শিলায় সিলিকা (সিলিকন ডাইঅক্সাইড) ও অ্যালুমিনিয়ামের প্রাধান্যের জন্যে এ দু'টি পদার্থের আদ্যক্ষরগুলি অনুযায়ী শিলাস্তরটিকে বলা হয় 'সিয়্যাল'। এই স্তরের নিচে রয়েছে ব্যাসাল্ট জাতীয় শিলা, যাতে সিলিকা ও ম্যাগনেশিয়ামের প্রাধান্য। ঐ শিলা দিয়ে গঠিত স্তরকে বলা হয় 'সিম্যা'। গভীর সমুদ্রের জলের নিচে সিয়্যাল নেই, আছে সিম্যা। স্থলভাগ বা জলভাগ যাই হোক, ভূপৃষ্ঠ হতে ২০ থেকে ৪০ কিলোমিটার নিচে রয়েছে অন্য একটি অংশ, নাম 'ম্যান্টল'—অলিভাইন নামক এরকম সবুজাভ হলদে শিলা দিয়ে গঠিত। এই শিলা হল লৌহ ম্যাগনেশিয়াম সিলিকেট। কয়েকটি স্তর সমন্বিত ম্যান্ট্‌ল্ অংশটি পৃথিবীর ভেতর দিকে অনেকখানি বিস্তৃত—পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বরাবর ২,৯০০ কিলোমিটার এর বিস্তৃতি। এই ম্যান্টালের নিচে রয়েছে Core অর্থাৎ অষ্টি বা কেন্দ্রপিণ্ড—লোহা ও নিকেল দিয়ে গঠিত। এর একেবারে ভিতরের অংশটি কঠিন, উপরের কিছুটা অংশ তরল। আমরা জানি, পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কেন্দ্রপিণ্ডের তরল অংশে পদার্থের প্রবাহই প্রধানতঃ ভূচুম্বকত্বের জন্যে দায়ী।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অভিমত হল, প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে গ্যাসীয় পদার্থের বহু কণা একত্র হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করে। এই বস্তুপিণ্ডের উষ্ণতা বেশি ছিল না। এর মধ্যে যে সব তেজস্ক্রিয় কণা ছিল, সেগুলির পরমাণু কেন্দ্রক থেকে

স্বতঃই যে শক্তি বেরিয়ে আসে, তাই তাপে রূপান্তরিত হয়ে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়িয়ে দেয়। গলিত অবস্থায় লোহা, নিকেল ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থ নিচে গিয়ে জমা হয়, অপেক্ষাকৃত হাল্কা পদার্থ থাকে উপরের দিকে। ভূত্বক ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু ভূগর্ভে গভীরত্ব যত বেশি হয়, চাপ ও উষ্ণতা তত বাড়ে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ২½ কিলোমিটার নিচে উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস। এই উষ্ণতায় জল বাষ্পীভূত হয় এবং ছিদ্রপথে উপরে উঠে উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি করে। ৪০-৫০ কিলোমিটার নিচে উষ্ণতা প্রায় ১,৫০০ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস। সেখান থেকে গলিত শিলা আগ্নেয়গিরির লাভা রূপে বেরিয়ে আসে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০০ কিলোমিটার নিচে উষ্ণতা প্রায় ২,০০০ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস, সেখানে চাপ সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ৩ লক্ষ গুণ।

সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠে মহাদেশগুলি স্থির নয়, সেগুলি সামান্য মাত্রায় গতিশীল। আসলে ভূ-ত্বক বিরাট বিরাট কয়েকটি চাকতি দিয়ে গঠিত এবং তার নিচে ম্যান্ট্‌ল্‌ অনেকটা অকঠিন পিচের মত। চাকতি-গুলি এই ম্যান্ট্‌লের উপর যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। ম্যান্ট্‌লের ভিতর যে আলোড়ন চলছে, যে পরিচলন স্রোত রয়েছে, তারই ফলে চাকতিগুলির এই গতি। এই সব চাকতির উপর বসানো মহাদেশগুলিও তাই গতিশীল। অবশ্য এই গতির পরিমাণ সাধারণ হিসেবে খুব সামান্য, বছরে হয়তো ১ ইঞ্চি। কিন্তু কোটি কোটি বছরের হিসেবে এই গতির মান উল্লেখযোগ্য হতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রায় ২০ কোটি বছর আগে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা যুক্ত ছিল ; আস্তে আস্তে পরস্পরের থেকে সরে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। মাঝখানে যে অতলান্তিক মহাসাগর, তার বিস্তার এখনো ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। ভারতবর্ষ আগে এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল না, ছিল অনেক দক্ষিণে মাঝখানে ছিল সমুদ্র। ভারতবর্ষ ভূত্বকের যে চাকতির উপর বসানো, তা ক্রমশ উত্তরে সরতে সরতে এশিয়ার দক্ষিণে এসে জুড়ে গেছে। এই সংঘর্ষের সময় সংযোগস্থলের ভূত্বক উঁচু হয়ে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি করেছে।

পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে তার বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধেও দু'চার কথা বলতে হয়। এই বায়ুমণ্ডল ধরিত্রীমাতার স্নেহাঞ্চলের মতন। এটি আছে বলেই বাইরের জগতের মারাত্মক রশ্মি ভূপৃষ্ঠে এসে পেঁছতে পারে না, সম্ভব হয় জীব-জগতের সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি।

বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা মোটামুটিভাবে ১,০০০ কিলোমিটার ধরা যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা যত বাড়ে, বায়ুর ঘনত্ব তত কমে। মোট বায়ুর শতকরা ৫০ ভাগ রয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৫½ কিলোমিটারের মধ্যে এবং ৯৯ ভাগই রয়েছে ৩২ কিলো-মিটার উচ্চতার মধ্যে।

মহাকাশ বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে জানা গেছে, বায়ুমণ্ডল থেকে আরো উপরে পৃথিবীকে ঘিরে দু'টি বিকিরণ বলয় আছে, যাদের মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী বিদ্যুৎ-কণা। বিজ্ঞানী ভ্যান এলেনের নাম অনুসারে এদের বলা হয় ভ্যান এলেন বিকিরণ বলয়। এদের মধ্যে একটি রয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬,৫০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে, অন্যটি প্রায় ১৯,০০০ কিলোমিটার উচ্চতায়। নিচের বলয়টির উৎপত্তির মূলে প্রধানতঃ মহাজাগতিক রশ্মি, উপরেরটির উৎপত্তির মূলে সূর্য থেকে নিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ-কণা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে আমরা জেনেছি, পৃথিবী লাট্টুর মত নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে ৩৬৫¼ দিন সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। সূর্যের ৯টি গ্রহের মধ্যে পৃথিবী একটি। চন্দ্র হল পৃথিবীর উপগ্রহ-পৃথিবী থেকে প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোমিটার দূরে থেকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য ও তার গ্রহাদি নিয়ে যে সৌরজগৎ গঠিত, একটি গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগতের তা এক সামান্য অংশ মাত্র। সূর্য যেমন একটি নক্ষত্র, এই-রকম কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে এ নক্ষত্রজগতে। আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি নক্ষত্রজগৎ আছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর গুরুত্ব খুবই কম।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে যাই হোক, আমাদের কাছে মাতৃস্বরূপা পৃথিবী অতি মহিয়সী। বিজ্ঞানের দৌলতে এই পৃথিবী সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য জানা গেছে, যেগুলির খানিক পরিচয় বর্তমান প্রবন্ধে দেওয়া হল। তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে, এখনো অনেক জিনিসই অজানা—বিশেষতঃ পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে। অবশ্য এটা বোঝা গেছে যে, পৃথিবীর বুকের ভিতরটা মোটেই শান্ত, নিস্পন্দ নয়, সেখানে নিরন্তর আলোড়ন চলেছে। ৫০০ কোটি বছর বয়স হলেও অত্যন্ত সক্রিয়, সতেজ, প্রাণবন্ত আমাদের এই পৃথিবী।

অজানার পথে রোগ

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য

এটা তো ঠিক যে, দেহ ধর্মের স্বাভাবিক গতিকে জোর ক'রে রোধ করতে নেই, করলে তার পরিণামে অনেক রোগও বাসা বাঁধে। তবে অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো সেগুলো তাড়াতাড়ি না হয়ে কিছুদিন বাদেও হতে পারে। যেসব অজানা পথে রোগ আসতে পারে, তার সংখ্যা কমপক্ষে চৌদ্দটি। দেহের এসব স্বভাব-ধর্ম এসেই থাকে এবং আসবেও, সেগুলোকে থামাতে নেই, থামালে আমাদের দেহ হয় রোগগ্রস্ত।

* আমাদের শরীরটার ভারসাম্য তিনটে সুতোয় ঝুলছে—প্রথমটা হচ্ছে—সময়ে খাওয়া, যেসব দ্রব্য শরীরের পক্ষে ভাল এবং সহ্য হবে, তা খাওয়া ; আর পরিমাণ মত খাওয়া ; এই হলো সাধারণ নিয়ম, দ্বিতীয়টা হলো—ভালো ঘুম আর তৃতীয়টা হলো —আমাদের শরীরে যেসব বেগ (পরে ব'লছি), সেগুলিকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দেওয়া।

* পূর্বেই বলেছি—১৪টি পথ ধরে রোগ আসে, তার মধ্যে কয়েকটি এখানে জানাচ্ছি। যেমন—

[১] মলবেগরোধ

* অবশ্য এটা অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেই চেপে রাখতে হয়, এই যেমন—বর্তমানের ইলেকট্রিক ট্রেনে বা দূরপাল্লার বাসে ২।২½ ঘণ্টা যেতে হবে, এ সময় পায়খানা পেলে তা চেপে রেখে পেটে অস্বস্তি ভোগ হয়, আর বিশেষ তাগিদ হ'লে যাত্রাভঙ্গ করতে হয়। গ্রাম বাংলার একটা লোক-প্রচলিত কথা—"হাগারে নেই বাঘারে ভয়", অর্থাৎ পায়খানার বেগ পেলে বাঘের ভয়ও চলে যায়। এ সম্বন্ধে গোপাল ভাঁড়ের রসালো একটা গল্প আছে।

* একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপালের কাছে বলেছিলেন—'আমার একটা ছেলে হয়েছে।' গোপাল বললে—তাই নাকি মহারাজ? আমার কি রকম আনন্দ হচ্ছে জানেন—দাস্ত খোলসা (পায়খানা পরিস্কার) হলে যেমনটি হয়, তেমনটি।

মহারাজা তো চটে আগুন, গোপালের মাসোহারা বন্ধ। তারপর গোপাল তার কথাটাই যে যথার্থ, সেটা প্রমাণ করিয়ে দিয়েছিল। একদিন মহারাজা নৌকায় বেড়াচ্ছেন, সঙ্গী গোপাল। মহারাজার হঠাৎ বেগ (পায়খানার) উপস্থিত। গোপালের শুধু অজুহাত—মহারাজ, এখানে সাপ, ওখানে বাঘ—এভাবে নৌকোকে তীরে লাগাতে দিচ্ছে না। তখন এদিকে মহারাজার বেসামাল হওয়ার আশঙ্কা। তারপর এই কার্য সমাধা হওয়ার পর তিনি গোপালকে বলেছিলেন—আঃ বাঁচলাম, গোপাল তুমি ঠিকই বলেছিলে। তাই বলছি—এভাবে পায়খানার বেগ বন্ধ ক'রে রাখলে শরীরে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেটার জন্যই নানাপ্রকার উৎকট ব্যাধিরও সৃষ্টি হয়।

* অনেক সময় আমরা কাজের তাগিদে এবং নানা অসুবিধেয় পড়ে মলবেগ রোধ করতে বাধ্য হই, তার দ্বারা আমরা কতকগুলি রোগের শিকার হয়ে থাকি, অবশ্য সেটা বয়স হয়ে গেলে আসে। যেমন—কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শ রোগ, প্রস্রাব করতে কষ্ট এবং এই ধরনের আরও অনেক রোগ। এ ভিন্ন আরও কয়েকটি অসুবিধে দেখা দেয়—যেমন পায়ের গোছ বা পেশীগুলো সেঁটে ধরছে নতুবা শক্ত হচ্ছে, আবার এও হয়—অল্প অল্প সর্দির অবস্থা এসে পড়ছে, পেটে বায়ু হচ্ছে, তাছাড়া মলদ্বারটা শুকিয়ে যাওয়া ; মলদ্বারে ব্যথা অথবা চুলকানি, মাথাধরা, দু'চারটে ঢেকুর, বুকে একটা চাপবোধ, পরিণতিতে হৃদরোগ, এরপরেই হয়তো বা ক্ষিধেই থাকবে না—কোনদিন হবে আবার অসময়েও হতে পারে। এসব অবস্থা যদি এসেই পড়ে, তাহলে উচিত—ভালভাবে তেল মেখে স্নান করা, সময়মতো পরিমিত খাওয়া আর ঐ বদভ্যাসটি ত্যাগ করা।

[২] মুত্রবেগরোধ

* এবারে যেটা নিয়ে লিখতে বসেছি, সেটার কাজ অনেকটা স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টের মত, নিজেরই সেটা চালাতে হয়। ঠিকমত বোতাম টিপ্‌লে সেটা নামবে বা উঠবে আর অদৃশ্য শক্তি এটিকে ওঠা-নামা করাতে সাহায্য করে, সেটি হচ্ছে তড়িৎ। আমাদের দেহে সেই কাজ করে বায়ু, তার একটা বিশিষ্ট নাম আছে, সেটির নাম অপান বায়ু, এটি অবস্থান করে নাভির নিচে এবং যেকোন নিঃসরণের (মল-মূত্রাদি) কাজ তারই এক্তিয়ারে।

গ্রাম বাংলায় একে নিয়ে নানা প্রকারের লোককথা, প্রবাদ, চুট্‌কি টিপ্পনী ছড়িয়ে আছে। তার ভেতর থেকে ২।১টা বলি —যেমন ব্যাং এর মুতে আছাড় খাওয়া, ছিড়িক্‌ ছিড়িক্‌ ক'রে প্রস্রাব করা—এই ধরনের উপমার প্রচলন। এই রকম একটা গল্প —গুরুদেব শিষ্যের বাড়ি যাচ্ছেন, সঙ্গে তাঁর বয়স্ক তল্পীবাহক। পথে যেতে যেতে তল্পীবাহকের প্রস্রাব পেয়েছে, সে প্রস্রাব করতে বসতে যাবে, অমনি গুরুদেব চেঁচিয়ে উঠলেন—আরে তুই করছিস্‌ কি, পতিতপাবনী গঙ্গা যে সামনে ? আবার অন্যদিকে মুখ ক'রে বসতে যাবে, অমনি রব তুললেন—আরে দেখতে পাচ্ছিস্‌নে সামনে সূর্যাস্ত হচ্ছে ? অসহায় দৃষ্টি নিয়ে যেই না উত্তর মুখে বসবে, গুরুদেব হাঁ, হাঁ ক'রে উঠে বললেন—আরে সামনে শিব মন্দির যে—এদিকে তখন প্রায় কাপড়ে-চোপড়ে প'ড়ে যায়, তাড়াতাড়ি কাপড় সরিয়ে দক্ষিণ দিকে এই বসে আর কি, গুরুদেব চেঁচিয়ে বললেন—আ-হা-হা করিস্‌ কি ? সামনে যে ভবতারিণীর মন্দির দেখা যাচ্ছে, মায়ের মুখের কাছে বস্‌লি ? তখন রেগে-মেগে তল্পীবাহক ব'লে বসলো—রাখো তুমি ঠাকুর ! আমরা সব মুখেই মুতি (প্রস্রাব করি)।

তবে হ্যাঁ, কোথায় কোথায় প্রস্রাব করা নিষেধ, তা অবশ্য আমাদের প্রাচীন বিধানে বলা আছে, যেমন— গাছের তলায় উদিত বা অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে মুখ ক'রে, জন্তু-জানোয়ারের গায়ে, দেবালয়ের চৌহদ্দির ভেতরে, উই ঢিপিতে, কুল তলায়, লাঙল চষা জমিতে, কারোর ফসল ভরা জমির পাশে বা ভেতরে, সাপের খোলসের উপরে অথবা কোন গর্তে প্রস্রাব করা নিষেধ, এমনি কত নিষেধ যে সমাজে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তার ঠিক নেই।

* এতো গেল সংস্কার, তারপর ? নিজের গাফিলতিতে ? যেমন—রাত্রে প্রস্রাব করতে উঠতে হবে ভেবে জল না খাওয়া, এই কাজটা সেরে নিয়ে তারপর প্রস্রাব করবো। এছাড়া লোক লজ্জায় সঙ্কোচ, স্থানাস্থান বিচার প্রভৃতি নানা কারণে ঠিক সময় মতো আমরা প্রস্রাব না ক'রে পরে করি, এ সবইতো রোগের কারণ হয়, দেহতো কোনটাকেই ক্ষমা করে না।

* বেশি রুক্ষ অথবা গুরুপাক দ্রব্য খাওয়া (যেটাতে শরীর গরম হয়), বেশি উপোস বা ব্রতপালন করা, অত্যধিক সাইকেল বা ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি কারণেও প্রস্রাবের বেগ ব্যাহত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও সেই একই কথা—দেহ কোন কারণকেই

ক্ষমা করবে না। প্রস্রাবের বেগধারণ যে কারণেই হোক্ না কেন, এর ফলে যে সব রোগ ধীরে ধীরে এসে আমাদের শরীরে বাসা বাঁধে, সেগুলি হচ্ছে—মূত্র-পাথুরী রোগ, প্রস্রাব সরলে হয় না, কষ্টের সঙ্গে অল্প অল্প হওয়া, অর্শরোগ প্রভৃতি। প্রস্রাব পরিষ্কার থাকলে এবং স্বচ্ছন্দে হলে দেহ অনেক রোগের হাত থেকে মুক্তি পায়, তাছাড়া দেহের লাবণ্যও বজায় থাকে—যদি মূত্রের বেগ রোধ করা হয়, তাহলে এসব অসুবিধেও এসে যায়।

* আমাদের শরীরে যে আরও কতকগুলি বেগ আছে, সেগুলির রোধ করলে অর্থাৎ সেগুলিকে যদি আমরা সহজে শরীর থেকে বেরোতে সাহায্য না করি, আটকে রাখার চেষ্টা করি, তাহলে ফলটা যে বিষময় হবে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তাই এগুলিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই ভাল। এখানে মাত্র মল ও মূত্র সম্বন্ধে বলা হলো, আর বাকীগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হচ্ছে—তৃষ্ণা, ক্ষুধা, অধোবায়ু, কাসি, অশ্রু, হাঁচি প্রভৃতি। শরীরের স্বাভাবিকতা নষ্ট হওয়ার অর্থই হচ্ছে শরীরকে ব্যাধিগ্রস্থ ক'রে তোলা।

তবে এটাও সত্যি—যেমন এসবগুলির বেগধারণ করতে নেই, তেমনি কয়েকটি আছে, যেগুলোর সংযম রক্ষা করতে হয়, যেমন—বাক্যের হঠাৎ কোন কথা পূর্বাপর বিবেচনা না ক'রে অথবা না ভেবে বলতে নেই। শুধু তাই নয়, মনের আবেগে সব সময়ে সব কাজ করা কি ভালো? তাতে তো বহু বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, অসুবিধেও হতে পারে—কি সামাজিক আর কি দৈহিক।

বিজ্ঞান সুভাষিত

* জ্ঞান উন্মেষের পর শিশু যখন তার চার পাশের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখে, তখন তার মন পরম বিস্ময়ে ভরে ওঠে। চারপাশে যা কিছু দেখে, সবই তার কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়? তার কৌতূহলী মনে কত প্রশ্নই না জাগে। এজন্যে শিশুদের শিক্ষার ভার যাঁদের হাতে আছে, তাঁদের উচিত সাধারণত হাতের কাছে যে সব জিনিস পাওয়া যায়, ছোট ছেলে মেয়েদের মনকে আকর্ষণ করে- যেমন ফুল, লতাপাতা, পাখি, এমন সব টুকরো জিনিসের ওপর নজর দিতে শেখানো।

—সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সেই মজার দিনগুলো

আইজ্যাক অ্যাসিমভ্ | **ভাষান্তর/চিরন্তন সান্যাল**

এমন কি রাত্রিবেলা নিজের ডায়েরিতেও সে কথা লিখে ফেললো মার্জি। যে পাতাটার ওপরে লেখা আছে ১৭ই মে, ২১৫৭, সে পাতায় ও লিখলো, 'আজকে টমি একটা সত্যিকারের বই খুঁজে পেয়েছে!'

বইটা খুবই পুরোনো। মার্জির ঠাকুর্দা একবার বলেছিলেন যে তিনি যখন খুব ছোট্টটি ছিলেন তখন তাঁর ঠাকুর্দা তাঁকে বলেছিলেন যে একটা সময় ছিলো যখন সমস্ত গল্প কাগজের ওপর ছাপা হতো।

ওরা পাতা ওলটাতে লাগলো। পাতাগুলো হলদে, কোঁচকানো। আর সব থেকে মজার হলো অক্ষরগুলো সব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সাধারণতঃ পর্দার ওপর যেমন চলে বেড়ায় তেমন চলে বেড়াচ্ছে না। তারপর, ওরা যখন পাতা উলটে আবার আগের পাতায় ফিরে গেলো, তখন দেখলো, প্রথমবার পড়ার সময় যে কথাগুলো লেখা ছিলো সেই একই কথা লেখা রয়েছে।

'ইস্!' বললো টমি, 'কি বাজে খরচ। বইটা পুরো পড়া হয়ে গেলে স্রেফ ধরে ফেলে দিতে হবে। আমাদের টেলিভিসনের পর্দায় তো লক্ষ লক্ষ বই রয়েছে, ইচ্ছে করলে আরও ধরানো যায়। আমি ওটাকে কোনদিন ফেলতে যাচ্ছি না।'

'আমারটাও,' বললো মার্জি। ওর বয়েস এগারো, ফলে টমির মতো অতো পড়ার বই ও এখনও দেখে উঠতে পারেনি। টমির বয়েস তেরো।

মার্জি বললো, 'বইটা কোথায় পেলি রে?'

'বাড়িতে।' না তাকিয়েই বইটা পড়তে ব্যস্ত টমি উত্তর দিল, 'চিলেকোঠায়।'

'কিসের বই রে?'

'ইস্কুলের বিষয়ে।'

মার্জি অবজ্ঞার সুরে বললো, 'ইস্কুল? ইস্কুল নিয়ে বই লেখার কি আছে?'

স্কুল মার্জির কোনদিনই পছন্দ নয়, কিন্তু এখন ওর সেটা সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে। কারণ ওর যন্ত্র-শিক্ষক ইদানীং ভূগোলে পরীক্ষার পর পরীক্ষা নিয়ে চলেছে আর ওর রেজাল্ট খারাপের থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। অবশেষে ওর মা বিষণ্ণ ভাবে মাথা নেড়ে জেলা পরীক্ষককে খবর দিয়েছেন।

ভদ্রলোক এক গোলগাল ছোটখাটো চেহারার লালমুখো মানুষ এবং সঙ্গে তাঁর একবাক্স ভর্তি যন্ত্রপাতি, নানারকম মিটারও তার রয়েছে। মার্জির দিকে তাকিয়ে হেসে ওকে একটা আপেল দিয়েছেন তিনি, তারপর যন্ত্র-শিক্ষককে কলকব্জা খুলে তছনছ করে ফেলেছেন। মার্জি খালি একমনে চেয়েছে উনি যেন যন্ত্র-শিক্ষককে আর ঠিকঠাক জোড়া লাগাতে না পারেন, কিন্তু ভদ্রলোক ভালো করেই জানতেন কিভাবে ওটা আবার জোড়া লাগাতে হয়, ফলে ঘণ্টাখানেক পরে আবার নিজের চেহারা ফিরে পেলো যন্ত্র-শিক্ষক : বিশাল, কালো ও কুৎসিত; তার সঙ্গে একটা বিরাট পর্দা, যার ওপরে সমস্ত পড়া ফুটে ওঠে এবং প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু এগুলো ততো খারাপ নয়। মার্জির সবচেয়ে যেটা বিচ্ছিরি লাগে সেটা হলো বাড়ির কাজ ও পরীক্ষার খাতা ঢুকিয়ে দেবার ফুটোটা।

কাজ শেষ করে পরীক্ষক ভদ্রলোক হেসেছেন, মার্জির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। তারপর ওর মাকে বলছেন, 'এটা বাচ্চা মেয়েটার দোষ নয়, মিসেস জোন্স। মনে হয়, যন্ত্রটার ভূগোলের অংশটা একটু বেশি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে এরকম হয়। আমি ওটা কমিয়ে মোটামুটি দশ বছরের ছেলেমেয়ের মানানসই করে দিয়েছি। সত্যি বলতে কি, আপনার মেয়ের পড়াশোনা বেশ ভালোই এগোচ্ছে।' ভদ্রলোক আবার মার্জির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

মার্জি হতাশ হলো। ও ভেবেছিলো, ওঁরা হয়তো যন্ত্র-শিক্ষকটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কারণ একবার ইতিহাসের অংশটা একেবারে মুছে গিয়েছিলো বলে ওঁরা টমির যন্ত্র-শিক্ষকটাকে প্রায় এক মাসের জন্যে নিয়ে গিয়েছিলো।

সুতরাং ও টমিকে বললো, 'ইস্কুল নিয়ে হঠাৎ কেউ লিখতে যাবে কেন ?'

বড়মানুষীর ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকালো টমি, 'কারণ এই ইস্কুল আমাদের ইস্কুলের মতোন নয় রে, বোকা। এটা আগেকার দিনের ইস্কুল, হাজার হাজার বছর আগে যেমন ছিলো।' দাম্ভিক সুরে আরো যোগ করলো সে, 'বহু শতাব্দী আগেকার।'

মার্জি মনে মনে আহত হলো, 'অতোদিন আগে কিরকম ইস্কুল ছিলো কে জানে।' টমির কাঁধের ওপর দিয়ে বইটা কিছুক্ষণ পড়লো ও, তারপর বললো, 'যাইহোক, ওদের একজন মাস্টারমশাই থাকতো।'

'নিশ্চয়ই থাকতো, তবে সাধারণতঃ যেরকম হয় সেরকম মাস্টারমশাই নয়। ওদের পড়াতো মানুষ।'

'মানুষ ? মানুষ কি করে আবার মাস্টার হয় ?'

'মানে, সে ছেলেমেয়েদের সব শেখাতো, বাড়ির কাজ দিতো, আর পড়া ধরতো।'

'একটা মানুষের কি অতো বুদ্ধি আছে নাকি ?'

'কেন থাকবে না ! আমার বাবা আমার মাস্টারমশাইয়ের মতো সব জানে।'

'অসম্ভব। একটা মানুষ কখনও মাস্টারমশাইয়ের সমান জানতে পারে না।'

'প্রায় সমান জানে, বাজি রাখ্।'

বাজি ধরার জন্য মার্জি প্রস্তুত ছিলো না। ও বললো, 'না বাবা, চিনি না-শুনি না এমন লোক বাড়িতে আমাকে পড়াতে আসবে, ভাবতেই পারি না !'

টমি হাসিতে ফেটে পড়ে বললো, 'তুই কিছুই জানিস না, মার্জি। সেকালে ওদের একটা আলাদা বাড়ি থাকতো আর সব বাচ্চারা সেখানে পড়তে যেতো।'

'তাহলে সব বাচ্চারা একই জিনিস শিখতো ?'

'হ্যাঁ, সমান বয়সের যারা, তারা।'

'কিন্তু মা যে বলে প্রত্যেক ছেলে আর মেয়ের মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যে তাদের মাস্টারমশাইকে কম-বেশি ঠিকঠাক করে তারপর চালাতে হয় ? আর প্রত্যেক বাচ্চাকে নাকি আলাদা আলাদাভাবে পড়াতে হয় ?'

'ওরা তখনকার দিনে তা করতো না। তোর যদি ভালো না লাগে এ বই পড়তে হবে না।'

'ভালো লাগে না আমি বলেছি নাকি,' মার্জি তাড়াতাড়ি বললো। ঐ সব মজার ইস্কুলগুলোর গল্প ওর ভীষণ পড়তে ইচ্ছে করছে।

তখনও বইটা অর্ধেক পড়া হয়নি এমন সময় মার্জির মা ডাকলো, 'মার্জি! ইস্কুল!'

মার্জি চোখ তুলে তাকালো, 'এখন না, মা-মণি।'

'না, এখনই!' মা বললেন, 'তাছাড়া টমিরও এখন বোধহয় ইস্কুলের সময় হয়েছে।'

মার্জি টমিকে বললো, 'ইস্কুল হয়ে গেলে আরও কিছুক্ষণ তোর সঙ্গে বসে বইটা পড়তে পারবো তো?'

'দেখি,' সে উদাসীন ভাবে বললো। তারপর ধুলো পড়া পুরোনো বইটা বগলদাবা করে শিস্ দিতে দিতে চলে গেলো।

মার্জি স্কুল-ঘরে ঢুকলো। ঘরটা ওর শোবার ঘরের পাশেই, এবং যন্ত্র-শিক্ষক তখন চালু অবস্থায় ওর জন্য অপেক্ষা করছে। শনিবার আর রবিবার ছাড়া প্রত্যেকটা দিন একই সময়ে ওটা চালু হয়ে যায়। কারণ মা বলে, প্রত্যেক দিন একই সময়ে পড়তে বসলে ছোট ছোট মেয়েদের লেখাপড়া ভালো হয়।

পর্দা তখন জ্বলে উঠেছে, এবং তাতে লেখা রয়েছে: 'আজ অঙ্কের যে অনুশীলনী করানো হবে সেটা হলো প্রকৃত ভগ্নাংশের যোগফল নির্ণয়। তার আগে গতকালের বাড়ির কাজ নির্দিষ্ট গর্তে ঢুকিয়ে দাও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মার্জি নির্দেশ পালন করলো। ও ভাবতে লাগলো, ওর ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা যখন ছোট্ট ছিলো, তখনকার দিনের ইস্কুলগুলোর কথা। পাড়ার সব বাচ্চারা একসঙ্গে আসতো, ইস্কুলের উঠোনে হাসাহাসি হৈ-হুল্লোড় করতো, ক্লাসে এক সঙ্গে বসতো, দিনের শেষে বাড়িও যেতো একসাথে। ওরা একই জিনিস শিখতো, ফলে বাড়ির কাজে একে অন্যকে সাহায্য করতে পারতো আর আলোচনা করতে পারতো। আর মাস্টারমশাইরা ছিলো মানুষ...

তখন যন্ত্র-শিক্ষকের পর্দায় জ্বলে উঠেছে: 'যখন আমরা $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৪}$, এই দুটো ভগ্নাংশ যোগ করি—'মার্জি ভাবছিলো, আগেকার দিনের ইস্কুলে বাচ্চাদের কি ভালোই না লাগতো। কি মজাটাই না ওরা তখন করেছে!

মূল গল্প: দি ফান দে হ্যাড।

বড়দিনের উপহার

রে ব্র্যাডবেরি ভাষান্তর/সম্রাট নারায়ণ চৌধুরী

আগামীকালই বড়দিন, অথচ ওরা তিনজন রকেট-বন্দরের দিকে রওনা হওয়ার সময় মা ও বাবাকে রীতিমতো চিন্তিত মনে হলো। ওদের খোকা আজ প্রথম মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে, এই প্রথম উঠছে কোন রকেটে, সুতরাং ওরা চায় সবকিছু যেন ঠিকঠাক নিখুঁত হয়। কিন্তু শুল্ক দপ্তরের টেবিলে খোকার উপহারের বাক্সটা ওরা রেখে আসতে বাধ্য হয়েছে। কারণ চমৎকার সাদা মোমবাতি বসানো ছোট্ট গাছটার ওজন কয়েক আউন্সের জন্য নির্ধারিত সীমা পেরিয়ে গেছে। ফলে ওদের মনে হচ্ছে যেন উৎসবের আনন্দ ও খোকার প্রতি ওদের ভালোবাসা কেউ জোর করে কেড়ে নিয়েছে।

রকেট-বন্দরের শেষ ঘরটায় খোকা ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। আন্তঃগ্রহ শুল্ক অফিসারদের সঙ্গে মোকাবিলায় হেরে যাওয়ার পর ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো খোকার কাছে। যেতে যেতে মা ও বাবা পরস্পরকে ফিসফিস করে বললো:

'এখন কি করবো?'

'কিছু না, কিছু না। কি-ই বা করতে পারি?'

'যতো সব বাজে নিয়ম-কানুন!'

'ও এতো বার করে গাছটা চেয়েছিলো!'

সাইরেনের বিকট গর্জন শোনা গেলো এবং সকলে গাদাগাদি করে মঙ্গলগ্রহ

অভিমুখী রকেটে চড়ে বসলো। মা ও বাবা হেঁটে চললো সবার শেষে, ওদের ছোট্ট ফ্যাকাশে ছেলেটা দুজনের মাঝে, চুপচাপ।

'দেখি, যা হোক একটা কিছু ভেবে বের করবো'খন', বাবা বললো।

'কি…?' প্রশ্ন করলো খোকা।

এবং রকেট আকাশে উড়লো। ওরা সরাসরি নিক্ষিপ্ত হলো অন্ধকার মহাকাশে।

রকেট এগিয়ে চললো, পেছনে পড়ে রইলো তার আগুনের স্রোত ও পৃথিবী—যে পৃথিবীতে সেদিনের তারিখ ২৪শে ডিসেম্বর, ২০৫২। ওরা এখন এগিয়ে চলেছে এমন এক জায়গার দিকে যেখানে সময় বলে কিছু নেই, মাস নেই, বছর নেই, ঘণ্টা নেই। প্রথম 'দিন'-এর বাকি সময়টা ওরা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলো। পৃথিবীর নিউ-ইয়র্কের সময় অনুযায়ী মাঝরাত নাগাদ খোকা জেগে উঠে বললো, 'আমি জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখবো।'

রকেটে 'জানলা' একটাই—অস্বাভাবিক মোটা কাচের তৈরি। এবং সেটা আছে পরের 'ডেক'-এ।

'এখন নয়,' বাবা বললো, 'তোকে পরে নিয়ে যাবো।'

'আমি দেখবো আমরা এখন কোথায়, আর কোনদিকে যাচ্ছি।'

'তোকে যে পরে দেখতে বলেছি তার একটা কারণ আছে,' বাবা বললো।

সে সারাটা সময় জেগেই কাটিয়েছে, খালি এপাশ-ওপাশ করেছে, ভেবেছে ফেলে আসা উপহারটার কথা, উৎসবের সমস্যার কথা, হারানো গাছ ও সাদা মোমবাতিগুলোর কথা। এবং অবশেষে, উঠে বসে, মাত্র মিনিট পাঁচেক আগে, একটা সমাধান পাওয়া গেছে বলে তার মনে হয়েছে। সে যদি ঠিকমতো সেকাজ পালন করতে পারে তাহলেই এই বেড়ানো চমৎকার হয়ে উঠবে, ভরে উঠবে সত্যিকারের আনন্দে।

'খোকা,' সে বললো, 'আর ঠিক আধঘণ্টা পরেই বড়দিন।'

'ওঃ,' মা বলে উঠলো, ভয় পেলো খোকার বাবা ও কথা উচ্চারণ করেছে বলে। যে কোন কারণেই হোক, ও চাইছিলো খোকা যেন বড়দিনের কথা ভুলে যায়।

আগ্রহ উত্তেজনা ফুটে উঠলো খোকার মুখে, ওর ঠোঁট কাঁপতে শুরু করলো, 'জানি, জানি। আমাকে উপহার দেবে তো, বাবা? একটা গাছ দেবে তো? তুমি বলেছিলে কিন্তু—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবো, সব দেবো' বাবা বললো।

মা চমকে উঠলো, 'কিন্তু—'

'সত্যি দেবো,' বাবা বললো, 'বিশ্বাস কর্, সত্যি দেবো। দাঁড়া, আমি আসছি।'

সে প্রায় কুড়ি মিনিটের জন্যে গিয়েছিলো। ফিরে যখন এলো তখন সে হাসছে, বললো, 'সময় প্রায় হয়ে এসেছে।'

'তোমার ঘড়িটা আমার হাতে দেবে?' খোকা জানতে চাইলো, এবং ঘড়িটা ওকে দেওয়া হলো, ওর ছোট্ট হাতের মুঠোয় ঘড়িটা টিকটিক করে চললো; আগুনের স্রোত, নিঃস্তব্ধতা ও প্রচ্ছন্ন দুরন্ত গতির মধ্যে দিয়ে সময় বয়ে যায় অনায়াসে।

'এই এখন বড়দিন! বড়দিন! কই, আমার উপহার কই?'

'এই তো,' বাবা বললো, তারপর ছেলের কাঁধ ধরে নিয়ে চললো ঘরের বাইরে, বারান্দা ধরে কিছুটা এগিয়ে অবশেষে ওরা একটা মই বেয়ে উঠতে শুরু করলো, মা ওদের অনুসরণ করলো নীরবে।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' মা একসময় বললো।

'সময় হলেই পারবে। এই যে—' বাবা বললো।

একটা বিশাল কেবিনের বন্ধ দরজার সামনে ওরা দাঁড়িয়ে। বাবা এক বিশেষ সংকেতে প্রথমে তিনবার ও পরে দুবার টোকা মারলো। দরজা খুলে গেলো এবং ঘরের সমস্ত আলো নিবে গেলো চোখের পলকে, শোনা গেলো বিভিন্ন কণ্ঠস্বরে ফিসফিসে কথাবার্তার শব্দ।

'ভেতরে যা, খোকা,' বাবা বললো।

'কি অন্ধকার।'

'আমি তোর হাত ধরছি। তুমিও এসো গো।'

ওরা ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। ঘরটা সত্যিই ভীষণ অন্ধকার। আর ওদের ঠিক সামনেই এক প্রকাণ্ড কাচের চোখ, জানলা, ছ'ফুট চওড়া ও চার ফুট উঁচু, সেটা দিয়ে ওরা বাইরের মহাকাশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

খোকা উত্তেজনায় শ্বাস নিলো।

ওর ঠিক পেছনে বাবা ও মা, দুজনেই শ্বাস টানলো। আর তারপর অন্ধকার ঘরের ভেতর কয়েকজন লোক গান গাইতে শুরু করলো।

'শুভ বড়দিন, খোকা,' বাবা বললো।

আর ঘরের বিভিন্ন কণ্ঠস্বর গেয়ে চললো সেই পুরোনো, বহু পরিচিত, বড়দিনের সঙ্গীত, খোকা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো জানালার কাছে, জানালার ঠাণ্ডা কাঁচে ওর মুখ চেপে ধরলো। ও অনেক অনেকক্ষণ ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো, শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগলো বাইরের মহাকাশের রূপ, দেখতে লাগলো ঝিকিমিকি গভীর রাত আর সেখানে জ্বলন্ত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাদা চমৎকার মোমবাতির মেলা....

রিকেটস বা অস্থি-বিকৃতিরোগ

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

রিকেটস (Rickets) বা অস্থি-বিকৃতি রোগের কারণ নির্ণয়, এবং তার প্রতিকার, আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার আরও একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এ বিষয়ে গবেষণার প্রকৃত কাহিনী আজও হয়তো অনেকেরই অজানা। বাস্তবিক এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এতই সীমাবদ্ধ যে, অধিকাংশ পুস্তকেই এখনও একে ভিটামিন-ডি-এর অভাব-জনিত রোগ বলে বর্ণনা করা হয়। যদিও প্রকৃতপক্ষে এ হ'ল একটি বায়ু-দুষ্ট-জনিত ব্যাধি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে যখন

কয়লার ব্যবহার শুরু হয় তখনই সর্বপ্রথম এই রোগের কথা বলা হয়। শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য শিল্প সমৃদ্ধ শহরেও ক্রমশঃ এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, শিল্প-সমৃদ্ধ বড় বড় শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, ঘন বসতি—বড় বড় বাড়ি, তার পাশাপাশি নোংরা ও ঘিঞ্জি জীর্ণ কুটিরের সারি, যার নাম বস্তি। সরু সরু রাস্তা, অন্ধকার গলি, আর ধূলিধূসরিত মলিন আকাশ, সব সময় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। ধোঁয়া আর কুয়াশা—সব মিলিয়ে সৃষ্টি করে গভীর ধোঁয়াশা (Smog)। এইরকম জায়গায়ই শিশুদের মধ্যে রিকেটস রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। অথচ গ্রামাঞ্চলে এই রোগ একরূপ নেই বললেই চলে।

১৮৯০ সালে থিওবল্ড পাম (Theobold Palm) নামক একজন ইংরেজ মিশনারী জাপানে গিয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, জাপানে এই রোগ কদাচিৎ দেখা যায়, যদিও ঐ সময় ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের বড় বড় শহরে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। বিভিন্ন দেশে কর্মরত অন্যান্য মিশনারীদের সঙ্গে পত্রালাপ ক'রে তিনি জানতে পারলেন যে, এই রোগ প্রধানতঃ উত্তর ইউরোপেই সীমাবদ্ধ, পৃথিবীর অপর কোন স্থানে এই রোগের কথা বিশেষ শোনাই যায় না।

অনুসন্ধানের ফলে তিনি অনুমান করলেন যে, সূর্যালোকের অভাবই রিকেটস রোগের প্রকৃত কারণ। তিনি বললেন,—শিশুরা যেখানে অধিকাংশ সময় সরু অন্ধকার গলির মধ্যে থাকে, কিংবা খেলা করে, যেখানে সূর্যালোকের একান্ত অভাব, সেখানেই রিকেটস রোগাক্রান্ত শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাই তিনি নিয়মিত সূর্য স্নান (Sun-bath)-এর ব্যবস্থা দিলেন।

১৯১৮ সালে হ্যারি হাচিন্‌সন (Harry Hutchinson) বোম্বাই শহরে যে গবেষণা করেন তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখলেন, সাধারণ দরিদ্র হিন্দু, যারা শোচনীয় নিকৃষ্টমানের আহার্য গ্রহণ করে, কিন্তু সারাদিন খোলা আকাশের নীচে কাজ করে আর সেই সময় বাচ্চাদের খোলা আকাশের নীচে রেখে দেয়, তাদের মধ্যে রিকেটস রোগ কদাচিৎ দেখা যায়। অথচ অবস্থাপন্ন মুসলিম এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু, যাদের মধ্যে তখন পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং যাদের বাচ্চারা শৈশবে মায়ের সঙ্গে অন্ধকার অথবা প্রায়ান্ধকার ঘরে বাস করতে অভ্যস্ত ছিল, তাদের মধ্যে এই রোগের

প্রকোপ ছিল অত্যন্ত বেশি। এজন্য তাঁর মনে হল, এই রোগের প্রধান কারণ, বিশুদ্ধ বাতাস, সূর্যালোক এবং উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাব। তিনি তাঁর রোগীদের নিয়মিতভাবে খোলা জায়গায়, প্রচুর আলোবাতাসের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কোন ওষুধ দিলেন না, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতেই সুফল পাওয়া গেল।

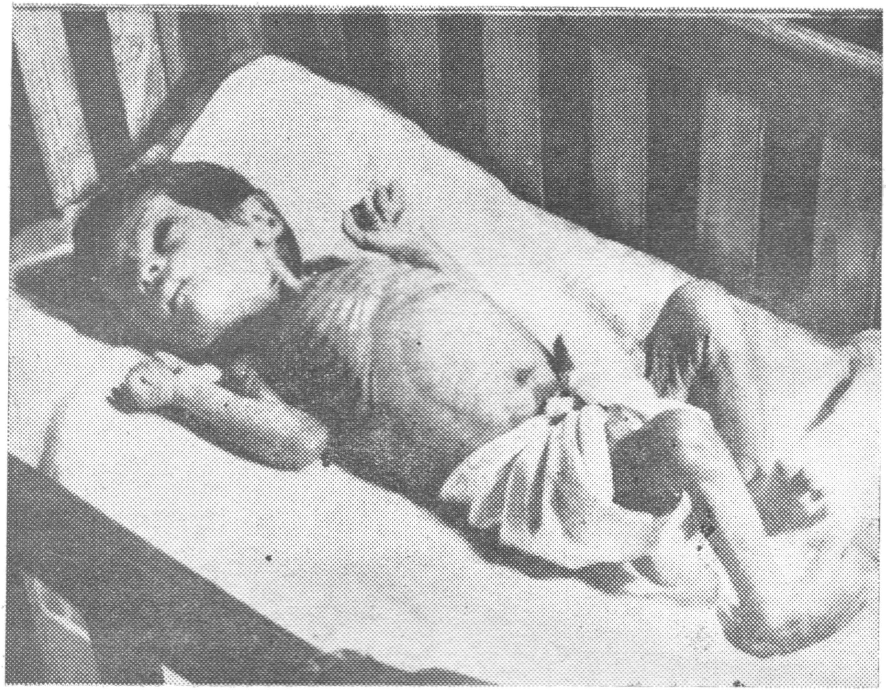

এইভাবে ১৯১৯ সালের মধ্যেই অনেক চিকিৎসকের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, সূর্যালোকের সাহায্যেই রিকেটস রোগ নিরাময় করা সম্ভব। কিন্তু ইউরোপের অধিকাংশ শহরেই, বিশেষতঃ শীতকালে, সূর্যালোকের সাহায্যে চিকিৎসা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, দারুণ ধোঁয়াশার জন্যে সেসব জায়গায় সূর্যের দেখা মেলাই ভার। এজন্য কেউ কেউ কৃত্রিম আলোর সাহায্যে চিকিৎসার কথা ভাবলেন। কিন্তু সেই সময়ে প্রচলিত কার্বন-ফিলামেণ্ট ল্যাম্প ব্যবহার ক'রে তেমন ফল পাওয়া গেল না (কারণ, এতে অতি-বেগনী রশ্মির পরিমাণ খুব কম।)। ১৯১৯ সালেই কুর্ট

হুল্‌ডসিন্‌স্কি (Kurt Huldschinsky) এই উদ্দেশ্যে পারদ বাষ্পপূর্ণ কোয়ার্টজ-ল্যাম্প ব্যবহার করলেন। এ থেকে নির্গত আলোক-রশ্মির সাহায্যে মারাত্মক রিকেটস রোগে আক্রান্ত চারটি শিশুর চিকিৎসা ক'রে অদ্ভুত ফল পাওয়া গেল। মাত্র দু'মাস সময়ের মধ্যেই তারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ ক'রল।

এরূপ ল্যাম্প থেকে প্রচুর পরিমাণে অতি-বেগনী রশ্মি (Ultra-violet-rays) নির্গত হয়। সুতরাং নিশ্চিত বোঝা গেল যে, কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট, অথবা সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত, অতি-বেগনী রশ্মির ক্রিয়ায়ই রিকেটস রোগ নিবারিত হয়।

এদিকে ১৮২৪ সালে বিজ্ঞানী সুটে (Schutte) সর্বপ্রথম বলেন যে, রিকেটস রোগের চিকিৎসায় কডলিভার তেল (Cod-liver oil) খুবই কার্যকরী হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায় একশ' বছর ধরে এদিকে কারও নজর পড়েনি। ১৯২২ সালে ম্যাক্‌কলাম এর গবেষণার ফলে নতুন ক'রে জানা গেল যে, কডলিভার তেলের রিকেটস রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে। তিনি এর নাম দিলেন ভিটামিন-ডি (Vitamin D)।

এরপর ১৯২৪ সালে স্টীনবক (Steenbock) এবং তাঁর সহকর্মীগণ প্রমাণ করেন যে, অতি-বেগনী রশ্মির প্রভাবে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য রিকেটস রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা অর্জন করে। ঐ বছরই হেশ্‌ (Hess) দেখলেন, অতি-বেগনী রশ্মির ক্রিয়ায় তিসির তেল এবং তুলা-বীজের তেল রিকেটস রোগ নিবারণের ব্যাপারে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর ১৯২৭ সালে রোসেনহাইম (Rosenheim) এবং ওয়েবস্টার (Webster) প্রমাণ করলেন যে, আরগোস্টেরল (Ergosterol) নামক পদার্থ, যা আর্গট (Ergot) নামক ছত্রাক (Fungus) থেকে পাওয়া যায়, অতি-বেগনী রশ্মির ক্রিয়ায় অপর একটি সক্রিয় পদার্থে পরিণত হয়। মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, ১৯৩১ সালে এর নাম দেন ক্যাল্‌সিফেরল (Calciferol)। রিকেট্‌স্‌ রোগ নিবারণে এটি ভিটামিনের মতো কাজ করে। তাই জার্মান বিজ্ঞানী ভিন্‌ডাউস (Vindous) নতুন ক'রে এর নাম দেন—ভিটামিন-ডি$_2$ (Vitamin D_2)।

১৯৩৩ সালে ব্রকম্যান (Brockman) টানি মাছের লিভারের (বা যকৃতের) তেল (Tunny liver oil) থেকে অপর একটি ভিটামিন পৃথক্‌ করতে সক্ষম হন। এর নাম ভিটামিন ডি$_3$ (Vitamin D_3)। এরপর নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার

সাহায্যে ভিন্‌ডাউস প্রমাণ করলেন যে, মানুষের চামড়ায় একপ্রকার রাসায়নিক যৌগ (7-Dehydro-cholesterol) থাকে অতি-বেগনী রশ্মির ক্রিয়ায় তা সহজেই ভিটামিন ডি৩ (Vitamin D_3)-তে রূপান্তরিত হয়।

আমাদের দেহে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট-এর বিপাকের জন্যে দরকার হয় ভিটামিন-ডি (Vitamin D)। এর অভাবে রিকেটস বা অস্থি-বিকৃতি রোগ হয়। শিশুদের হাত ও পায়ের অস্থি অপুষ্ট ও অপরিণত থাকে বলে হাত-পা বেঁকে যায়। এই ভিটামিন-এর সরবরাহ অব্যাহত থাকলে, রিকেটস রোগ নিবারিত হয়। তবে ভিটামিন ডি২-র তুলনায় ভিটামিন-ডি৩ আরও বেশি কার্যকরী হয়। এ জাতীয় ভিটামিন সাধারণতঃ পাওয়া যায় নানা রূপ স্নেহপদার্থ থেকে, যেমন—হ্যালিবাট ও কড্‌লিভার তেল, ডিমের কুসুম, দুধ ইত্যাদি।

তবে এখন নিশ্চিতরূপে জানা গেছে যে সূর্যের অতি-বেগনী রশ্মির অভাবই হল রিকেটস রোগের প্রকৃত কারণ। আমাদের দেহে সূর্যরশ্মি পড়লে, অতি-বেগনী রশ্মির ক্রিয়ায়, আমাদের ত্বকে (বা চামড়ায়), ক্যাল্‌সিয়াম বিপাকের জন্যে দায়ী, ভিটামিন-ডি উৎপন্ন হয়ে তা রক্তস্রোতে মিশে যায়। এজন্য শৈশবে সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত হলে, শিশুদের ক্যাল্‌সিয়াম-বিপাকে বিঘ্ন ঘটে, এবং তার ফলে রিকেটস বা অস্থি-বিকৃতি রোগ দেখা দেয়। উত্তর-ইউরোপের শিল্পসমৃদ্ধ ধোঁয়াশাপূর্ণ শহরগুলিতে সূর্য কিরণের একান্ত অভাব। তাই সে-সব জায়গায় এই রোগের প্রকোপও বেশি। সুতরাং পর্যাপ্ত সূর্যালোক, আর তার অভাবে, পারদ বাষ্পপূর্ণ ল্যাম্প থেকে উৎপন্ন অতি-বেগনী রশ্মি, কিংবা স্বল্প-পরিমাণে ভিটামিন-ডি গ্রহণই হল এই রোগ নিবারণের প্রকৃষ্ট পন্থা।

আমাদের দেশে শীতের সকালে শিশুদের যে তেল মাখিয়ে রোদে রেখে দেওয়া হয়, তা একটি চমৎকার ব্যবস্থা। কারণ, এতে রিকেটস রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে (যেমন—রাস্‌মুসেন), ক্যাল্‌সিকেরলকে ভিটামিন না বলে হরমোন (Hormone) বলাই সঙ্গত। কারণ, সূর্যের অতি-বেগনী রশ্মির ক্রিয়ায় এটি আমাদের ত্বকে (বা চামড়ায়) উৎপন্ন হয়ে তারপর রক্তস্রোতে মিশে যায়, এবং

দেহের অভ্যন্তরে এটি ক্যাল্‌সিয়াম-বিপাকে সহায়তা করে আর এজন্যই তা রিকেটস বা অস্থি-বিকৃতি রোগ নিবারণে একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। শহরের সুসভ্য মানুষ জীবিকার জন্যে এখন আর উলঙ্গ অথবা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় রোদে রোদে ঘুরে বেড়ায় না। এর ফলে অধিকাংশ সময়ই সে জীবনদায়ী সূর্যকিরণ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই আগে যে বস্তুটি স্বাভাবিক ভাবেই পর্যাপ্ত পরিমাণে তার দেহের মধ্যে উৎপন্ন হত (হরমোন), তাকেই এখন সে খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে, একটি ভিটামিন হিসেবে।

এখন অনেকেই বলেন, এটি ভিটামিন, না হরমোন—এ প্রশ্ন তুলে লাভ কি। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। একে ভিটামিন বললে স্বভাবতই মনে হয় যে, এটি কোষ-মধ্যে কোন সহ-উৎসেচক (Co-enzyme)-এর কেন্দ্রক (Nucleus)-রূপে কাজ করে, যেমন অন্যান্য অনেক ভিটামিনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তিনটি হরমোন—ক্যাল্‌সিফেরল (ত্বক থেকে উৎপন্ন) প্যারাথাইরয়েড হরমোন এবং ক্যাল্‌সিটোনিন (যা থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন, হয়), একযোগে কাজ করে এবং আমাদের রক্তস্রোতে ক্যাল্‌সিয়াম এবং ফস্‌ফেট আয়ন-এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। কোনটির কি ভূমিকা, এবং কোনটি ঠিক কিভাবে কাজ করে, তা এখনও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে এদের যে-কোন একটির অভাব ঘটলে, সমগ্র বিক্রিয়া ব্যাহত হয়। এজন্য ক্যালসিফেরলকে ভিটামিন না বলে হরমোন বলাই বিধেয়।

জীবের ক্রমবিকাশের কথা মনে রেখে, এ সম্পর্কে আরও কিছু যুক্তি উত্থাপন করা যায়। যেমন, মাছ জলের গভীরে বাস করে। সেখানে অতি-বেগনী রশ্মি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই মাছ অতি-বেগনী রশ্মির সাহায্য ছাড়াই নিজদেহে এটি সংশ্লেষণ করতে সক্ষম। অপরদিকে উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রত্যেকেই দেহের কোন না কোন অংশের সাহায্যে অতি-বেগনী রশ্মি গ্রহণ ক'রে নিজ নিজ দেহে এটি তৈরি ক'রে নেয়। আরও মজার কথা এই যে, পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের প্রাণীরা সম্ভবতঃ রিকেটস রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই, বসন্তকালে খোলা আকাশের নীচে তাদের সন্তান-সন্ততির জন্ম দিতে এবং তাদের লালন-পালন করতে অভ্যস্ত, যাতে প্রচুর সূর্য-কিরণ পেয়ে বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

মেরু-ভালুক, সীল প্রভৃতি প্রাণী অধিকাংশ সময় এমন জায়গায় বাস করে, যেখানে অতি-বেগনী রশ্মির একান্ত অভাব। কিন্তু প্রচুর মাছ খেয়ে তারা ক্যাল্‌সিফেরলের অভাব মিটিয়ে ফেলে।

আগেকার দিনে এস্কিমোরাও এইভাবে ক্যাল্‌সিফেরলের অভাব মিটিয়ে নিত। কিন্তু ইউরোপীয় মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে, ক্রমশঃ তারা যখন আধুনিক নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল, তখন তাদের মধ্যেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। এর কারণ বুঝতে এখন আর কোন অসুবিধা হয় না। গরম দেশের মানুষ সর্বদা প্রখর সূর্যকিরণের সংস্পর্শে আসে। অত্যাধিক ক্যাল্‌সিফেরল উৎপাদনের ফলে তাদের দেহের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেজন্য তাদের গায়ের রং হয়েছে কালো। চামড়ার বাইরের স্তরে অবস্থিত মেলানিনের দানাগুলি (Melanin granules) ভিতরের স্তরগুলিকে অত্যধিক অতি-বেগনী রশ্মির প্রভাব থেকে রক্ষা করে। অপরদিকে ইউরোপের মানুষ অধিকাংশ সময়ই জীবনদায়ী সূর্য-কিরণ থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই তাদের গায়ের রং হয়েছে সাদা, যাতে সূর্যালোক থেকে যতটা সম্ভব অতি-বেগনী রশ্মি তারা আহরণ করতে পারে। প্রকৃতিই তাদের আত্মরক্ষার এক চমৎকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। তাছাড়া ছুটিছাটায় পুত্রকন্যাসহ শহরের বাইরে সমুদ্র-তীরে গিয়ে মুক্ত পরিবেশে সমুদ্র স্নানের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য-স্নানের রীতিও যে তাদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। এর প্রধান কারণ, ইউরোপের শহরবাসীরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এইভাবে রিকেটস রোগের অভিশাপ থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকা যায়।

বিজ্ঞান সুভাষিত

* একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহু কোটি বৎসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল কত গোপনে। দেহে দেহে অপরূপ শিল্প সম্পদশালী, তার সৃষ্টিকার্য নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে। যোজনা করবার, শোধন করবার, অতি জটিল কর্মতন্ত্র উদ্ভাবন ও চালনা করবার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, কেমন করে তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না।

—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

সুনীল সরকার

॥ দৃষ্টিহীনের চশমা ॥

কবি বলেছেন : 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' কবির কল্পনাপ্রবণ দার্শনিক মনের মণিকোঠায় এই ভুবনের যে রূপ-সৌন্দর্য জাগরুক হয়েছিলো তা আক্ষরিক অর্থে সত্য। কিন্তু কবির মত করে সেই সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা আছে ক'জনার। তবু প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য তার রূপ, সৌন্দর্য অনেককেই মুগ্ধ করে বলেই প্রকৃতির বিচিত্র নিয়মে আমরা সবাই বাঁচার সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু এই প্রকৃতির বুকে জন্মেও যাঁরা প্রকৃতির অফুরন্ত আলো রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারলো না, তাঁরা কি কবির ওই উক্তির সঙ্গে একমত হতে পারবে ?

আমি জন্মান্ধদের কথা বলছি। কি মর্মান্তিক বেদনাদায়ক ব্যাপার একবার ভেবে দেখুন তো। ওঁরা এই পৃথিবীতে আসছে বছরে প্রায় হাজারে হাজারে অথচ সম্পূর্ণ আঁধারেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে হচ্ছে। ওঁদের অভিশপ্ত এই জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই, নেই কোন আনন্দ

স্ফূর্তি। তবু ওঁরা বাঁচার সংগ্রামে লিপ্ত। আমার মনে হয় প্রকৃতির রূপসৌন্দর্য উপভোগ না করলেও তার 'রস' আহরণ বা অনুভব করার শক্তি ওঁদের আছে এবং সেটা ওঁদের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে গিয়ে ধাক্কা মারে। সেই জন্যে এই রূঢ় বাস্তব জগতের মধ্যেও কিছু বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়ায়। এ কাজে ওঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার প্রকৃত পক্ষেই লোকের অভাব। বলাই বাহুল্য ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য ছাড়া সমাজের কাছ থেকে ওঁরা কোনো সহানুভূতি বা সহযোগিতা পায় না বললেই চলে। তবে সুখের কথা এই যে বিশ্বের কয়েকটি উন্নত দেশ—যেমন: আমেরিকা রাশিয়া জার্মান জাপান ফ্রান্স বৃটেন প্রভৃতি দেশের সরকার অন্ধদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং ওইসব দেশের বিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে নেই। তাঁরা অন্ধদের লেখাপড়া করার সাজ-সরঞ্জাম এবং সমাজে যাতে ওঁরা মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারে তার জন্য অভিনব সব যান্ত্রিক উদ্ভাবন করে চলেছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার কয়েকজন বিজ্ঞানী দৃষ্টিহীনদের জন্যে এক অভিনব চশমা উদ্ভাবন করেছেন। এই চশমা বলতে গেলে সাধারণ চশমার মতই দেখতে—শুধু দুধারের ডাঁটি দুটো টর্চ লাইটের আদলে তৈরি। তার মধ্যে আছে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি বস্তু—অদৃশ্য ইনফ্রারেড্ বা অবলোহিত আলো গ্রহণ করবার এবং প্রেরণ করবার ব্যবস্থা।

যিনি চশমা পরবেন—তাঁর সামনে কোন কিছু থাকলে তা থেকে বিচ্ছুরিত অবলোহিত রশ্মি গিয়ে পড়বে চশমার গ্রাহক যন্ত্রে আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা শব্দ তুলে সাবধান করে দেবে যে সামনে বাধা আছে।

পাকা দেওয়াল থেকে অবলোহিত আলো খুব ভালো প্রতিফলিত হয়; চশমা থাকলে প্রায় ১০ থেকে ১৩ ফুট দূর থেকে তা টের পাওয়া যায়। যেসব পদার্থ যথেষ্ট অবলোহিত আলো প্রতিফলন করতে পারে না যেমন কয়েক ধরনের কাপড় সে সব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে ৫ ফুট দূরত্বের মধ্যে।

কয়েক বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়ার মেনলি পার্কস্থিত সান্টাবিটা টেকনোলজির কয়েকজন প্রযুক্তিবিদ অন্ধজনের পথ চলবার অতি সহজ একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন। যন্ত্রটির নাম দিয়েছেন ব্লেস বা 'বিণপ লিউকাস এনভিরনমেনটাল সেন্সর'।

যন্ত্রটি দুই ব্যাটারির একটি টর্চের মত। যন্ত্রটির মুখের ব্যাস আলোর মাত্রানুযায়ী কমানো বাড়ানো যায়। আলোর মাত্রার তারতম্যে এই যন্ত্রে কম্পনের হ্রাস-বৃদ্ধি

ঘটে। কম্পন সেকেণ্ডে ৪ থেকে ৪০০ বার পর্যন্ত হতে পারে। আলোর মাত্রানুযায়ী যন্ত্রটিকে ঠিক করে নিয়ে অন্ধজনেরা এর সাহায্যে অনেক দূরের অতি পাতলা কাপড়ের অবস্থিতিও জানতে পারে। এটিকে হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে অন্ধ ব্যক্তিরা যখন পথ চলেন—তখন সামনে কোন মোড় বা বাধা থাকলে এতে কম্পনের মাত্রা বেড়ে ওঠে। হাতের তেলোতে সেই কম্পনের স্পর্শে তাঁরা যে রাস্তার মোড়ে বা কোন খাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা' বুঝতে পারেন। এমন কি এটি ব্যবহার করে অন্ধজনেরা উঁচু-নীচু পথ ছাড়াও সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামাও করতে পারেন।

এইরূপ যন্ত্র কিছু আমদানী করলে আমাদের দেশের অন্ধ ব্যক্তিরা পথ-দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক ভাবে প্রাণ হারাতেন না এবং কারো সাহায্যের জন্য আকুল প্রার্থনাও জানাতেন না।

॥ দন্ত ঘটিত ॥

শিক্ষার্থী দন্ত চিকিৎসকদের দাঁত নিয়েই কারবার অর্থাৎ, নানারকম দাঁত, দাঁতের মাড়িঘটিত ব্যাপার নিয়েই ওদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। বিভিন্ন রকম দাঁত নিয়ে যত বেশি নাড়াচাড়া করবে, দাঁত ফেলবে তুলবে লাগাবে চাঁচবে তত বেশি অভিজ্ঞতা বাড়বে। আর এসব অভিজ্ঞতা বাড়াতে গেলে চাই দাঁত, নকল নয়—আসল। যদিও দেঁতো রোগী এখন সবাই তবু ওই শিক্ষার্থীদের কাছে তো কেউ যাবে না তার দন্তঘটিত গোলযোগ নিয়ে। অথচ শিক্ষার্থীদের দাঁত দরকার, জ্যান্ত মানুষের দাঁত এবং তিনি সশরীরে হাজির থাকবেন। কারণ শুধু দাঁত দেখলেই তো হবে না, সাঁড়াশী দিয়ে একটি ভাঙ্গা অথবা পোকায় ধরা দাঁতকে চেপে ধরা হবে, তখন তার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা তো প্রত্যক্ষ করতে হবে। ড্রিলিং করার সময় মুখের ভিতরকার প্রতিক্রিয়াটা অবশ্যই জানতে হবে। এছাড়া দন্তঘটিত যন্ত্রণার একটা প্রতিচ্ছবি পেতে গেলেও আসল এবং সক্রিয় দাঁত চাই। কিন্তু মুশকিল হলো বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাতেও আমরা কেউ ওদের কাছে যাবো না। সে ভীতি আমাদের সকলেই রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু চুপচাপ নেই। তাঁরা এ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছেন এবং ইতিমধ্যে এই সমস্যার একটা সমাধানও করে ফেলেছেন। সত্যি অসাধ্য সাধন করতে বিজ্ঞানীদের হেন জুড়ি নেই। আমেরিকার কয়েকজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী এমন একটি অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন—যেটি ১৯৭২ সালে 'ইনডাসট্রিয়াল রিসার্চ'

পত্রিকা কর্তৃক বিশেষ পুরস্কার বিজয়ী হয়েছে। অভিনব আবিষ্কৃত এই যন্ত্রটি দন্ত চিকিৎসার শিক্ষার্থীদের আসল দাঁতের অভাব পূরণ করেছে বা করবে।

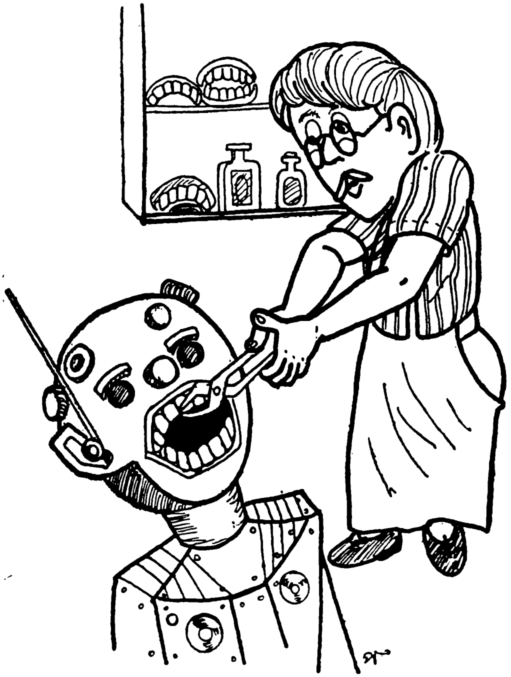

যন্ত্রটি অবিকল মানুষের মুখমণ্ডলের অনুরূপ। আমাদের মুখমণ্ডল, গাল, মুখ, জিহ্বা প্রভৃতি যেমন নরম ত্বক-জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি—এটিও তাই। এর ঠোঁট প্রসারিত করলে দু' পাটির বত্রিশটি সাদা ধবধবে দাঁত বাইরে প্রকটিত হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের দাঁত তোলা চাঁচা বা ড্রিলিং করার সময় মুখের ভিতর বা বাইরে যে সব প্রতিক্রিয়া হয়, এই যন্ত্রটিতেও হুবহু তারই সব প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। কি চমৎকার ব্যবস্থা। এই সব প্রতি-ক্রিয়াসম্পন্ন যন্ত্রটি দন্ত চিকিৎসার শিক্ষার্থীর কাছে একটি পরম সম্পদ। কারণ, প্রথমেই বলেছি, একজন দন্তরোগী যিনি সশরীরে কখনোই একজন শিক্ষার্থীর কাছে যাবেন না, অথচ কেউ সামনে না থাকলে অভিজ্ঞতা বাড়ে না এবং তার ফলে শিক্ষাও অসমাপ্ত থেকে যায়। কিন্তু এই যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে দন্ত রোগীর উপস্থিতির কোন প্রয়োজন হবে না। এটি দন্তরোগীর স্থান গ্রহণ করবে। যত খুশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাও—সে একবারটিও চিৎকার করবে না।

॥ তাপবিহীন চুল্লী ॥

মাটি বা ইঁটের উনানে জ্বালানি হিসাবে কয়লা বা কাঠ যা-ই ব্যবহার করেন না কেন রান্নার পরেও বেশ কিছুক্ষন উনানটি তেতে থাকবেই। বড় ফারনেস বা চুল্লীতেও জ্বালানী হিসাবে কয়লা বা বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও কাজের পর বেশ কিছুক্ষণ

ওটা তেতে থাকে এবং তার জন্য দুর্ঘটনাও কম হয় না। তার চেয়েও বেশি কষ্ট পান যাঁরা ওই রকম বড় বড় ফারনেসের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করেন।

মানবকল্যাণকামী কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী কারিগরদের এই সব অসুবিধার কথা ভেবেই বোধ হয় আবিষ্কার করেছেন এমন এক বিদ্যুৎ-চালিত চুল্লী—যা সব কিছুকেই তাতিয়ে তুলবে কিন্তু নিজে কখনো তেতে থাকবে না।

অভিনব এই তাপবিহীন চুল্লীতে ব্যবহার করা হয় 'ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইনডাকশন্' বা তড়িৎ চৌম্বক আবেশ। চুল্লীর সমতল উপরিভাগে থাকে তড়িৎ-কুণ্ডলী। তার ফলে রন্ধন পাত্র বা অন্যান্য ধাতব পাত্রের পরমাণুতে একটা প্রবাহের সঞ্চার হয়। এর দ্বারা ওই পাত্রে রাঁধবার মতো তাপ সৃষ্টি হয়, কিন্তু চুল্লীর কোনো বিশেষ জায়গা তেতে ওঠে না।

পাত্রে কোনো বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয় না, চুল্লীতে আগুনের কোন শিখাও নেই বা গরম হবার মত কোন তার বা অন্য কিছুই নেই। চুল্লীতে পোড়বার কিছু নেই বলে রাঁধবার অব্যবহিত পরেই তা সাফ করা চলে, কারণ ওই পাত্রের সংস্পর্শে থাকার ফলেই চুল্লীটি সামান্য যা গরম হয়। চুল্লীটির পরিকল্পনা করা হয়েছে অবশ্য গৃহস্থালীর জন্যেই, তবে তড়িৎ-কুণ্ডলীর ব্যবস্থা আর তড়িৎ প্রবাহের বিন্যাস এমনই, যে ভবিষ্যতে শিল্প কারখানার কাজেও এটিকে ব্যবহার করা যাবে।

বড় বড় ফারনেসগুলিকে তাপ-বিহীন যদি করা যায় তা'হলে লোহা ইস্পাত উৎপাদনকারী কারিগর এবং ঢালাইকররাও অতিরিক্ত উত্তাপের হাত থেকে রক্ষা পাবে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা এখনো এ নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের ধারণা এটা সম্ভব হবেই!

বিজ্ঞান সুভাষিত

* বর্তমান সভ্যজগতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির সমকক্ষ হইতে হইলে, বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধনা করিয়া যাবতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন ভিন্ন অন্য পথ নাই। এই জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাই জাতিগঠনের এক প্রধান উপাদান, যতদিন পর্যন্ত এই পথে আমরা বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইতে না পারিব, ততদিন আমাদের জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকার জন্মিবে না।

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

গ্রহ রহস্য

সিদ্ধার্থ ঘোষ

তিনিও এলেন এবং চলে গেলেন। যেমন এর আগে দু'জন এসেছেন ও চলে গেছেন। জুতোর ডগাটা ঠেকাবার চেষ্টা করে বিস্তর গুঁতো খেয়ে তিন বারই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে হয়েছে। আবার একটা আসছে। এই বাসটায় উঠতে না পারলে অফিসে নির্ঘাৎ লেট্। ছাতাটা বন্দুকের মতো ব্যাগে পুরে পাকা সোল্জারের মতো তৈরি হয়ে আছেন। ঠিক সময় মতো, ওয়ান্ টু থ্রি—একেবারে চার্জ করে ঢুকে যাবেন। বাসটা থামা মাত্র তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী ধেয়ে গেলেন। কী আশ্চর্য, বাসটা একেবারেই ফাঁকা যে! অনায়াসে পাদানির ওপর দু'টো পা-ই জায়গা পেয়ে গেল। তাঁর বুকটা মহা নিশ্চিন্তির একটা হাঁফ ছাড়ল, কণ্ডাক্টর বাস ছাড়ার টিঙ টিঙ-হুকুম দিয়ে দিল, আর অমনি তড়বড় করে দু'জনের পা মাড়িয়ে, ছাতার বাঁটের টানে একজনের পাঞ্জাবীর পকেট ফাঁসিয়ে হরিহরবাবু আবার নেমে পড়লেন। লোকটা পাগল নাকি! এত কাণ্ড করে উঠে—

হরিহরবাবু বাস থেকে নেমেই বাসস্টপে আড্ডারত দুটো ছেলেকে চোখ পাকিয়ে জামার আস্তিন গুটিয়ে ধমক লাগালেন, 'ছি ছি—সাত সকালে এমন অলুক্ষুণে কথা বলে কেউ!' বোঝা গেল এদেরই কোন একটা কথা শুনে তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে।

একটা ছেলে বিমর্ষ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'অলুক্ষুণে কথা নয় দাদা। একেবারে সত্যি কথা। কাবুর দাদা আনন্দবাজারের অ্যাকাউনটেণ্ট। উনি নিজে বলেছেন ফুমাঞ্চু আজ খেলবে না।'

'কেন কেন? হলটা কি তার?'

'দারুণ জ্বর। নিউমোনিয়া।'

হায় হায় করে ওঠেন হরিহরবাবু। শেষ পর্যন্ত কূলে এসে ভরাডুবি। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে ফুমাঞ্চুকে বর্মা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আজই সে প্রথম মাঠে নামবে এবং সবাই জানে যে ইস্টবাগানকে অন্ততঃ দুটো গোল সে দেবেই। নাঃ, মোহনবেঙ্গলের লাক্‌টাই খারাপ।

'আচ্ছা এর পেছনে ষড়যন্ত্র নেই তো?' হরিহরবাবু হঠাৎ কুটিল হয়ে ওঠেন।

'ঠিক বলেছেন দাদা। আমার একেবারে মনের কথাটা বলে ফেলেছেন।' সমীরও হরিহরের সন্দেহে সন্দেহ মেশায়।

হরিহরবাবু সমীর আর অপুর সঙ্গে কাফে ডি কেস্টোয় ঢুকে বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। মনের এরকম অবস্থায় অফিস করা সাজেনা। এখানেই ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে সাড়ে এগারোটা নাগাদ মাঠের দিকে রওনা হয়ে যাবেন।

দক্ষিণ কলকাতায় হরিহরবাবুর অফিস যাওয়াটা যখন পণ্ড হয়ে গেল ঠিক সেই সময় তুলকালাম চলেছে উত্তর কলকাতার রমেশ ঘোষাল বাইলেনের পাঁচের-একের-তিনের উঠোনে। ভ্যাবলা ভেউ ভেউ করে কাঁদছে, হাবলা কান ধরে নীল্‌-ডাউন্‌, ভ্যাব্‌লা-হাব্‌লার মা একবার করে ঘরে ঢুকছে আর ছুটে বেরিয়ে আসছে।

'ছাখো ছাখো—এইটা নয়তো?'

'তোমার মাথায় কি কোনদিন্‌ বুদ্ধি ছিল।' রঘুবাবুর হুঙ্কারে বাড়ি থরথর করে কাঁপছে। 'হাফপ্যান্টের পা অত লম্বা হয় নাকি? হাফপ্যান্ট মানে জানো?'

হাবলা-ভ্যাবলার বাবা ক্ষেপে আগুন। তাঁর হাফপ্যান্টটা লোপাট। এ এক অদ্ভুত বাড়ি। এতগুলো লোক রয়েছে তবু কোন জিনিসটা যদি ঠিক জায়গায় পাওয়া যায়। দু'খানা আলমারি, তিনটে তোরঙ্গ, দুটো আলনা সব উপুড় করে খোঁজা হয়ে গেছে তবু হাফপ্যান্টটা পাওয়া যায়নি। শুধু তাই না রঘুবাবুর সন্দেহ ক্রমেই ঘোরতর বিশ্বাস হয়ে উঠছে যে তাঁর হাফপ্যান্টটা দরজিকে দিয়ে কাটিয়ে নিশ্চয় ভ্যাবলাটার ফুলপ্যান্ট বানানো হয়েছে আর নয়তো ওই নতুন স্টেন্‌লেশ স্টিলের গেলাসটা কেনার সময় বাসনউলীকে······রঘুবাবুর গলা চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। এক ঝটকায় গেলাসটাকে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ওই গেলাসটাই এখন

তাঁর সবচেয়ে বড় শত্তুর। ওই গেলাসটার জন্যই নিশ্চয় তাঁর সাধের ইস্টবাগানকে দুর্ভোগে পড়তে হবে।

গেলাসের খন্‌খন্‌ শব্দে রঘুবাবুর মা বাতের ব্যথা অগ্রাহ্যি করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। চশমার লগবগে ডাঁটিটা কানের খাঁজে গুঁজে তিনি মোটা গলায় ধমক্‌ লাগালেন, 'বাড়িটাকে যে একেবারে মেছো পট্টি করে তুলেছিস্‌। ছেলে-গুলোর ওপরেও দয়া-মায়া বলে পদার্থ নেই মোটে। বুড়ো খোকার নাচন কোঁদন দ্যাখো একবার। হাপ্‌প্যান্ট হাপ্‌প্যান্ট করে একেবারে হেদিয়ে পড়ল। কি ছিরির চেহারা, হাপ্‌প্যান্ট পরে আরো খুলবে। তা বলি, কচি খোকা হবার আবার সাধ জাগলো কেন?'

মায়ের ধমকে রঘুবাবু একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুমার বকুনি শুনে হাবলার জলে ভেজা মুখে হাসি ফুটতে দেখে আবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। 'হ্যাঁ, সবাই এখন মজা পাচ্ছে আমায় দেখে। সব ঘরের শত্রু বিভীষণ। কেন হাফপ্যান্ট খুঁজছি সেটা জানো?'

'বলে কেতাত্থ করো, শুনি।' মায়ের তবু মন ভেজেনা।

'এই প্যান্ট, আমার পয়মন্ত প্যান্ট। এই হাফপ্যান্ট পরেই দু' বছর আগে ইস্ট-বাগানকে নিশ্চিত হারের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছি। আর গত বছর খেলার মাঠে যাইনি বলেই—ইস্‌ একেবারে দু' দুটো গোল্‌। না না—ওই প্যান্ট আজকে আমার চাই-ই চাই। যেখান থেকে পারো নিয়ে এসো। আজ ইস্টবাগান যদি না জেতে—'

'এই নে তোর পয়মন্ত প্যান্ট—' রঘুবাবুর মা তালগোল পাকানো একটা জিনিস ছুঁড়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন রঘুবাবু—পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে—ভ্যাবলা হাবলা, ভ্যাবলা হাবলার মা, রঘুবাবু সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাপড়ের ডেলাটার ওপর।

মা যথাস্থানে দাঁড়িয়ে হাফ্‌প্যান্ট হারানোর রহস্যভেদ করে দেন, 'ওদের কারুর দোষ নেই। আমিই ওটাকে ঠাকুর ঘরের ন্যাতা করেছিলাম।'

হাপপ্যান্টটা পাওয়া গেলেও ন্যাতা হিসেবে সে একেবারেই নেতিয়ে পড়েছে।

তার সাদা রঙ কালো কুটকুটে হয়েছে। সবেধন নীলমণি একটা বোতাম শুধু ঝুলঝুল করছে, তারও অর্ধেকটা ভাঙা কিন্তু রঘুবাবু বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। হাবলা ভ্যাবলার মা-কে আদেশ জারী করে দিয়েছেন, এক্ষুণি ফুটন্ত জলে সোডা সাবান দিয়ে ওটাকে কেচে নাও। তারপর ইস্ত্রি করে শুকিয়ে নিয়ে কটা বোতাম লাগিয়ে দিলেই হল। হাফপ্যান্ট যখন পাওয়া গেছে ইস্টবাগানকে আজ ঠেকায় কার সাধ্যি। মোহনবেঙ্গলকে খুব কম করে হলেও দু' দুটো তো ঘোলাবেই!

* * *

খেলা শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে লালবাজারের কন্টোল রুম থেকে ফোর্ট-উইলিয়ামে ফোন্ ছুটল। তিন মিনিটের মধ্যে ময়দানে পল্টনদের তলব করা হয়েছে। আজ যা ঘটতে চলেছে তা ঠেকাবার সাধ্য কলকাতা পুলিশের বা সি.আর-পির নেই। আজ বোধহয় এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দাঙ্গা বাঁধবে কলকাতায়। মোহনবেঙ্গল ইস্টবাগানের রেশারেশি তো আছেই কিন্তু তা বলে এরকম ঘটনা কেউ কখনো দেখেনি। এমন কি যে-মোহনবেঙ্গল দুই-একে জিততে যাচ্ছে তাদের সমর্থকরাও

নিশ্চয় বুকে হাত রেখে বলতে পারবে-না মোহনবেঙ্গল ভাল খেলে জিতেছে। রঘু-

বাবুর পয়মন্ত হাফপ্যান্ট, ও আরো তিরিশ হাজার মানুষের কারুর ঠনঠনে কালীর জবাফুল, কারুর দই হলুদের ফোঁটা ও কারো বিভূতি বিফল করে সেকেণ্ড হাফের তিরিশ মিনিট বাদে পর পর দুটো গোল খেয়ে গেছে ইস্টবাগান। আর গোল মানে কি, বল দুটো যেন আপন মনে গড়াতে গড়াতে গোলে ঢুকে গেল। রেফ্‌রির বাঁশি বাজার পর বল যখন আবার মাঝ মাঠে বসানো হচ্ছে তখন বোঝা গেল সত্যিই গোল হয়েছে। এমন কি মোহনবেঙ্গলের সমর্থকরা অবধি উল্লাসে ফেটে পড়তে দেরী করেছে। একটা গোলও না হয় সহ্য করা যেত, ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। সুজয় গোল্‌কি হিসাবে ইস্টবাগানকে অনেক বিপদ থেকে উদ্ধারও করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় গোল্‌টা? ছি ছি ছি! রঘুবাবু হলফ করে বলতে পারেন তাঁর পুঁচকে ভ্যাবলাও বলটাকে রুখে দিতে পারত। কত কাণ্ড করে হাফ্‌প্যান্টটা যোগাড় হল—কিন্তু হাফ্‌প্যান্টের তো দোষ নেই। হাফ্‌টাইম অবধি ইস্টবাগানই তো জিতছিল এক গোলে এবং সত্যিকার ভাল খেলে। ইস্টবাগানের দাপটের সামনে কুঁকড়ে গেছল মোহনবেঙ্গল। চিটিঙবাজি—সব চিটিঙবাজি! গোল্‌কিকে ঘুষ খাওয়ানো হয়েছে—এছাড়া এরকম অঘটন ঘটতেই পারে না। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল একেবারে! জ্বরের রুগী ফুমাঞ্চু ধুঁকতে ধুঁকতেও দু'টো গোল ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ইস্টবাগানের সুজয়, কলকাতার মাঠের সেরা গোল্‌কি যে ঘুস খেয়ে দু দুটো জোলো বল গোলে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেটা একেবারে প্রমাণ হয়ে গেল খেলা ভাঙার আড়াই মিনিট আগে। ইস্টবাগানের তিরিশ হাজার সমর্থক তখন মিলেমিশে একটা বুভুক্ষু রক্তচোষা দৈত্যের দেহ ধারণ করছে। খেলাও শেষ হবে আর দৈত্যটাও ঝাঁপিয়ে পড়বে। তিরিশ হাজার মানুষের ষাট হাজার চোখ সুজয়ের ওপর। কিন্তু সুজয় সবাইকে একেবারে ভেল্‌কি দেখিয়ে দিল। খেলা শেষ হবার আড়াই মিনিট আগে হঠাৎ সে মাঠ ছেড়ে সোজা দৌড় লাগাল টেন্টের দিকে। ব্যাপারটা বোঝার আগেই পুলিশ মিলিটারি তাকে ঘিরে ধরে মাঠের বাইরে নিয়ে চলে গেল। এইভাবে কোন জানান না দিয়ে, গোল ফাঁকা রেখে কেউ মাঠ ছেড়ে চলে যেতে পারে? আজ অবধি ইস্টবাগান মোহনবেঙ্গলের ইতিহাসে এরকম ঘটনা ঘটেছে কোনদিন? যে এতখানি দায়িত্বজ্ঞানহীন তার পক্ষে ঘুষ নিয়ে টিম্‌কে হারানো তো খুবই সহজ ব্যাপার।

*　　　　　*　　　　　*

'সুজয়কে ধরতে না পারার রাগটা পুষিয়ে নিয়েছে সমর্থকেরা নিজেদেরই টেণ্টে আগুন দিয়ে। যেন ভাই বেইমানি করেছে বলে দাদা নিজের ঘরই পুড়িয়ে দিল।'

কলমটা রেখে অভিরূপ মুড়ির ঠোঙাটা তুলে নিল। খবরের কাগজের প্রেস রুমটা খাঁ খাঁ করছে এখন। শুধু টেলিপ্রিণ্টার যন্ত্রটাই মাঝে মাঝে কট্‌কটে গলায় আপনমনে একবার করে একটু বক্তৃতা দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে। অভিরূপের আজ নাইট ডিউটি। কিছুক্ষণ আগে অবধি বিকেলের অঘটন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলেছে। খেতে যাওয়াটাও হয়ে ওঠেনি। মুড়ি চিবিয়েই কাটাতে হবে রাতটা। অভিরূপের হয়েছে সত্যিকার জ্বালা। সুজয় তার অনেক দিনের বন্ধু। ঘুষ নেবার ছেলে সুজয় নয়। তবু নিজের চোখকেও অবিশ্বাস করতে পারেনা অভিরূপ। কাউকে বোঝানো যাবেনা, কি করে ওই রকম গোল খেতে পারে সুজয়। কোনো ফার্স্ট ডিভিশান……নাঃ, ভেবে আর লাভ নেই, রিপোর্টটা শেষ করা দরকার। ঠোঙাটা টেবিলে রেখে কলমটা সবে হাতে নিয়েছে, ম্লান কণ্ঠে টেলিফোনটা ডাক দিল।

'হ্যালো—'

'প্রেস্‌রুম ? অভিরূপবাবুর ফোন।'

'কথা বলছি।'

'হ্যালো, অভিরূপ বলছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি সুজয়। কোন ভয় নেই, আমি নিরাপদেই আছি। কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। আমি শুধু একটা কথা জানাবো বলে ফোন করছি। আচ্ছা তুইও কি বিশ্বাস করছিস যে আমি ঘুষ খেয়েছি ?'

'না, মানে তা নয়, কিন্তু কিছুই তো—'

'বিশ্বাস কর্ অভিরূপ, ঘুষ আমি খাইনি। কিন্তু প্রশ্নটা শুধু ঘুষ খাওয়ার নয়। কে কি মনে করে আমার সম্বন্ধে তাতে কিছু যায় আসে না। তুই ভাল করেই জানিস আমি সেই ভাবে পয়সার কাঙাল ন'ই।'

'কিন্তু কি করে তুই এরকম—' অভিরূপ জানে এখন একথাটা না বললেই বন্ধুর মতো হত। কারণ ইস্টবাগানের সমর্থকদের হাতে পড়লে সুজয়কে আর বাঁচানো যাবে

না। তবু জিজ্ঞেস না করে পারে না।

'আরে সেইটা বলবো বলেই তো ফোন করা। কেন ওভাবে গোল খেলাম জানিস? এক সঙ্গে তুটো বল্ দেখেছিলাম।'

'কি? কি বললি? তুটো বল? কি বলছিস তুই কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বিশ্বাস কর্ বা না কর্ আমি একসঙ্গে তুটো করে বল দেখেছি। সব সময় নয়, হঠাৎ হঠাৎ। হাফ টাইমের আগে যখন দেখেছিলাম, গোলটা খাইনি, কারণ আসল বলটার দিকে নজর দিয়েছিলাম। আর এই তুটো গোল যে খেয়েছি তার কারণ ওই তুটো বলের মধ্যে আসল বলটাকে চিন্‌তে পারিনি।'

অভিরূপ আর বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনা। বেশ বিরক্ত হয়েই বলে, 'তোর এইসব গাঁজাখুরি গপ্পো কেউ বিশ্বাস করবেনা। এ কখনো হতে পারে?'

সুজয়ের কিন্তু কোন বিকার নেই। সে দৃঢ় গলায় দাবী করে, 'কেউ বিশ্বাস করবে না জানি। আমি নিজেও তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস থাকলে না হয় ভেবে নিশ্চিন্ত হতাম, তাঁরই লীলা বলে। থাক্‌গে, কি আর করা যাবে, তুইও যখন—'

অভিরূপ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'কোথায় আছিস তুই?'

'সে কথা জেনে আর কি হবে বল?'

'না, আসলে তোর খুব সতর্ক হয়ে থাকা দরকার। বুঝতেই তো পারছিস। আচ্ছা, তোর চোখ-টোখ খারাপ……'

'আমার চোখের জ্যোতি ও মাথার বুদ্ধি তুটোই তোর থেকে বেশি। বুঝলি?'

খটাস্ করে ফোনটা ছেড়ে দিল সুজয়। অভিরূপ রিসিভারটা তখনো নামায়নি, পায়ের শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকাল। ফটোগ্রাফার রায়চৌধুরী মুখচুন করে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

রিসিভারটা নামিয়ে জিগ্যেস করল অভিরূপ, 'কিহে রায়চৌধুরী ব্যাপার কি?'

রায়চৌধুরী টেবিলের ওপর একটা খাম ফেলে দিয়ে ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। 'আমার শুধু পাগল হতে বাকী আছে। তিন ঘণ্টা ধরে শুধু একটা নেগেটিভ দেখছি আর প্রিন্ট করছি!'

'ব্যাপারটা তো কিছুই বুঝছি না।'

'বোঝার আর কি আছে। খামটা খুলে ছাখো, তাহলেই বুঝবে।'

অভিরূপ খামটা খুলতেই তিন চারটে ছবি আর একটা নেগেটিভ বেরিয়ে পড়ল। আজকের খেলার মাঠের ছবি। ফটোটা চোখের কাছে তুলেই যেন বিদ্যুতের ঝিলিক লাগল সারা শরীরে। জালের কাছে একটা জটলার ছবি। ফুমাঙ্কুর পায়ে একটা বল, আর একটা বল ঠিক তারই কিছুটা ডান দিক্ চেপে। হু'টো বল! সঙ্গে সঙ্গে অভিরূপের মনে পড়ে গেল সুজয়ের কথা। সেও দুটো বল দেখেছে। ভুরু কুঁচকে আরেকবার মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখল অভিরূপ তারপর খাম থেকে নেগেটিভটা টেনে নিয়ে উঁচু করে আলোর সামনে ধরলো।

রায়চৌধুরী বিষণ্ণ গলায় বলে উঠল, 'দেখার কিচ্ছু নেই। সত্যিই দু'টো বল ধরা পড়েছে ক্যামেরার চোখে।'

'ছবিটা তো তুমিই তুলেছ, তখন দেখতে পাওনি?' অভিরূপ প্রশ্ন করে।

'না। তবে সেটার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। ফটোগ্রাফাররা খুব যান্ত্রিক ভাবে এই সব অ্যাক্‌শান শট নেয়। আগের থেকেই সব রেডি করা থাকে, শুধু সুযোগ ও সময় মতো শাটার টেপা।'

'কিন্তু আমি তো ভাবতেই পারছি না, এ কি করে সম্ভব। সুজয় তো তাহলে ঠিকই বলেছে। কিন্তু আমরা যদি এই ছবি ছেপেও দিই তবু কি কেউ বিশ্বাস করবে। বলবে গাঁজাখুরি। খবরের কাগজের কারসাজি।' অভিরূপ রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়ে।

রায়চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'এই ছবি কাল ছাপতেই হবে, না হলে আমি রিজাইন্ করবো। যে-কোন বিজ্ঞানী, ফরেন্‌সিক ডিপার্টমেন্ট টেস্ট করে দেখতে পারে নেগেটিভ। শুধু একটা নয়,—দু'দুটো নেগেটিভে এই রকম দুটো বলের ছবি উঠেছে!'

রায়চৌধুরী রেগে পা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে রইল অভিরূপ। এখন উপায়? হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, রায়চৌধুরী মোহনবেঙ্গলের একেবারে কট্টর সাপোর্টার। সেইজন্যেই সে সারাক্ষণ ইস্টবাগানের গোলপোস্টের পাশে দাঁড়িয়েছিল। মোহনবেঙ্গলের সাপোর্টার হয়েও সুজয়ের দুটো বল দেখার কথাকে সমর্থন করার জন্যে বুজরুকি করবে—অসম্ভব—অকল্পনীয়।

অভিরূপ মনস্থির করে ফেলল, ওই দুটো বল দেখার কাহিনী ছবি সমেতই কালকের কাগজে ছেপে দেবে।

* * *

খবরের কাগজের ভ্যান ভোর ছ'টা নাগাদ 'দৈনিক বার্তাবহ'কে কলকাতার বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌঁছে দিল আর তার দু' ঘণ্টার মধ্যে মধ্য কলকাতার 'দৈনিক বার্তাবহ'-র অফিসের কোন জানালার একটি সারশিও আর অটুট রইল না। আবার নতুন করে দাঙ্গা লাগার উপক্রম। হাজার হাজার মানুষ হাজার রকমের মতামত নিয়ে জমা হয়েছে। একদিকে তাদের নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি, অন্যদিকে 'দৈনিক বার্তাবহ'র প্রতি আক্রোশ। এই রকম একটা ঘটনা নিয়েও খবরের কাগজের মুনাফা লোটার মনোভাব বরদাস্ত করা যায় না। চল্লিশ পয়সা দামের 'দৈনিক বার্তাবহ'-র দাম উঠেছে দশ টাকা।

অবস্থা একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার উপক্রম। অভিরূপের প্রায় হাত কামড়ানোর দশা। কি কুক্ষণেই যে-খবরটা ছেপেছিল! এই রকম সময়ে হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল। দীর্ঘ টেলিগ্রাম। বিরক্ত হয়েই টেলিগ্রামটা খুলেছিল অভিরূপ, কিন্তু তারপরেই চম্‌কে উঠল। চশমা লাগিয়ে ঝুঁকে পড়ল টেলিগ্রামের ওপর :

'ডিয়ার সার্! গোলকিপার সুজয় সত্যিই দু'টো বল দেখেছিল। ফটোগ্রাফারের ছবিতেও সেই বল দুটোই ধরা পড়েছে। সুজয়ের কোন দোষ নেই। এর জন্য আমিই দায়ী। দয়া করে মার্জনা করে দেবেন আমাকে। দশ বছর আমি দেশ ছাড়া। পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণার ফাঁকে ছুটি পেয়ে দেশে এসেছিলাম। আমরা তিন পুরুষ মোহনবেঙ্গলের সাপোর্টার। পুরনো টিমকে যদি সাহায্য করতে পারি এই ভেবেই কাণ্ডটা করে ফেলেছি। বুঝতেও পারিনি যে এখন ইস্টবাগান মোহন-বেঙ্গলের খেলা নিয়ে এইরকম কাণ্ড হয়। যাই হোক্ এবার দু'টো বল্ দেখার রহস্যটা ভেদ করে দিই। আমি লেজার রশ্মি নিয়ে গবেষণা করছি। আপনারা হয়তো লেজার রশ্মির বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা শুনেছেন। পেন্সিল টর্চের আলোর মতো সরু একটা লেজার রশ্মি পাঠিয়ে মহাকাশযানকে খতম করে দেওয়া বা বাড়িঘর বা ধাতব বস্তু ইত্যাদি পুড়িয়ে দেওয়ার অনেক গল্পই আজকাল সায়েন্স ফিক্‌শানে

লেখা হচ্ছে। এই লেজার রশ্মির বিশেষ একটি ধর্মকে কাজে লাগিয়ে আজকাল এক ধরনের ছবি তোলা হয় তার নাম হলোগ্রাম। আমরা সাধারণতঃ যেসব ফটো বা সিনেমা দেখি সেগুলো দ্বিমাত্রিক, অর্থাৎ সেই ছবি থেকে বস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থই শুধু বোঝা যায়, বস্তুর গভীরতা টের পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি বস্তুর যাবতীয় তথ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হলোগ্রামের ফলকে মুদ্রিত থাকে। তার মানে হলোগ্রাম হল বস্তুর ত্রৈমাত্রিক চিত্রের নেগেটিভ। এই হলোগ্রামের ওপর আলো ফেললে নির্গত আলো ঐ বস্তুটির ত্রৈমাত্রিক প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। সবচেয়ে মজার কথা হল এই প্রতিবিম্ব কোন পরদার ওপর ফেলার দরকার হয় না। এটা শূন্যের মধ্যেই দেখা যায় এবং এই বাস্তব প্রতিবিম্বের ছবি ক্যামেরাতেও ধরা পড়ে। হলোগ্রামের প্রতিবিম্বর আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে। ধরুন একটা মোটরগাড়ির হলোগ্রাম তোলা হল। এবার আপনি একটা দৃষ্টিকোণ থেকে মোটরগাড়ির সামনেটা দেখতে পারেন আবার দৃষ্টিকোণ পাল্টালে মোটরগাড়ির পাশে দরজার দিকটাও দেখতে পারেন। অর্থাৎ আসল মোটরগাড়িটাকে ঘুরে ঘুরে দেখলে যেমন দেখায়, তেমনি দেখায় এই হলোগ্রামের প্রতিবিম্বেও। যাকৃগে, এ বিষয়ে আপনারা যে-কোন পদার্থবিদের কাছে বিশদভাবে জেনে নিতে পারবেন। আসল কথাটা এবার বলি। আমি খেলার মাঠে এসেছিলাম একজন প্রেস্ ফটোগ্রাফারের কার্ড যোগাড় করে। সঙ্গে ছিল ফুটবলের একটা হলোগ্রাম এবং হলোগ্রামের প্রতিবিম্ব দেখাবার উপযুক্ত প্রজেক্টার ইত্যাদি। গোল্‌কিপারের সামনে এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম যাতে মাঝে মাঝে হলোগ্রামের বলের প্রতিবিম্ব দেখিয়ে গোলকিপারকে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়া যায়। সুজয় যে গোলদুটো খেয়েছে তার কারণ এইটাই। আমি আজকের ফ্লাইটেই কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি আর খেলাটা যাতে আবার অনুষ্ঠিত হয় তার জন্যে আই-এফ্-এ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের কাছে হলোগ্রামটি সমেত আমার স্বীকারোক্তি পাঠিয়ে দিয়েছি। আশাকরি এরপর সুজন এবং আপনারা দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন।—ক. বা.'

অভিরূপ টেলিগ্রামটা তিন বার পড়ে আবার চতুর্থবার পড়ার জন্য মুখ নিচু করল।

শব্দের নাম বিষ

অনীশ দেব

অফিসে বেরোবার আগে খবর শোনাটা সীতানাথের বরাবরের অভ্যেস। তাই আজও টি-ভি চালিয়ে তারপর খাবার টেবিলে বসেছেন। এক চামচ ভিটামিন ‘এ’, ছু-চামচ ভিটামিন ‘সি’ ও চার চামচ প্রোটিন সাধারণতঃ তিনি খেয়ে থাকেন। উর্মিলা জানে তাঁর অভ্যেস। তাই প্লেটে করে সেইটুকু গুঁড়ো খাবারই সাজিয়ে দিয়েছে। টাইয়ের নটটা ঠিক করে নিয়ে প্রথম চামচ ভিটামিন মুখে তুলতেই টি-ভিতে খবর শুরু হলো প্রথম খবরটা একটা ছুর্ঘটনার : একটা জেট প্লেন কোন্ এক অজানা কারণে এক পারমাণবিক বিছ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর ভেঙে পড়েছে। দ্বিতীয় খবরটা শুরু হবার মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকলো স্থমন—সীতানাথের একমাত্র ছেলে। বছর বারো বয়েস। প্রথমে বাবার দিকে দেখলো স্থমন, তারপর তাকালো টি-ভির দিকে। গম্ভীর মুখে বললো, ‘বাবা, টিভির ভলিয়ুমটা একটু আস্তে করে দিচ্ছি। তুমি বড্ড জোরে চালিয়েছো। কম করে নব্বই ডেসিবেল তো হবেই—’ তারপর একটু থেমে বললো, ‘এতে তোমার ক্ষতি হতে পারে—’

সীতানাথের ভিটামিন ‘সি’ সমেত চামচ মাঝপথেই থেমে গেলো। মুখ পর্যন্ত পৌঁছলো না। কোন উত্তরও তিনি ভেবে পেলেন না। দেখলেন, স্থমন পায়ে পায়ে

এগিয়ে গিয়ে টি-ভির ভলিয়ুমটা কমিয়ে দিলো। তারপর ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে বলে গেলো, 'আর ভয় নেই। এখন ষাট ডেসিবলের নিচেই আছে—'

সীতানাথ নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। সত্যি, সুমনটা ভারী অদ্ভুত হয়ে উঠছে দিনকে দিন। মাস কয়েক হলো এই 'শব্দ' ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢুকেছে। দোষটা অবশ্য সীতানাথেরই। তিনিই প্রথম ওকে 'শব্দকল্প' নামে একটা বই কিনে দেন: সুমনের জন্মদিনের উপহার। সে বইতে শব্দের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিকের কথা লেখা ছিলো। বইটা সুমনের প্রচণ্ড মনে ধরে যায়। ইস্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে দিনরাত্তির শব্দ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। ওর কাছেই সীতানাথ প্রথম শিখেছেন, জিনিসপত্র যেমন ওজন করে মাপে: এক কেজি, দু-কেজি, তেমনি শব্দ মাপে 'ডেসিবেল' দিয়ে: পাঁচ ডেসিবেল, দশ ডেসিবেল…। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, একদিন অফিসে বেরোবার ঠিক আগে সুমন এসে ঘরে ঢুকলো। বললো, 'বাবা, তোমার অফিসে যাবার পথে রাস্তায় ভীষণ হৈ-হট্টগোল হয় না?'

ব্যাপারটা সীতানাথ আগে কখনও চিন্তা করে দেখেন নি। সাধারণতঃ পাতাল রেলে করেই তিনি অফিসে যান; খুব বেশি দেরী হয়ে গেলে তবেই হেলিকপ্টার ট্যাক্সি। সুতরাং, অফিস যাবার পথে বিরক্তিকর শব্দ যে বেশ কিছু শুনতে হয় তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য অফিসে পৌঁছে গেলে আর চিন্তা নেই। তুখোর হিসেব শাস্ত্রবিদ সীতানাথ সেন এইট্থ্ জেনারেশন কম্পিউটার নিয়ে বসে যান কোম্পানীর লাভ-ক্ষতির খতিয়ান কষতে। সেখানে সব কিছু শান্ত, চুপচাপ—কোন গোলমাল নেই।

সুতরাং বারো বছরের ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, গোলমাল-হট্টগোল একটু হয়। টিউব রেলের শব্দ, হেলিকপ্টারের শব্দ, জেট প্লেনের শব্দ…'

'তুমি তাহলে এক কাজ করবে,' উৎসাহভরা চোখে সুমন বলেছে, 'খুব জোরে কোন শব্দ হলেই কানে হাত চাপা দেবে। বিজ্ঞানীরা বলে এর চেয়ে ভালো ওষুধ নাকি নেই—' কি ভেবে সুমন আবার বলছে, 'ঠিক আছে, দাঁড়াও, তোমার জন্যে আমি একটা 'ইয়ার প্রোটেক্টর' বানিয়ে দেবো। তাহলে যতোই শব্দ হোক, তোমার কানে কিচ্ছু হবে না।'

সীতানাথ আর পারেন নি, হেসে উঠেছেন। বলেছেন, 'ঠিক আছে, দিও। এখন যাও, পড়তে বোসো গিয়ে।'

তখন ব্যাপারটাকে অতো গুরুত্ব দেন নি সীতানাথ। সুমনের ছেলেমানুষী ভেবেছেন। কিন্তু ক্রমে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিতে লাগলো। ওর শোবার ঘরটাকে এক অদ্ভুত ঘরে পরিণত করলো সুমন। স্টিরিও, স্টিরিও রেডিও, অ্যাম্পলিফায়ার, অসিলেটর ইত্যাদি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ঘরটাকে ভরিয়ে ফেললো। এসবই নাকি শব্দ তৈরীর যন্ত্র। বিভিন্ন ধরনের শব্দ নিয়ে এসব যন্ত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায়। তারপর মাথায় হেডফোন লাগিয়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই সুমন ঐ ঘরে পড়ে থাকতে লাগলো। পড়াশোনা উঠলো শিকেয়। প্রথম প্রথম উর্মিলা অনুযোগ করতো, সুমন একটুও লেখাপড়া করছে না। কিন্তু সীতানাথকে নির্বিকার দেখে সে-ও চুপ করে গেছে। ঘটনা কিছুই সীতানাথের নজরে এড়ায় নি। তাই একদিন অফিস থেকে ফিরে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড সল্যুশন দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নেবার সময় সুমনকে ডাকলেন। সুমন এলো। সীতানাথ প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মা বলেছিলো তুমি নাকি একটুও পড়াশোনা করো না?'

'করি তো—' মাথা নীচু করে জবাব দিলো সুমন।

'শব্দ নিয়ে আজকাল তুমি এসব কি শুরু করেছো?' রুক্ষস্বরে জানতে চাইলেন সীতানাথ।

'শব্দ' কথাটা শুনে সুমনের মুখ চোখ ঝক্‌মক্ করে উঠলো। বললো, 'বাবা, তুমি যে শব্দের বইটা জন্মদিনে কিনে দিয়েছো ওটা দারুণ চমৎকার। জানো, সব থেকে কম যে শব্দ আমরা কানে শুনতে পাই—মানে জিরো ডেসিবেল—তাতে আমাদের কানের পর্দা কতোটুকু কাঁপে? এক সেন্টিমিটারের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ। দুটো ঘাসের শিস্ ডগায় ডগায় ঠেকালেও ঐ রকম শব্দ পাওয়া যায়।'

'আমি তোমার কাছ থেকে এসব শুনতে চাই নি।' গম্ভীর হয়ে বললেন সীতানাথ, 'এখন মন দিয়ে লেখাপড়া করার বয়েস—তাই করো। তোমার ঘরের ঐ সব ছাইপাঁশ আমি সব ধরে 'মেটাল ইভাপোরেটর'এ ফেলে দেবো।'

'বাবা, এই যে তুমি এখন রেগে যাচ্ছো, তার কারণ কি জানো? সারাদিন ধরে তুমি এতো বিরক্তিকর শব্দ শোনো—একশো, একশো কুড়ি ডেসিবলের শব্দ তো

হবেই ; আর, সেই জন্যে অল্পেতেই সবার ওপরে বিরক্ত হয়ে ওঠো। জানো, একশো পঞ্চাশ ডেসিবলের শব্দ শুনলে মানুষ কালা পর্যন্ত হয়ে যায় ?'

আর সহ্য করতে পারেননি সীতানাথ। সজোরে এক চড় কষিয়ে দিলেন ছেলের গালে। চিৎকার করে উঠলেন একই সঙ্গে, 'অসভ্য, ইতর ছেলে কোথাকার! ভদ্রভাবে কথা পর্যন্ত বলতে শেখোনি ? তোমাকে এই শেষবারের মতো —'

সীতানাথের কথা শেষ হবার আগেই ঊর্মিলা বেরিয়ে এসেছে পাশের ঘর থেকে।

'কি হলো, তুমি আবার হঠাৎ রেগে উঠলে কেন ? সুমন, যা শিগগির, তোর ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বোস্!'

সুমন চলে গেলে নীচু গলায় ঊর্মিলা বললো, 'তুমি অল্পেতে এতো রাগ কোরো না। সুমন কাল বলছিলো, বেশি বাজে শব্দ কানে গেলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়, হার্ট খারাপ হয়। তোমার তো আবার দুটোরই দোষ আছে।'

সীতানাথ নিশ্চুপ হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ; তারপর সটান গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। অসহ্য। ভাবলেন তিনি।

ঊর্মিলা ঘরে ঢুকতেই চমক ভাঙলো সীতানাথের। ভিটামিন 'সি'র চামচ এখনও তাঁর মুখের সামনে ধরা। সুমনটাকে ডাক্তার দেখানো দরকার। নইলে দিনের পর দিন যেভাবে বেয়াড়া হয়ে উঠছে তাতে কিছুদিনের মধ্যে হয়তো হাতের বাইরে চলে যাবে। সীতানাথের দুশ্চিন্তা ঘন হয়ে ওঠে।

'সে কি, তোমার এখনও খাওয়া হয়নি ? অফিসের যে দেরী হয়ে যাবে।' কথাগুলো বলেই সীতানাথকে একদৃষ্টে দেখতে থাকে ঊর্মিলা। ব্যাপারটা হয়তো বুঝতে পারলো। বললো, 'সুমনের ওপর আজকাল তুমি কথায় কথায় রাগ করো। এমনকি আমাকেও রেহাই দাও না। তোমার কি হয়েছে বলো তো ?'

স্ত্রীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন সীতানাথ। সুইচ ঘুরিয়ে টি-ভি সেট অফ করে দিলেন। অফিসে বেরোবার সময়েতেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো। ভাবলেন তিনি।

'সুমন আজকাল আমাদের 'লাকি' কে নিয়ে কি সব পরীক্ষা করছে।' নরম গলায় বললো ঊর্মিলা। প্লেট-চামচ সব গোছাতে শুরু করলো অভ্যস্ত হাতে।

লাকি সীতানাথের পোষা অ্যালসেশিয়ান। অত্যন্ত প্রিয়। জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে ভুরু কুঁচকে তাকালেন সীতানাথ। প্রশ্ন করলেন, 'কি পরীক্ষা ?'

ঊর্মিলা বিরক্তি ভরে বললো, 'ওর ঘরের সব যন্ত্রপাতির একটা সুইচ বসিয়েছে ঘরের বাইরে। ঐ একটা সুইচ টিপলেই ঘরের ভেতরে নানারকমের হুলুস্থুলু শব্দ শুরু হয়। ও লাকিকে ঘরে বন্দী করে বাইরে থেকে ঐ সুইচটা টিপে দেয়। তারপর মিনিট পাঁচেক বাদে কুকুরটাকে বের করে আনে। আমি বারণ করতে গেলে শোনে না। বলে, এক্সপেরিমেন্ট করছি। শব্দের হাত থেকে এই পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। জানো মা, প্রতি বছরে বিরক্তিকর শব্দের জোর এখানে এক ডেসিবেল করে বাড়ছে। তাহলে ভাবো তো, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে, দু-হাজার একাত্তর সালে, কি অবস্থাটাই না হবে ? কেউ আর কানে শুনতে পাবে না।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে ঊর্মিলা বললো, 'আমি বাবা বিজ্ঞানের অতো মারপ্যাঁচ বুঝি না ; তবে ক'দিন ধরে দেখছি 'লাকি' তেমন করে খাওয়া-দাওয়া করে না, সব সময়েই বসে বসে ঝিমোয়।'

* * *

অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে পা দিতেই বাড়ি ফাটানো এক বিরক্তিকর শব্দ সীতানাথের কানে আছড়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাগিদে তিনি আজ হেলিকাপ্টার ট্যাক্সিতে ফিরেছেন। সুতরাং হেলিকাপ্টারের একঘেয়ে গোঁ গোঁ শব্দের পর এই গোলমাল তাঁকে ভীষণ বিরক্ত করলো। চেঁচিয়ে ঊর্মিলাকে ডাকলেন তিনি। ঊর্মিলা আসতেই ফেটে পড়লেন সীতানাথ, 'কি হচ্ছে এসব ? সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়িতে ফিরেও কি এতোটুকু স্বস্তি পাওয়া যাবে না ?'

রান্নাঘরে আধুনিক রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত ছিলো ঊর্মিলা। সে-ও উঁচু গলায় জবাব দিলো, 'তা আমি কি করবো ? তোমার আদরের ছেলে, তুমিই বলো। আমার কথা শুনলে তো হতোই !'

এমন সময় শব্দকল্পদ্রুম থামলো। তার একটু পরেই ঘরে ঢুকলো সুমন। পেছন পেছন লাকি। কুকুরটা কেমন নির্জীবভাবে টলতে টলতে হাঁটছে—যেন এক্ষুনি পড়ে যাবে কাৎ হয়ে।

প্রচণ্ড চিৎকার করে সীতানাথ বলে উঠলেন, 'লাকিকে নিয়ে কি শুরু করেছো তুমি ?'

'এক্সপেরিমেন্ট'। শান্ত স্বরে উত্তর দিলো সুমন।

আরও রেগে গেলেন সীতানাথ। বললেন, 'তোমাকে কতোদিন বারণ করেছি যে—'

বাবাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো সুমন, 'তুমি যে সামান্য কারণে রেগে উঠছো, তার কারণ তোমার সারাদিন শোনা গোলমালের শব্দ। এই যে তুমি আমাকে বুঝতে চাও না, আমি তোমাকে বুঝতে পারি না—এরও কারণ ঐ একই। আর তুমি যে আজকাল মায়ের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া করো তাও একই কারণে—দেখবে, এর থেকেই হয়তো তোমাদের ডিভোর্স হবে; বিজ্ঞানীরা তাই বলে।'

যেন ভিসুভিয়াস ফেটে পড়লো ঘরের মধ্যে। ছেলেকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি হাত-পা চালাতে লাগলেন সীতানাথ। সুমনের চুলের মুঠি ধরে নিয়ে চললেন ওর ঘরে। কিল-চর মারতে মারতে বললেন, 'লাকিকে নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করা! চলো আমিও তোমার ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করবো। মুখে যা আসে তুমি তাই বলবে! এতোদূর সাহস!'

সুমনকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শেকল তুলে দিলেন সীতানাথ। তারপর দরজার পাশে বসানো যন্ত্রপাতির সুইচটা 'অন' করে দিলেন। ঘরের ভেতরে শুরু হলো শব্দের তাণ্ডব। সুমনের চিৎকার ও উর্মিলার চিৎকার সবকিছু কেমন গুলিয়ে গেলো সীতানাথের। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সম্বিত ফিরতেই দেখলেন, সুইচ 'অফ' করে ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে উর্মিলা। 'সুমন! সুমন!' বলে ডাকছে। হাজার হলেও মায়ের মন তো!

আচ্ছন্ন পায়ে টলতে টলতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো সুমন। দু-চোখে অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি। হঠাৎই ও অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, তারপর হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলো। আর সামনে দাঁড়ানো সীতানাথ ও উর্মিলাকে বারবার করে বলতে লাগলো, 'তোমরা কে? আমার মাকে আর বাবাকে একটু ডেকে দেবে? দাও না ডেকে? ওরা জানে না, গোলমালের শব্দ থেকে পৃথিবীর কি ক্ষতি হতে চলেছে। পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। যে করে হোক...' আবার হাসতে শুরু করলো সুমন।

উর্মিলা ডুকরে কেঁদে উঠলো সীতানাথ অনড় অচল। তিনি শুধু ভাবলেন 'শব্দকল্পে' এতো বিষ লুকিয়ে ছিলো?

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প

অমরনাথ রায়

আদ্যিকালের মানুষ আকাশে বিজলীর চমক দেখে অবাক হয়ে যেতো, বজ্রের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে আতঙ্কিত হতো।—মানুষের সঙ্গে বিদ্যুতের পরিচয় তখন থেকেই।

বিদ্যুৎ বা তড়িৎকে প্রত্যক্ষভাবে জানবার কোন স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় মানুষের নেই। তড়িৎ যখন তাপ সৃষ্টি করে তখন স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা সেই তাপ অনুভব করি। তড়িৎ যখন শব্দ উৎপন্ন করে তখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা সেই শব্দ শুনি। আবার তড়িৎ যখন আলো জ্বালায় তখন চোখ দিয়ে আমরা তা দেখি।—এমনিভাবে তিনটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা তড়িৎকে অনুভব করে থাকি।

কোথায় কেমনভাবে তড়িতের উৎপত্তি হয়, এর প্রকৃতিই বা কেমন—এ সব বিষয় নিয়ে আদিম মানুষের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। তড়িৎকে প্রকৃতির দান ভেবে তাকে সমীহ করে চলতো মানুষ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তড়িৎ মানুষের বিস্ময় উৎপাদন করা ভিন্ন আর কোনও ভাবে ধরা ছোঁওয়া দেয় নি।

তড়িতের কাহিনী শুরু হয়েছে প্রাচীন গ্রীস দেশে—যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় ছ'শো বছর আগে। তখনকার দিনে মিলেটাসে একজন প্রখ্যাত দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ ছিল। তাঁর নাম ছিল 'থেল্স'। থেল্স ছিলেন অদ্ভুত খেয়ালী আর কৌতূহলী মানুষ।

একদিন বিকেলবেলা নিজের পরীক্ষাগারের মেঝেতে থেল্স এক টুকরো 'অ্যাম্বার' পড়ে থাকতে দেখলেন। অ্যাম্বার হলো ফসিল বা জীবাশ্ম হয়ে যাওয়া পাইন গাছের

আঠা বা রজন। যুগ যুগ ধরে এ জিনিসটি দামী পাথর হিসাবে আদৃত হয়ে আসছে। অ্যাম্বারের বর্ণবিন্যাস আর ঔজ্জ্বল্য রমণীয়।—'ভারী সুন্দর জিনিস তো', মনে মনে ভাবলেন 'থেল্‌স'। আরও বেশি চকচকে করার উদ্দেশ্যে অ্যাম্বার খণ্ডটিকে তিনি হাতে তুলে নিলেন। তারপর সেটিকে ঘষতে লাগলেন পরনের রেশমী বস্ত্রের সঙ্গে। বার কয়েক ঘষার পর চকচকে অ্যাম্বারখণ্ডটি থেল্‌স রেখে দিলেন টেবিলের উপর।

টেবিলের উপর পড়ে ছিল খুব ছোট্ট ও হাল্‌কা একটুকরো কাঠ। অবাক বিস্ময়ে থেল্‌স লক্ষ্য করলেন যে, কাঠের টুকরোটি ছুটে এসে অ্যাম্বারের গায়ে লেগে গেলো।

ভারী মজার ব্যাপার তো!—ভাবতে লাগলেন থেল্‌স। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ে গেলো মেষপালক 'ম্যাগনেস' এর গল্প। ম্যাগনেস গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ভেড়ার পাল চরিয়ে বেড়াতো। তার হাতে থাকতো একটি লাঠি। একদিন ভেড়ার পাল চরাতে বেরিয়ে লাঠিতে ভর করে ম্যাগনেস উঠছিল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। হঠাৎ লাঠিটা পাহাড়ের পাথরের গায়ে শক্তভাবে আটকে গেলো। অনেক চেষ্টা করেও ম্যাগনেস সেটিকে তখন নড়াতে পারলো না।

তখন হাঁটু গেড়ে বসে লাঠিটি পরীক্ষা করতে গিয়ে বিস্মিত হলো ম্যাগনেস। সে দেখলো যে, লাঠির তলায় লোহার যে টুপিটা পরানো রয়েছে, সেটা বিরাট এক কালো পাথরের গায়ে দৃঢ়ভাবে এঁটে রয়েছে।

ম্যাগনেস জানতো না যে ঐ কালো পাথরটি হ'চ্ছে প্রাকৃতিক চুম্বক 'লোডস্টোন'। লোহাকে আকর্ষণ করা লোডস্টোনের ধর্ম।

মেষপালক ম্যাগনেস এর নামানুসারে প্রাকৃতিক চুম্বক লোডস্টোনের নাম হলো 'ম্যাগনেটাইট'। আর সেই শব্দটি থেকেই এসেছে চুম্বকের ইংরেজী নাম 'ম্যাগনেট'।

থেল্‌স কিন্তু ম্যাগনেটাইটের কথা জানতেন। তিনি ভাবলেন—ম্যাগনেটাইটকে না ঘষলেও তা লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে কিন্তু অ্যাম্বারকে না ঘষলে তার আকর্ষণী শক্তি জন্মায় না। তাহলে অ্যাম্বারের যে আকর্ষণী শক্তি তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, সেটা কিসের জন্য?

—না, থেল্‌স এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পেলেন না। কেটে গেলো দু' হাজার বছর।

সেকালে ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন স্যার উইলিয়ম গিলবার্ট (১৫৪০—১৬০৩ খ্রীস্টাব্দ)। চুম্বকের উপর গবেষণা করে

গবেষণালব্ধ ফলগুলি একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন তিনি। বইখানির নাম 'দ্য ম্যাগনেট'। প্রকাশকাল সম্ভবতঃ ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ।

গিলবার্ট যে সমস্ত পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কার কার আকর্ষণী শক্তি আছে (ঘর্ষিত অবস্থায়) আর কার কার নেই—তার একটি তালিকা তিনি ঐ গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তাছাড়া 'ইলেকট্রোস্কোপ' নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে তিনি পরীক্ষাধীন পদার্থগুলির আকর্ষণী শক্তি অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ করেন।

অ্যাম্বারের গ্রীক নাম 'ইলেকট্রা'।

গিলবার্ট কতকগুলি পদার্থের এই রহস্যজনক আকর্ষণী শক্তির নাম রাখেন 'ইলেকট্রিসিটি' অর্থাৎ 'তড়িৎ'। রেশমী কাপড় দিয়ে অ্যাম্বারকে ঘষলে অ্যাম্বার তড়িতাহিত হয় এবং তখন অনেক জিনিসকে আকর্ষণ করতে পারে। এই তড়িৎ বস্তুতে আবদ্ধ থাকে, চলাচল করতে পারে না। তাই এর নাম 'স্থির তড়িৎ'।

স্থির তড়িৎ আবিষ্কার তড়িৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করলো।

*　　　　　*　　　　　*

আজ থেকে শতবর্ষ আগেকার কথা।

জাপানী নৌ-বহরের প্রধান ডাক্তার তখন 'টাকাকি'। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, জাপানী নাবিকেরা যখন সমুদ্রে থাকে তখন প্রায়ই 'বেরিবেরি' রোগে আক্রান্ত হয়। আর তাদের বেশির ভাগই মারা যায়। অপরপক্ষে—আমেরিকান নাবিকেরাও সমুদ্রে থাকে। কিন্তু কৈ, তারা তো কেউ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয় না।

—ডাক্তার টাকাকি এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান চালালেন। দেখলেন, জাপানী ও আমেরিকান নাবিকদের খাদ্য তালিকা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।

জাপানী নাবিকেরা বেশি পরিমাণে কলে ছাঁটা চাল খায়। ডাক্তার টাকাকি ওদের খাদ্য—ঐ কলে ছাঁটা চালের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। তার বদলে, আমেরিকান নাবিকদের খাদ্যের অনুকরণে মাংস, বার্লি ও শাক সবজীর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন।—আশ্চর্য ভাল ফল পাওয়া গেলো তাতে। জাপানী নাবিকদের আর বেরিবেরি রোগ হলো না।

প্রায় ঐ একই সময়ে যবদ্বীপে জেলখানার চিকিৎসক ছিলেন ডাক্তার 'আইকম্যান'। তাঁর জেলের কয়েদীরা খেতো কলে ছাঁটা চাল।

ঐ জেলখানায় অনেক মুরগি পোষা হয়েছিল। সেগুলিকেও খেতে দেওয়া হতো কলে ছাঁটা চালের কুঁড়ো। ডাক্তার আইকম্যান লক্ষ্য করলেন যে, জেলের কয়েদীরা বেরিবেরি রোগে ভোগে, আর মুরগিগুলো ভোগে 'পলিনিউরাইটিস' রোগে।—এ রোগ হ'লে মুরগীরা ঘাড় বেঁকিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

এ সব দেখে ডাক্তার আইকম্যান খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন।—একদিন তিনি এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। কয়েকটা রোগগ্রস্ত মুরগিকে তিনি দিব্যি সোজা ভাবে ঘাড় উঁচু করে হাঁটতে দেখলেন। দেখে ভাবলেন—তবে কি ওদের রোগটা সেরে গেছে ?—কি ভাবে সারলো ?

খোঁজ নিয়ে ডাক্তার সাহেব জানলেন যে, ঐ মুরগিদের ঢেঁকি-ছাঁটা চাল খেতে দেওয়া হয়েছিল।—তবে কি ঢেঁকি ছাঁটা চাল খাওয়ালে বেরিবেরি রোগ সারবে ? সারবে কি মুরগিদের পলিনিউরাইটিস রোগ ?

পরীক্ষা চালালেন ডাক্তার আইকম্যান। হ্যাঁ, তাঁর অনুমানই সত্যি।

ডাক্তার আইকম্যানের তখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে—ঢেঁকি ছাঁটা চালে নিশ্চয়ই এমন এক পদার্থ আছে, যা মানুষের বেরিবেরি ও মুরগির পলিনিউরাইটিস রোগ সারাতে সক্ষম।

১৯১১ সাল।

পোল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক 'ফুস্ক' তখন লণ্ডনের লিস্টার ইনস্টিটুটে পায়রার ওপর বিভিন্ন খাদ্যের প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনিও ডাক্তার আইকম্যানের অনুমানকে সমর্থন করলেন। তিনি ঢেঁকি ছাঁটা চাল থেকে এমন একটি পদার্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন, যা মানুষের বেরিবেরি ও পাখীদের পলিনিউরাইটিস রোগের প্রতিষেধক। তিনি ঐ পদার্থটির নাম দিলেন 'ভিটামিন'।

আমিষ জাতীয় খাদ্য খেলে তা শরীরে গিয়ে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। তারপর তা রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। 'ভিটা' অর্থ হলো 'জীবন'। তার সঙ্গে যুক্ত হলো অ্যামিনো অ্যাসিডের 'অ্যামিন'। দুয়ে মিলে সৃষ্টি হলো 'ভিটামিন'। আজ অবধি অনেকগুলি ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে। যা চিকিৎসা জগতে এনেছে যুগান্তর। বহু রোগের কবল থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পেরেছে এই ভিটামিন।

আমি কি জাদুকর!

॥ এইচ জি ওয়েলস ॥ ভাষানুবাদ/চণ্ডী সেনগুপ্ত

গত কয়েকদিন ধরে ঘটে যাওয়া একরাশ অবিশ্বাস্য ব্যাপার যুক্তিহীন ঘটনার ভারে আমি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। এ ঘটনাগুলো কিভাবে বর্ণনা করব! জানি না। এগুলো কী অলৌকিক ব্যাপার। নাকি আধিভৌতিক!

আমার নাম জর্জ ফোদারিংগে। আমার অতি সাধারণ ছোটখাট চেহারা, অনুল্লেখ্য বাদামি চোখ, লাল চুল, পাকানো গোঁফ আর জড়ুল চিহ্ন-টিহ্নগুলোর কোথাও কোন অসাধারণত্বর ছাপ আছে কি। না মোটেই নেই। অফিসের গতানুগতিক কেরানীর কাজ করা ছাড়া আমি কেবল প্রবল প্রচণ্ড উদ্যমে এসে বসে তর্ক করতে পারি ব্যস্ ওইটুকুই আমার নেশা। অবিশ্যি আমার ধর্ম-টর্মের বিষয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আর নাক উঁচু ভাবকে যদি অসাধারণত্ব বলে ধরেন তো সেই সুবাদে আমার নাম এই ছোট শহরের অনেকেরই অজানা নেই।

আজ দশই নভেম্বর। বেশ কিছুক্ষণ আগে গির্জায় রবিবারের সান্ধ্য-বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। গির্জার এই সব উপদেশ টুপদেশ শোনা আমার ঠিক আসে না। গির্জাতে আসিও ন' মাসে ছ' মাসে। কিন্তু আজ এসেছি। যে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো আমাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে এমনভাবে তাড়া করে ফিরছে তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে কিংবা ঘটনাগুলোর মানে খুঁজে বার করার তাগিদেই বোধহয় আনমনা হয়ে আজ গির্জায় চলে এসেছি। কিংবা এমনও হতে পারে ওই ঘটনাগুলো ঘটাতে

গিয়ে আমি প্রকৃতির নিয়মের রাজত্বে যে অনিয়ম করে ফেলেছি তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন সূত্র খুঁজে বার করতে আমি আজ গির্জায় চলে এসেছি।…আজ বক্তৃতা করছিলেন মিঃ মেডিগ্। অলৌকিক আর আধিভৌতিক বিষয়ে ওঁর খুব উৎসাহ। এবং কী আশ্চর্য—আজ ওঁর বক্তৃতার বিষয়-বস্তু ছিল—"যা আমাদের করা উচিত না" মিঃ মেডিগের বক্তৃতার প্রতিপাদ্য আমাকে বিশ্রীভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। সত্যিই তো আমি গত কয়েকদিন ধরে যা করে চলেছি তা অবশ্যই করা উচিত হয় নি। শহরের হুঁদে পুলিস অফিসার মিঃ উইন্চ্‌কে সেদিন রাত্রে গাছের বাড়ি মেরে সরাসরি সানফ্রানসিসকোতে উড়িয়ে ফেলে দেওয়া নিশ্চয়ই কিছু আইনসঙ্গত কাজ হয় নি। তাছাড়া বেশ বুঝতে পারছি বেচারা মিঃ উইন্চ্ বার বার সানফ্রানসিসকো থেকে আবার এখানে ফেরত আসতে চেষ্টা করছেন। আর আমি বার বারই ওঁর সেই ফেরত আসার চেষ্টা ভণ্ডুল করে দিচ্ছি ওকে সানফ্রানসিসকো থেকে রওনা হতেই দিচ্ছি না। আর ভদ্রলোক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

"মিঃ মেডিগের বক্তৃতা শুনতে শুনতেই মন ঠিক করে ফেলেছিলাম—ওঁকে সব খুলে বলতে হবে। তাই এখন ওঁর সঙ্গে গির্জা ফেরত ওঁর বাড়িতে এসেছি—ওঁর পড়ার ঘরে মুখোমুখি বসেছি।…

: "মিঃ মেডিগ্ আপনি হয়তো…মানে….আপনি বোধহয় আমাকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারবেন না…মানে…" আবার খানিক ইতস্ততঃ…তারপর সরাসরি প্রশ্ন করলাম—

: "আচ্ছা মিঃ মেডিগ্ অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা"—আমি যে ধর্ম-টর্ম বড় একটা বিশ্বাস করি না মিঃ মেডিগ্ তা ভালোকরেই জানেন। জবাবে উনি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। আমি সরাসরি ওঁকে থামিয়ে দিয়ে গড় গড় করে বলে গেলাম— "আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন না যদি দেখতেন যে শ্রেফ্ ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে আমার মতো একজন সাধারণ লোক—হ্যাঁ আমিই বেশ কতকগুলো অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়েছি—ইচ্ছাশক্তি মানে আমার মনের মধ্যেকার কোন একটা শক্তির সাহায্যে কিংবা ইচ্ছায়…তবে—তবে বলুন মিঃ মেডিগ্ আপনি কী আমার কথা বিশ্বাস করবেন…"

কিন্তু কী আশ্চর্য মিঃ মেডিগ্ আমার কথার প্রতিবাদ করলেন না বরং মনে হল

খানিকটা বিশ্বাসের ভংগিই করলেন যেন। মনে বেশ একটা জোর পেয়ে গেলাম। …"মিঃ মেডিগ্ আমি…আমি বরং আপনাকে কিছু সামনাসামনি ঘটনা দেখাই তাহলে বোধহয় আপনি আরো ভালোভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন…দেখুন…দেখুন টেবিলের ওপর ওই যে অ্যাশট্রেটা রয়েছে না…ওটা তো অ্যাশট্রে…ঠিক তো—ওটা নিয়েই একটা ঘটনা দেখুন…মানে আমি জানতে চাই, যে ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে সেটা কোন অলৌকিক ঘটনা না অন্য কিছু…আপনি খালি আমায় একটুখানি সময় দিন প্লিজ…আমি ভুরু কুঁচকে একদৃষ্টে অ্যাশট্রেটার দিকে তাকালাম…বিড়্ বিড়্ করে বলতে লাগলাম…ফুল সমেত ফুলদানি হয়ে যাও…ফুলদানি হয়ে যাও। যা ভেবেছিলাম। একটুও এধার ওধার হল না, একটুও ভুল হল না। গত কয়েকদিন এসব ক্ষেত্রে যা ঘটছিল এক্ষেত্রেও তাই হল। এক লহমায় মিঃ মেডিগের টেবিলের অ্যাশট্রের বদলে একগুচ্ছ টাটকা সুগন্ধী ফুল সমেত সুদৃশ্য ফুলদানি হাজির। চিত্রার্পিতের মতো অপার বিস্ময়ে মিঃ মেডিগ্ একদৃষ্টে আমাকে আর ফুলগুলো দেখতে লাগলেন। একটুক্ষণ পরে ফুলদানির টাটকা ফুলের গন্ধ শুঁকে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন: "তুমি কী করে করলে…এটা তুমি কী করে করলে এ্যাঁ…"

: "জানি না। জানি না। শুনলেনই তো ঘটনাটাকে ঘটতে বললাম মুখের কথায়—ব্যস অমনি হয়ে গেল। মিঃ মেডিগ্ এই ব্যাপারটা মানে বোঝার জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি। কী এটা !! এ কী কোন অলৌকিক ঘটনা নাকি কোন ডাইনীর গুপ্তবিদ্যা !! আজ তো রবিবার। বিশ্বাস করুন মিঃ মেডিগ্ গত রবিবারেও এসব আমি কিছু জানতাম না, বিশ্বাস করতাম না পারতামও না—কিন্তু এখন এসব কি করে যে হচ্ছে !! কেবল ভাবছি আর ভাবনা মতো হুকুম তামিল হচ্ছে। ভাবতে পারেন !! বুঝলেন স্যার এটা প্রথম শুরু হয়েছে দিন চারেক আগে এক সন্ধ্যায়—আমাদের "লং ড্রাগন" রেস্তোরাঁতে। রোজকার মতো খুব জমিয়ে তর্ক জুড়েছিলাম মিঃ টডি বনিলের সঙ্গে। জানেনই তো তর্কে আমার অরুচি নেই—তা সে যে কোন বিষয়েই হোক না কেন। মিঃ টডি অলৌকিক ঘটনার পক্ষে খুব লম্ফঝম্প জুড়েছিলেন। তো আমি বলছিলাম ওসব আধিভৌতিক, দৈব ঘটনা ফট্না একেবারে ফালতু ব্যাপার—তবে হ্যাঁ হতে পারে, অসম্ভব ঘটনা ঘটানো যায় কেবল মাত্র মনের জোরে—মানে প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে।

আমাদের টেবিলে আমরা দুজন ছাড়া অন্য দুজন বন্ধুও ছিলেন—বসে বসে তর্ক শুনছিলেন। আর রেস্তোরাঁর পরিচারিকা আমার দিকে পিছু ফিরে বেসিনে কাপ ডিশ ধুচ্ছিল। এই সময়ে…স্পষ্ট মনে আছে ঠিক ওই সময়ে আমি গলা চড়িয়ে তর্ক জেতার চেষ্টায় বললাম…: দেখুন সবাই টেবিলের ওপর ওই যে বাতিটা জ্বলছে প্রকৃতির নিয়ম ভেঙে ওকে কেউ উল্টোভাবে—অর্থাৎ ওর ওপর দিকটা নিচে আর নিচটা ওপরে—জ্বালিয়ে রাখতে পারে…বলুন বলুন আপনারা একি সম্ভব! কেউ কি এমনধারা ঘটনা ঘটাতে পারে !!

: "কখনো নয়…মিঃ টেডি হেঁকে উঠলেন—

"আমি বললাম: পারে না তো! বহুত আচ্ছা…তবে আমাকে দেখুন এই আমি বলছি (কেন বললাম,—কি জন্যে বললাম—কে জানে?) আমাকে আপনারা ভালোভাবে দেখুন ··শুনুন আমি বাতিটাকে বলছি…ওহে তুমি ডিগবাজি খেয়ে উলটে গিয়ে জ্বলতে লাগো তো…এবং…এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনে অলৌকিক ঘটনা ঘটার শুরু হয়ে গেল। বাতিটা সোজা একটু ওপরে উঠে গিয়ে পুরোপুরি ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গেল এবং জ্বলতেই লাগল সকলের চোখের সামনে। রেস্তোরাঁতে হিমশীতল নীরবতা—এরকম অবিশ্বাস্য অভাবনীয় ব্যাপার কেউ কী কখনও দেখেছে !! বিহ্বলতার প্রথম চটকা ভেঙে কয়েক মুহূর্ত পরেই সবাই লাফিয়ে উঠল। হঠাৎ আমার মনে হল আমি আর বাতিটাকে ঝুলিয়ে রাখতে পারছি না —পারব না আমার ভুরু কুঁচকে উঠল…আমার পক্ষে বাতিটাকে আর ওই ভাবে ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না…পেতলের পিলসুজের বাতিটা হঠাৎ মাটিতে ঝন্ ঝন্ করে পড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত। রেস্তোরাঁ আবার যেন প্রাণ পেয়ে হৈ হৈ করে উঠল। যে যার ইচ্ছে মতো কথা বলে যাচ্ছে। কিছু ভয়, কিছু অবিশ্বাস, কিছু বিস্ময় মেশানো সে যা কথা। অবশেষে সবাই একমত হল, একবাক্যে রায় দিল—আমি বুজরুক—কি একটা ভেল্‌কি দেখিয়ে সবাইকে ধাপ্পা দিয়েছি—অলৌকিক ঘটনা না কচু! ডাইনী বিদ্যা—ডাইনী বিদ্যা !! আমার কিছু বলার ছিল না। আসলে আমি বুঝতেই পারছিলাম না কী করে ব্যাপারটা ঘটে গেছে। আমার স্নায়ুগুলো যেন দুমড়ে মুচড়ে কেউ শিহরিত করে দিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে আমার সম্বিৎ ফিরে আসছিল। রোমাঞ্চিত শরীরে একমুখ জিজ্ঞাসা নিয়ে পায়ে

পায়ে বাড়ি ফিরলাম। চার্চের আমার ছোট্ট ঘরটাতে কোনমতে যখন পৌঁছোলাম তখন অনেক রাত। মনের মধ্যে সেই একই প্রশ্ন—কী করে হল! কী করে ঘটল ব্যাপারটা!!...আর যদি ঘটনাটা ঘটলই তবে বাতিটা হঠাৎ পড়েই বা গেল কেন!! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনের মধ্যেই যেন একটা সমাধান খুঁজে পেলাম। মনে হল ঘটনাটা ঘটেছে আমারই ইচ্ছাশক্তির জোরে,—আমার ইচ্ছাশক্তির বাহন হয়ে আমার মুখের আদেশ বাতিটাকে বাধ্য করেছিল ডিগবাজি খেতে। বাতিটার সাধ্য কী সে হুকুম অমান্য করে। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে ইচ্ছাশক্তির যেই একটু ঘাটতি হল অমনি বাতিটা আমার ইচ্ছাশক্তির আওতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় পড়ে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আঃ নিজে নিজে ব্যাপারটার একটা উত্তর খাড়া করে ভারি আরাম লাগল। কিছু একটা সমাধান তো পাওয়া গেল কিন্তু সেই সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবে শুরু হল আমার ব্যাপারটাকে আবার ঘটানোর চেষ্টা। কেবল মাত্র মুখের কথার হুকুম দিয়ে আমার ঘরে সে রাত্রে একটা মোমবাতিকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিতে আমার একটুও কষ্ট হল না ওই মোমবাতিটা জ্বালাবার জন্যে একটা দেশলাই খুঁজছিলাম। কিছুতেই পাচ্ছিলাম না। অন্ধকারে জিনিস খুঁজে পাওয়া এত বিরক্তিকর। হঠাৎ মনে হল ধুৎ এতো কষ্ট করছি কেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা দেশলাই চলে আসার হুকুম দিলাম কড়া মনে, কড়া গলায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারের মধ্যে আমার হাতের তালুতে একটা দেশলাই হাজির। আস্তে আস্তে নিজের উপর খুব বিশ্বাস বেড়ে উঠল। আচ্ছা তাহলে আমি যা ভাবব আমার মুখ দিয়ে যে কথা বেরুবে সেগুলো অক্লেশে ঘটে যাবে তৎক্ষণাৎ। ব্যাপারটা বার বার পরীক্ষা করে যাচাই করে নিতে লাগলাম। একে একে গ্লাসের জলের রং প্রথমে গোলাপী এবং তারপর সবুজ করেছিলাম। একটা শামুককে টুথব্রাশে পরিণত করতে একটুও কষ্ট হল না। এইসব করতে করতে ভাবতে ভাবতে গভীর রাত হয়ে গেল। তারপর দিন আবার অফিস রয়েছে। তখনও আমার বাইরের জামা কাপড় ছাড়া হয়নি। ভাবলাম কে আবার পরিশ্রম করে জামা জুতো খুলবে। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলাম! আর এক লহমায় আমার জামা জুতো খুলে গেল আমি নিজেকে বিছানায় একটা নতুন টলের নাইট গাউন পরে শুয়ে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। ভাবুন মিঃ

মেডিগ্‌ কেবল মাত্র আমার আদেশেই সমস্ত ব্যাপারগুলো ঘটে গেল আমি নিজের হাতে এর একটা কাজও কিন্তু করিনি। পরের দিন সকাল থেকে আমি আমার ইচ্ছাশক্তি বা হুকুমের কাজগুলো খুব ভেবেচিন্তে করতে লাগলাম। খুব সতর্কতার সঙ্গে খুব কাছাকাছি করে আমার সন্ত পাওয়া ক্ষমতা কাজে লাগাতে শুরু করলাম। সত্যি কথা বলতে কি সারাদিন তেমন কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটানো হয় নি। কাল সকালবেলা আমার ব্রেকফাস্টের টেবিলে একটা অতি সুস্বাদু ডিম আমদানি করে খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। ল্যাণ্ডলেডি রোজকার মতো আমাকে দুটো ডিম দিয়েছিলেন। অফিসে নানা কাজের ভিড়ে একটু ফাঁক পেয়ে দুটো বেশ দামি আর ভারি হীরে তৈরি করেছিলাম কিন্তু ঠিক সেই সময়েই দেখি 'বস' আমার টেবিলের দিকে গুটি গুটি আসছেন। কাজ কী বাবা আবার বখেড়ায়—যদি দেখে ফেলে—তখন তো আবার সাত সতেরো জবাবদিহি করতে হবে। পত্রপাঠ হীরে দুটোকে দিলাম ভ্যানিশ করে। সারাদিন এই ভাবেই গেল। অফিস ফেরত রোজকার মতো ওই লং ড্রাগন রেস্তোরাঁতে যেতে ইচ্ছে করল না। কাল রাতে যা কাণ্ড ওখানে হল। ওখানেও নির্ঘাৎ গাদা গাদা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। রাতের খাওয়ার পর তাই আমার বাড়ির নির্জন রাস্তাটায় পায়চারি করতে করতে দু' একটা হুকুম দিয়ে আমার সন্ত লব্ধ ক্ষমতাটা ঝালাই করে নিচ্ছিলাম। এবং তখুনি সেই সাংঘাতিক কাণ্ডটা ঘটে গেল। প্রথমে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ সুন্দর ভাবেই শুরু করেছিলাম। আমার হাতের ছড়িটাকে একটা বেঁটে গোলাপ গাছ বানিয়ে নিলাম। গোটা গোলাপের সুগন্ধে চারিদিক ম্‌ ম্‌। হঠাৎ পায়ের শব্দ। চমকে হুকুম দিলাম: চলে যাও—"আর তাতেই মারাত্মক ভুল হয়ে গেল। আমার বলা উচিত ছিল পুনর্মূষিকো ভব—অর্থাৎ লাঠি গোলাপ গাছ থেকে আবার লাঠি হও। কিন্তু যেই না বলেছি চলে যাও ব্যস ডালপালা শুদ্ধু গাছ তো সটাং উপড়ে সবেগে চলে গেল। তার পর মুহূর্তেই মানুষের গলার আর্তনাদ—অর্থাৎ উড়ন্ত গাছের সঙ্গে কোন পথচারীর ধাক্কা। আরে ব্বাস—পথচারীকে দেখে তো আমি ট্যারা…পুলিস অফিসার উইনচ্‌। উইনচ্‌ তো আমাকে এই মারে তো সেই মারে। গতরাত্রে রেস্তোরাঁতে আমার বাতি ওল্টানোর খেল্‌ দেখলাম ইতিমধ্যেই ও জেনে ফেলেছে;—পুলিসের লোক তো সব খবর রাখতে হয়। কিন্তু উইনচ্‌-কে আমি কিছুতেই ঠাণ্ডা

করতে পারলাম না। শেষকালে ওকে সবিনয়ে যেই বলেছি যে ব্যাপারটা একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটানো হয়েছে—ব্যস্ আর যায় কোথায় উইনচ্ একেবারে তেড়ে এলো—হাতকড়ি লাগিয়ে পাকড়ে নিয়ে যায় আরকি। তক্ষুনি বুঝতে পারলাম কাঁচা কাজ হয়ে গেছে—অলৌকিক ঘটনা পুলিস বিশ্বাস করে কখনও। কিন্তু উপায়। উপায় একটাই ছিল—এবং সেটা খুব তাড়াতাড়িই করতে হল। ছোট একটা হুকুমে মিঃ উইনচ্‌কে সরাসরি সানফ্রানসিসকোতে চালান করে দিলাম। এটা মিঃ মেডিগ্ একটা প্রচণ্ড অন্যায় হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না। আপনি আমাকে সাহায্য করুন…আমি এ সমস্ত ইচ্ছা শক্তি—কিংবা অলৌকিক ঘটনার মালিক হয়ে থাকতে পারছি না মিঃ মেডিগ্…” আমি থামলাম।

এতকথা শোনার পরেও মি মেডিগ্ ব্যাপারটা বোধহয় আর একটু যাচিয়ে নিতে চাইলেন। ওঁর ইচ্ছামতো তাই ওঁকে পরপর কয়েকটা আমার ইচ্ছাশক্তির খেলা দেখালাম। প্রথমে ওই ফুলদানি থেকে এক জার লালমাছ তৈরি হল—লালমাছ থেকে একটা বড়সড় পায়রা—আবার পায়রা থেকে ফুলদানি এবং শেষমেষ আবার সেই অ্যাশট্রে। মি. মেডিগ্ সারাক্ষণ পাথরের মতো সোজা বসে আমার কীর্তিকলাপ দেখলেন। তারপর লাফিয়ে উঠলেন উল্লাসে না বিস্ময়ে উনি তা ঠিক প্রকাশ করতে পারছিলেন না। আমি এই দুর্লভ শক্তির অধিকারী কি করে হলাম তার স্পষ্ট জবাব ওঁরও জানা ছিল না। খালি পর পর বলতে লাগলেন…অপূর্ব…অভাবনীয়…অভূত-পূর্ব…প্রচণ্ড শক্তি…বুঝলে…তুমি প্রচণ্ড শক্তিধর…ইত্যাদি ইত্যাদি। যত সময় কাটছিল মিঃ মেডিগ্ আমার এই শক্তি নিয়ে তত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলেন। অবশেষে উনি মনস্থির করে ফেললেন আমার এই শক্তিকে ছেলেখেলায় মজা করে ব্যবহার করার চাইতে ওই শক্তির সাহায্যে সত্যিকারের কিছু ভালো কাজ করতে হবে। মানুষের ভালো, দেশের ভালো, পরিবেশের ভালো। মিঃ মেডিগের পক্ষে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সাত্ত্বিক মানুষ, ধর্ম কর্ম করেন দেশের দশের দুঃখ দুর্দশা দূর করার চেষ্টাতেই তো তিনি সমর্পিত প্রাণ। বেশ ভালো করে উনি আমাকে ব্যাপারটা বোঝালেন। আমারও ভালোই লাগল। সত্যিই তো সকলের উপকার করার মত মহৎ কাজ এ পৃথিবীতে আছে নাকি। আর তা কজনই বা করছে—করতে পারছে। উৎসাহে ভাঁটা না পড়তে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দেওয়া হল। এই সব হতে করতে রাত গড়িয়েছে।

মিঃ মেডিগের সঙ্গে রাতের খাওয়াটা সেরে নিচ্ছিলাম। জঘন্য খাবার। মিঃ মেডিগের ল্যাণ্ডলেডি ভদ্রমহিলা মোটেই সুবিধের লোক নন। শুনলাম তাঁর কদর্য ব্যবহারের মতো এ ধরনের কদর্য খাবার দাবারই তিনি প্রায়শ পরিবেশন করে থাকেন। অবিশ্যি খারাপ খাবার আমার কাছে কোন সমস্যাই নয়। চটপট হুকুম দিয়ে সুস্বাদু কিছু খাবার আনিয়ে নিলাম। খেতে খেতে হঠাৎ মনে হল মিঃ মেডিগের ওই ল্যাণ্ডলেডি ভদ্রমহিলা···কি যেন নাম হ্যাঁ মিসেস্ মিনচিন্—তো মিসেস মিনচিন্ কে সত্যিকারের ভদ্র মহিলা সাজিয়ে দিলে কেমন হয়। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। আমার হুকুমের ফরমান জারি করে দেওয়া গেল। মিসেস মিন্চিন্ ওপরে তার ঘরে ঘুমোচ্ছেন। অদ্ভুত···আশ্চর্য ব্যাপার। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওপরের ঘরে দুপ্-দাপ্ পায়ের শব্দ···অস্ফুট চাপা গলায় কান্নার আওয়াজ। মিঃ মেডিগ্ কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিলেন না····সুট্সুট্ করে ওপরে উঠে গেলেন আর একটু পরেই প্রায় নাচতে নাচতে ফিরলেন। আনন্দে তিনি প্রায় আত্মহারা। হয়েছে হয়েছে। ল্যাণ্ডলেডি একেবারে মাটির মানুষ হয়ে গিয়েছেন। দরজার বাইরে থেকে মিঃ মেডিগ্ নিজের কানে শুনে এসেছেন মিসেস মিন্চিন্ তাঁর অশিষ্ট স্বভাব, যাবতীয় দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতাপে অনুশোচনায় ভেঙে পড়েছেন। সত্যি কথা বলতে কী মিসেস মিনচিনের ব্যাপারটাতে ইচ্ছাশক্তির হুকুম দেওয়ার পরে আমারও একটু কিন্তু কিন্তু ভাব ছিল। আমার শক্তির জোরে কি একটা জ্যান্ত মানুষের মনের খোল নল্চে, চিন্তা ভাবনা আমূল উল্টে পালটে দেওয়া সম্ভব। আঃ তাহলে এখানেও আমার ইচ্ছাশক্তির জয় হল। তৃপ্তির একটা ভারি নিশ্বাস সারা ঘরটাকে যেন ভরে দিল। তাহলে আর দেরি করে কী লাভ। ইতিমধ্যে রাত বেড়ে গেছে। মাথার ওপর চাঁদ যেন সাক্ষীর মতো আমাদের দেখছে। আমরা দুজনে পথে বেরিয়ে পড়লাম। মিঃ মেডিগ্ উৎসাহে টাট্টু ঘোড়ার মত ছট্ফট্ করছেন আমার বুকের মধ্যেও আনন্দ আর উত্তেজনার স্পন্দন। প্রথমেই শহরের মদ্যপায়ীদের মদের নেশা থেকে মুক্ত করা হল। শহরের যত মদ হাটে বাজারে বাড়িতে ছিল সে সব সমস্ত পানীয় জলে রূপান্তরিত করে দিলাম। এ ছাড়া বহু রেলপথ, ক্ষেত, ভাঙা রাস্তা ঘাট উন্নতি আর সারাইয়ের কাজ তো হলই। চারিদিক ঘুমে নিঝুম। মাথার ওপর চাঁদ। চাঁদের আলোয় পথ ঘাট স্বপ্নালু। কেমন যেন নেশার ঘোরে কাজ করে যাচ্ছিলাম। রাত তিনটে।

সর্বনাশ। কাল তো আমার অফিস রয়েছে। কিন্তু মিঃ মেডিগ্ তখন একদম কাজের নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন। উনি কিছুতেই থামতে রাজি নন। আরো কত ভালো কাজ করা বাকি রয়েছে। হঠাৎ আমার হাত আঁকড়ে ধরে বলে উঠলেন তোমার দেরি হয়ে যাবে দেরি !···না কিছুতেই না···তুমি (হাত দিয়ে চাঁদ দেখিয়ে) তুমি ওটাকে এক জায়গায় স্থির করে দাও থামিয়ে রাখো।"

ঃ মিঃ মেডিগ্···চাঁদ···চাঁদ · চাঁদ কে কি থামিয়ে রাখতে পারব !

ঃ কেন পারবে না···নিশ্চয়ই পারবে। আসল চাঁদ নয় তুমি আমাদের এই পৃথিবীটা চলার গতি স্তব্ধ করে দাও। আর তাহলেই সময় যাবে থেমে। পারবে না! পারবে না! নিশ্চয়ই পারবে সময় আর গড়াবে না। আর আমরাও সেই ফাঁকে এইরকম আরো অনেক ভালো ভালো সৎ আর পবিত্র কাজ করে নেব। ভেবে দেখ আমরা কি কিছু খারাপ কাজ করছি !!!

কথাটা মনে লাগল। পারব কী! পৃথিবীর শাশ্বত চলার গতি থামিয়ে সময়কে বন্দী করে রাখতে পারব কী! মনে মনে ইচ্ছাশক্তির তুংগে উঠে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পৃথিবীকে হুকুম দিলাম পৃথিবীকে তার নিয়মের চলার গতি থামিয়ে স্তব্ধ হতে বললাম। এক লহমায় কী যেন হল, কী যেন ঘটে গেল। প্রবল প্রচণ্ড বিধ্বংসী বেগে আকাশের আঙিনা থেকে আচম্বিতে হা হা শব্দে আর্তনাদ করতে করতে ধেয়ে এলো বাতাস। যতদূর চোখ যায় কেবল ধুলো ধুলো আর ধুলো। পাগল বাতাস আর ধুলোয় মিতালী করে গড়ে তুলল ঘূর্ণি ঘূর্ণি আর ঘূর্ণি। চারিদিকে কি এক বীভৎস কম্পন, দিগবলয়ে কি এক অশ্রুতপূর্ব গর্জন। বাতাসের দমকায় ঘুরতে ঘুরতে আমার শরীরটা সরাসরি ওপরে উঠে গেল—উপরে আরো উপরে। প্রবল চেষ্টা করে, আমার ভেতরের শক্তির শেষটুকু নিংড়ে, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলাম ঃ···আমি নিচে নামব···মাটিতে নামব—অক্ষত শরীরে মাটিতে নামব"। পরমুহূর্তেই পায়ের নিচে মাটির স্পর্শ পেলাম। কিন্তু এ কোথায় আমি এলাম। এ কোথায়। এ কোথায়। চারিদিকে রাশি রাশি ধ্বংসস্তূপ। ইঁট কাঠ বাড়ি বালির পাহাড়। ধ্বংস। ধ্বংস। ধ্বংস। শহরের সব কিছু ভেঙে চুরে তছনছ করে দিয়ে গেছে যেন মত্তহস্তীর দল। এপাশে ওপাশে—চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি উঃ কী নারকীয়—কী বিভৎস এ দৃশ্য। ভাবতে পারছি না কি ঘটে গেছে এখনও কি ঘটছে আমার

চারিপাশে। চারিদিকে ধুলোর ঝড়ে থরথর করে কাঁপছে। মাথার উপর অবিরাম বিদ্যুৎ আর প্রলয়ংকরী বিকট স্বরে মেঘের দামামা বাজছে বাজছে আর বাজছে।

: ঈশ্বর।—চিৎকার করে উঠলাম…"মিঃ মেডিগ্…মিঃ মেডিগ্…আপনি কোথায় মিঃ মেডিগ্"। মিঃ মেডিগ্ নেই আমাদের শহর নেই বাড়ি গাছপালা কেউ নেই—কিচ্ছু নেই। কেবল দেখতে পাচ্ছি মাথার উপর স্থাণুর মতো এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদ। কিন্তু কি করে এসব হচ্ছে। আমিতো এসব চাই নি। যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম কী হলো—কেন হল। বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ল আমি পৃথিবীকে থামতে বলেছিলাম—যে পৃথিবীর গতি বিষুবরেখায় ছিল প্রায় ঘণ্টায় হাজার মাইল। প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন সেই পৃথিবীর আচমকা থেমে যাওয়ার ধাক্কায় পৃথিবীর বুকের সব কিছু হঠাৎ গেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।……ঘটে গেছে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনা। মরণ তাণ্ডব।·· কিন্তু এসব তো আমি আগে ভাবিনি, হিসেব করেও দেখিনি। আমার হুকুম, আমার ইচ্ছাশক্তিই তাহলে এই ধ্বংস পৃথিবীর বুকে ডেকে নিয়ে এলো! উঃ বাতাস কী প্রচণ্ড চিৎকার করছে—কি ধুলো…। হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলাম বিশাল উঁচু জলের স্রোত আমার দিক ধেয়ে আসছে।

: মিঃ মেডিগ্…মেডিগ্…আমি এখানে মিঃ মেডিগ্।…চিৎকার করে উঠলাম: —থামো থামো…বিপর্যস্ত ছিন্নভিন্ন ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল চেষ্টায় জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে করতে শেষ বারের মতো হুকুম দিলাম….

: "থামো। সব ঝঞ্ঝা, বজ্র সব কিছু থেমে যাক। বন্ধ হক এই সব অলৌকিক মরণ তাণ্ডব। আমি কিছু চাই না—কিচ্ছু চাই না—আমার ইচ্ছাশক্তির কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে নাও, ফিরিয়ে নাও। আমাকে ফিরিয়ে দাও সেই দিনটিতে, সেই মুহূর্তটিতে, যখন আমার মধ্যে ইচ্ছাশক্তির এই ক্ষমতা আসে নি…আমি আমি আর কোন দিনও যেন এই ক্ষমতা ফিরে না পাই…এই ক্ষমতা ফিরে না পাই।"…পৃথিবী আবার হেসে উঠল বেঁচে উঠল। চারিদিকে মাটির গন্ধ, ঘাসের গন্ধ মানুষের গন্ধ। ভালো করে ঠাহর করে দেখি আমরা কজন বসে আছি। সেই 'লং ড্রাগন' রেস্তোরাঁর সেই চেনা টেবিলে। ঠিক যেন সেদিনের সন্ধ্যা আমার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক্ষমতা লাভের সন্ধ্যা। ঠিক সেদিনের মতো আবার আমরা তর্ক করছি অলৌকিক ঘটনা, আধিভৌতিক ঘটনা নিয়ে। আমি আর মিঃ মেডিগ্।

কলম্বাসের বাবা

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

ভবানীপুর স্পোর্টিং-এর সঙ্গে আমাদের ক্লাবের খেলা, কাল বিকেল তিনটেয়—খবরটা গৌতম আগেই দিয়েছিল। তারপর আধ ঘণ্টাও হয়নি—জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম সাইকেল থেকে কেষ্টাকে নামাতে। উর্ধ্বশ্বাসে পড়ার টেবিলে ছেড়ে দৌড়েছি। খুব সময়ে পৌঁছে গেছি যা হোক। দেখি বাঁটুটা গোড়ালি উঁচু করে ঘন্টি টেপার চেষ্টা করছে, হাত পৌঁছচ্ছে না।

'বাজাস না।' আমি গম্ভীর গলায় বললাম। 'সকাল থেকে আমার বন্ধুদের ভাগাতে ভাগাতে মা টায়ার্ড। আবার এখনি ঘন্টি বাজলে মহা কেলেঙ্কারি হত।'

'শোন তোকে ভয়ঙ্কর দরকার।' কেষ্টা বলল।

'জানি। খেলা তো? গৌতম বলে গেছে।'

'তুই আসবি। তোকে খেলতে হবে। পরীক্ষা ফরীক্ষা দেখাস না।'

'পরীক্ষা-ফরীক্ষা মানে? ইয়ার্কি পেয়েছিস? পরীক্ষা দিতে হবে না?'

'দিতে তো হবেই। পরীক্ষা সব সময়েই দিতে হবে। তবে কাল দুপুরে তুই খেলতে আসছিস। আমাদের ম্যান কম পড়েছে।'

'আমাকে বাদ দে।' কেষ্টার মত আকাট মুখ্যুকে কিছু বোঝানো সম্ভব নয়। মাসের মধ্যে অন্তত পনেরো দিন যে ক্লাস কেটে সিনেমা দেখতে চলে যায়, সে কী করে বুঝবে পরীক্ষার মর্ম! মাধ্যমিকে পাশ-ফেলের ওপর সমস্ত ভবিষ্যৎ, চাকরি পাওয়া, ও তার কতটুকু জানে! আমিও অবশ্য খুব বেশি জানতাম না, তবে যেদিন থেকে বাবা বলেছেন চাকরি না পেলে না খেয়ে থাকতে হবে, সেদিন থেকে ব্যাপারটা বুঝতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু ম্যান কম পড়েছে শুনে থমকে যেতে হল। "কে খেলছে না?"

"পিকু গেছে মামার বাড়ি। দেবাশিসের জ্বর। শান্তনু বিশেষ কাজে ব্যস্ত।"

শান্তনুর বিশেষ কাজ কী, তা আমার ভালভাবেই জানা আছে। ও-রকম বিশেষ কাজে ও চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যস্ত। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, শান্তনুকে আমি রাজি করিয়ে দেব। তাহলে হচ্ছে তো এগারো জন?'

*   *   *   *

দরজায় সাঙ্কেতিক টোকা মারতেই শান্তনু জানিয়ে দিল কেটে পড়তে। ওর নাকি কথা বলার সময় নেই। এখন কারো সঙ্গে দেখা করা তো দূরের কথা। আমিও কি ছাড়বার পাত্র! অনেক ধাক্কাধাক্কির পর যখন পুরো গ্যাং নিয়ে আসার ভয় দেখালাম তখন ও এই এতটুকু ফাঁক করল। সেই সুযোগে দিয়েছি কাঁধটা ঢুকিয়ে। ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি, ধস্তাধস্তি—শেষ পর্যন্ত আমার জিত। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে হাত-পাগুলো সেট করে নিচ্ছি—এই ফাঁকে শান্তনু আর একটা ল্যাং মারার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হবি তো হ', নিজেই টেবিল ল্যাম্পের লম্বা তারে পা জড়িয়ে সমস্ত এনার্জি সমেত মাটিতে পড়েছে ধাঁই করে। তখন আমাকেই এগিয়ে গিয়ে উদ্ধার করতে হল ওকে।

শান্তনু ইলেকট্রিক আলো নিয়ে সর্বদাই নানারকম পরীক্ষা করছে। ওর ঘরে নানা-রকম কায়দার আর পাওয়ারের আলোর ছড়াছড়ি। মেঝেয় এত রকম তার এদিক থেকে ওদিক গেছে যে পাপোস চাপা থাকা সত্ত্বেও হোঁচট না খেয়ে চলা শক্ত। কখন কোথায় কি সুইচ লাগাচ্ছে, কোন তার জুড়ছে। ঘরটার একটা বিতিকিচ্ছিরি চেহারা। আজ নির্ঘাত কোন নতুন রকম আলো লাগাবার চেষ্টা চলছে, তাই এত সাবধানতা। গত সপ্তাহে স্বপ্ন দেখার আলো বানাতে গিয়ে ফিউজ উড়িয়েছিল। তখন বাইরের ঘরে মেশোমশায়ের অফিসের কয়েকজন জরুরী কথাবার্তা বলতে এসেছিলেন। তারপর থেকে ওর ইলেকট্রিকাল এক্সপেরিমেন্টে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়ে গেছে।

আমি উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'কী বানালি দেখা।'

'আরে দাঁড়া দাঁড়া। দেখানো কি অত সহজে যায়?'

'পুরোটা হয়নি বুঝি?'

'একটা বিরাট আবিষ্কারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। ঢুকতে হবে।'

'আবিষ্কার। হাসালি। তাও আবার তুই করেছিস! কেন ইলেকট্রিসিটি কি এর আগে কেউ আবিষ্কার করেনি নাকি?'

'ছ্যাখ বুবলু, তুই এক একসময় কিরকম বোকা মেরে যাস। বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানেই বুঝি ইলেকট্রিসিটি আর টেলিফোন? ওসব তো পরীক্ষার খাতায় 'এসে' লেখার জন্যে—বিজ্ঞান কি আশীর্বাদ না অভিশাপ আমার আবিষ্কারটা নতুন না হলে—'

'নতুন না হলে আর আবিষ্কার কি?'

'বুঝবি, বুঝবি—ক্রমে ক্রমে বুঝবি সব আবিষ্কারই নতুন হয় না।'

নাঃ, এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। একেবারে ইমপসিবল। আর কোন প্রশ্ন না করে খাটের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসলাম। একটু পরেই মনে পড়ে গেল জুতোটা খোলা হয়নি—কিন্তু শান্তনুর মনপ্রাণ তখন আবিষ্কারের উত্তেজনায় টগবগ করছে। ওসব দিকে নজর দেবার তার সময় কোথায়? তাছাড়া ওর নিজেরই, চান করে বেরিয়ে আসার পর গোড়ালিতে কাদা লেগে থাকে, আমি দেখেছি।

বসে বসে দেখতে লাগলাম ওর কাণ্ডকারখানা। ওর পড়ার টেবিলের পিছনের দেওয়ালে একটা বোর্ডের মত জিনিস আছে—সেটা আসলে ঘষা কাঁচের পিছনে সবুজ পেণ্ট করা। তার এদিক থেকে ওদিক অনেকগুলো লাট্টু টাইপের ছবি আঁকা হয়েছে। চেহারাগুলো দেখে যেন চিনি চিনি মনে হয়, কিন্তু ভাল করে মনে আসে না। টেবিলের ওপর গোটা দশেক বই খোলা অবস্থায়, চেয়ারে কিসের যেন মডেল, শান্তনু নিজে মাটিতে উপুড় হয়ে অঙ্ক কষছে।

দরজায় টোকা পড়ল। শান্তনুর হুংকার—'আবার এসেছ বিরক্ত করতে!'

'চা, দাদাবাবু।' খুদিরামের সঙ্গে খাবারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বলে ওকে আমি বরাবরই পছন্দ করি। শান্তনুর হুংকার শুনে খুদিরাম মোটেই দমল না।

'চা জলখাবারটা খেয়ে নিন দাদাবাবু, তারপর লেখাপড়া করবেন।'

'ছ্যাখো খুদিরাম বেশি ফ্যাচ ফ্যাচ করেছ তো দেব ঐ গরম চা মাথায় ঢেলে—'

আমি ততক্ষণে এক লাফে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছি। খুদিরামের হাত থেকে খাবারের ট্রেটা তুলে নিয়ে বললাম, 'কিচ্ছু চিন্তা নেই খুদিরাম। দাদাবাবু না খায়, আমি তো আছি।'

খুদিরাম আমাকে দেখে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে আমার হাতে ট্রে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিল। সম্ভবত আরো কিছু কচুরি আর আলুর দম সাপ্লাই করার উদ্দেশ্যে।

আমি চটপট গোটা তিনেক আলু একটা কচুরিতে মুড়ে মুখের মধ্যে চালান করে দিয়ে ভরাট গলায় বললাম, 'এবার বুঝিয়ে বল।'

শান্তনুর দৃষ্টি তখন কচুরি ছাড়িয়ে আলুর দম পার হয়ে আরো সুদূরে প্রসারিত। সে কোন উত্তর দিল না।

'ঐগুলো কিসের নকশা এঁকেছিস?' সেকেণ্ড কচুরিটা কবজা করতে করতে আমি আবার জিজ্ঞেস করি।

'পরমাণু কাকে বলে খবর রাখিস?'

ও হরি। এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হল। ওগুলো নানা জাতের পরমাণুর নিউক্লিয়াস আর তাদের চারপাশে ছুটন্ত ইলেকট্রনদের ছবি। মেশোমশাই, মানে শান্তনুর বাবা একজন পরমাণু বিজ্ঞানী। যেদিন থেকে উনি শান্তনুকে ওঁদের প্রোজেক্টের বিশাল ম্যাগনেট দেখিয়ে এনেছেন, তার পর থেকেই পরমাণুর ভূত শান্তনুর মাথায় ভর করেছে। মেশোমশাইদের মেশিনে নাকি পরমাণুর গুঁড়ো প্রচণ্ড জোরে ঘোরানো হবে। এমন জোরে যে, তার থেকে ছিটকে ছিটকে প্রোটন, নিউট্রন সব বেরিয়ে আসবে আর মোটা দেওয়ালের আড়াল থেকে সুইচ টিপে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করা হবে। শান্তনু সর্বদাই আমাদের এই বিষয়ে এতরকম জ্ঞান দেবার চেষ্টা করে যে, মনে হয় স্কুল ফাইনাল দেবার আগেই ও পি এইচ ডি থিসিসটা রেডি করে ফেলেছে। তবে ও যে ঐ বোর্ডে ছবিগুলো এঁকেছে নানারকম পরমাণু, কোনটার নিউক্লিয়াস ঘিরে একটা ইলেকট্রন ঘুরছে, কোনটার ষোলটা, কোনটার সাতানব্বই, সে তো ঐ ইলেকট্রন কক্ষপথ গুণেই বলা যাবে কোনটা হিলিয়াম, কোনটা হাইড্রোজেন, কোনটা সোডিয়াম। এর মধ্যে আর নতুন কী আছে! এ সব তো যে কোন ক্লাস টেনের ছেলের জানা।

শান্তনু কি তাহলে নতুন কোন আইসোটোপ বার করার ফন্দি আটছে?

আইসোটোপ কাকে বলে আমরাও একটু আধটু বুঝি। রেডিওএকটিভ্ আইসোটোপ অনেক কাজে লাগে।

শান্তনু খুব গম্ভীর মুখ করে খাতা থেকে চোখ তুলল। তারপর পেনসিল দিয়ে মাথার খুলিটা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'ছ্যাখ বুবলু, সমস্ত আবিষ্কারই আসলে খুব সহজ। মাধ্যাকর্ষণ যেমন। গাছ থেকে আপেল নীচে পড়বে—এ তো সহজ কথা। সহজ বলেই তো শক্ত রে। তোর কি কোনদিন মাথায় আসত যে পৃথিবী আপেলকে টানছে? তোর মাথায় তো আসতই না। তবে আমার কথা আলাদা। কলম্বাসের ব্যাপারটা দেখ। আমেরিকা আবিষ্কার—ফাটাফাটি কাণ্ড। কলম্বাসের খাতির দেখে দেশের সবাই জ্বলে পুড়ে মরছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কলম্বাস ভাবলেন, এদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। উনি একটা সেদ্ধ ডিম নিয়ে বললেন—'

'কথা নেই বার্তা নেই সেদ্ধ ডিম আবার কোথা থেকে এল?'

'আকাশ থেকে পড়ল। ওঁরা তখন খেতে বসেছেন রে গাধা। বিরাট ভোজসভা, অনেক মান্যগণ্য লোক। কলম্বাস তাঁদের একটি সেদ্ধ ডিম দেখিয়ে বললেন, 'এটা আপনারা কেউ দাঁড় করান তো দেখি। কিন্তু ডিম কি কখনো দাঁড় করানো যায়? কেউ পারছে না দেখে কলম্বাস বললেন তাহলে আমি করে দেখাই, আপনারা সব দেখুন। এই বলে উনি ছুরি দিয়ে ডিমের তলার খানিকটা উড়িয়ে দিলেন। তলাটা চ্যাপটা হয়ে গেল। তখন ডিম ঠিকই দাঁড়াল। সবাই বলে উঠলেন, এ আর কী, এ তো সকলেই পারে। কলম্বাস গোঁফে তা দিয়ে বললেন পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার আগে আর কেউ পেরেছিলেন কি?'

আমি বললাম 'তুই নিজেকে কলম্বাসের সঙ্গে তুলনা করছিস, তা ভাল। কিন্তু আবিষ্কার না হতেই কলম্বাস। তুই তো দেখছি কলম্বাসের বাবা হয়ে গেলি।'

শান্তনু আমার কথায় কর্ণপাত না করে বলল, 'ঐ কালো মোটা ফিজিক্স বইটার একশো তেত্রিশ পাতা খোল। কী দেখছিস।'

'চিত্র নম্বর একুশ পয়েন্ট তিন। পর্যায় সারণী।'

'বুঝলি কিছু? ভাল করে পড়ে দেখ। বোঝবার চেষ্টা কর।'

চেষ্টা করলাম। পাতা জুড়ে চৌখুপি ঘর কাটা, প্রত্যেকটা ঘরের মাঝখানে দুটো করে ইংরিজী অক্ষর তাদের মাথায়, ওপরে, নীচে, ডান দিকে খুদি-খুদি করে লেখা

কিছু সংখ্যা। ইংরিজী অক্ষরগুলো বুঝতে পারলাম, মৌলের রাসায়নিক সংকেত, যেমন এইচ মানে হাইড্রোজেন, এম জি মানে ম্যাগনেশিয়ম, কিন্তু সংখ্যাগুলো কী ?'

শান্তনু ততক্ষণে অঙ্ক স্যারের কায়দায় বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে। 'তুই জিজ্ঞেস করছিলি কী এঁকেছি তাই না ?'

'জানি, জানি। এঁকেছিস পরমাণুর চেহারা। মাঝখানে নিউক্লিয়াস, বাইরে ইলেকট্রন ঘুরছে।'

'রাইট। এখন চার্টের দিকে তাকা। হিলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রে আছে দুটো প্রোটন, দুটো নিউট্রন, বাইরে দুটো ইলেকট্রন। চৌকো ঘরগুলোর নীচে বাঁ দিকে দেওয়া আছে পরমাণু সংজ্ঞা। মানে ইলেকট্রন প্রোটন সংখ্যা। যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে ততগুলো প্রোটন। চার্টের তলার দিকে চলে আয়। মাঝখানে এই এ ইউ টা কিসের সংকেত জানিস ?'

'জানি। সোনার।'

'বাঃ, কিছু জানিস তাহলে। সোনায় প্রোটন ইলেকট্রন সংজ্ঞা কত দেখছিস ?'

'উনআশি।'

'আচ্ছা। সীসে, অর্থাৎ লেড-এর ইলেকট্রন প্রোটন কতগুলো ?'

'সীসে মানে পি বি ? কোথায় গেল ? হ্যাঁ, এই তো। বিরাশি।'

'তাহলে তফাত কত ?'

'কিসের তফাত ?'

'বিরাশির সঙ্গে উনআশির ?'

তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গেছি। আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'শান্তনু তুই যে সেকালের অ্যালকেমিস্ট হয়ে গেলি, তুই ভাবছিস দস্তা ধাতুর প্রোটন ইলেকট্রন কমিয়ে তাকে সোনায় পরিণত করবি ?'

অ্যালকেমিস্ট বলাতে ক্ষেপে লাল হয়ে গেল শান্তনু। চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'অ্যালকেমিস্ট ! অ্যালকেমিস্টরা না জানত ফিজিক্স, না জানত কেমিস্ট্রি। ওরা কেবল বিশ্বাস করত বস্তুর রূপান্তর ঘটানো যায়। আর কিছু জানত না। বিশ্বাসে ভেলকি দেখান যায়, বিশ্বাস দিয়ে সায়েন্স হয় না, বুঝলি ? ওরা মনে করতো এ্যালোপাথাড়ি পরীক্ষা করতে করতে ওরা ঠিক বেস মেটালকে সোনায় বদলাতে

পারবে। এই মনে করে তারা এটার সঙ্গে ওটা মেশাত, জলে গুলত, আগুনে ফোটাত, ঠাণ্ডা করত—পাথর, ধাতু, তরল, দ্রবণ সব রকম জিনিস নিয়ে দেখত কিসের সঙ্গে কী যোগ করলে সীসে বদলে হয়ে যাবে সোনা। কেউ কি করতে পেরেছিল? পারে নি তার কারণ ওরা পদার্থের আসল গঠনটাই জানত না—পারমাণবিক গঠন। এটা জানত না যে আগুনে ফোটালে কিম্বা জলে ভেজালে পারমাণবিক বিক্রিয়া হবে না। তার জন্য চাই দারুণ পাওয়ারফুল অ্যাকসেলারেটর।'

'কত পাওয়ারফুল?' আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'ধরে নে একশো মিলিয়ন ভোল্ট। এটার জন্য আর একটু অঙ্ক কষতে হবে।'

আমি আস্তে আস্তে বললাম 'শান্তনু, তুই যা ভাবছিস তা অসম্ভব। মেশোমশাইদের অ্যাকসেলারেটরে এই সব ছেলেখেলা তোকে করতে অ্যালাউ করবে ওরা?'

'ছেলেখেলা নয়। আমি অনেক ভেবেছি। বাবার সঙ্গে এ-বিষয়ে এখনো কথা বলা হয় নি। কষে দেখতে হবে ঠিক কত জোরে হিট করলে তিনটে প্রোটন ছিটকে বেরিয়ে আসবে—তার পরে অবশ্য বেরিয়ে আসা প্রোটন নিয়ে অন্য সমস্যা আছে।

আমি বললাম 'শান্তনু, সোনা বানানো যদি এতই সহজ তাহলে এতদিন সব পরমাণু বিজ্ঞানীরা করছিল কি?'

'ওদের কি কোন প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি থাকে? একমাত্র এডিসন ছাড়া আর কোন প্র্যাকটিকাল বুদ্ধিওয়ালা সায়েন্টিস্ট দেখেছিস তুই?'

'দুঃখের বিষয় এডিসনকেও আমি দেখিনি।' আমি উঠে পড়লাম। কচুরিগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল। আঙুল চাটতে চাটতে বললাম 'চা-টা তুই-ই খেয়ে নে।'

* * *

চেয়ারে বসে বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। তখন নিশ্চয়ই অনেক রাত। সবাই শুয়ে টুয়ে পড়েছে। নিঝুম রাতে হঠাৎ শুনলাম দমকলের আওয়াজ, তারপরেই টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং—প্রায় একই সঙ্গে সাইরেনের ভোঁ। তারপরেই শুনলাম রেডিওতে খবর পড়া হচ্ছে—কাল মধ্য রাত্রে একটি বাড়ি রহস্যজনক বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বিশেষ কেউ হতাহত হয়েছেন বলে শোনা যায়নি··· ধুপধাপ শব্দ, অনেক লোকের চলাফেরা উত্তেজিত কথাবার্তা। ঘুমের মধ্যেই ভাবলাম

আরো যাও সীসের প্রোটন আলাদা করতে। সোনা করবেন না আরো কিছু। এখন হল তো? খুব শিক্ষা হল শান্তনুচন্দ্রের।

স্বপ্নের কথা ঘুম ভেঙে গেলে মনে থাকে না, কিন্তু কাল রাত্রের ব্যাপারটা এত সত্যি বলে মনে হচ্ছিল যে সকাল বেলা কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। সত্যিই কিছু হল নাকি? খবরের কাগজটা আসতে এত দেরী করে।

একটা খাতা আনার নাম করে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখলাম মেশোমশাই অফিসে যাবার জন্য রেডি হচ্ছেন। এই সময়টা ভীষণ তাড়াহুড়ো, কোন জিনিস সামনে থাকলেও খুঁজে পাওয়া যায় না। বাড়িশুদ্ধ সবাই ওঁর কাছে বিনা কারণে বকুনি খায়। আমি কোনমতে অদৃশ্য থাকার চেষ্টা করতে সুট করে শান্তনুর ঘরে গিয়ে ঢুকেছি।

ঢুকে দেখি বোর্ড পরিষ্কার। টেবিল থেকে সব কালো মোটা বই উধাও। শান্তনু লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

'এ কি? তুই এখনো ঘুমোচ্ছিস। এটা কি কলম্বাসের বাবার উপযুক্ত কাজ?'

শান্তনু চোখ খুলল। খুলেই আবার ঘুমোবার জন্য পাশ ফিরল।

'তোর এক্সপেরিমেন্ট ফুটে গেল নাকি?'

এতক্ষণে জেগে ওঠার লক্ষণ দেখা গেল। শান্তনু উঠে বসল। বলল, 'বাবা বললেন, আইডিয়াটা খুব নতুন। হিসেবেও কোন ভুল নেই। কিন্তু অত জোরে হিট করার জন্য যে অ্যাকসেলারেটর চাই সেটা হতে হবে অন্তত দেড় কিলোমিটার লম্বা। তৈরি করতেও খরচ পড়বে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা। বানাতেও লাগবে কমসে কম দশ বছর। তার মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাড়তে টোটাল খরচা চল্লিশ কোটিতে গিয়ে ঠেকতেও পারে। অত কাণ্ড করে শস্ত মেটালকে সোনা বানাতে যা খরচ পড়বে তাতে নকল সোনাই হয়ে যাবে আসল সোনার চেয়ে দামী।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল।' আমি গম্ভীর ভাবে বললাম।

শান্তনু বিছানা থেকে ওঠবার উপক্রম করতেই আমি এক লাফে দরজার বাইরে। যাবার আগে গলাটা বার করে ঘোষণা করে গেলাম 'তাহলে আজ বিকেলে তুই খেলছিস। যাই কেষ্টাদের বলে আসি।'

রথীন সরকার

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে মার্চ স্কানার্ক শহরের একটি গণ্ডগ্রামে ফুটফুটে একটি দুরন্ত শিশুর জন্ম হলো।

বাবা নীল লিভিংস্টোন চায়ের এজেন্ট। আর মা দর্জির মেয়ে। সুতরাং সাংসারিক অস্বচ্ছলতা তাকে বাধ্য করলো একটি কাপড়ের কলে কাজ নিতে। কিন্তু তা বলে ছেলেটি হার মানলো না। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি তাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারলো না। ছেলেটি ভর্তি হলো নৈশ বিদ্যালয়ে। তারপর তিল তিল করে অর্থ সঞ্চয় করে গেল গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ল্যাটিন, গ্রীক, ধর্মতত্ত্ব এবং চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ছেলেটি ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরে এলো। শুরু হলো তার আর এক জীবন। আর ছেলেটি সেদিন থেকেই হলো ডেভিড লিভিংস্টোন।

মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে ডাঃ লিভিংস্টোন এক অজানা পথের সন্ধানে লণ্ডনে পাড়ি দিলেন সেখানে চেয়ারিংক্রশ হাসপাতালে যোগ দিয়ে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন। স্থির হলো শিক্ষা শেষে তাঁকে চীন দেশে পাঠানো হবে। কিন্তু সেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হওয়ায় তা আর সম্ভব হলো না। ফলে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর একটি মিশনারী সোসাইটির চাকুরী নিয়ে ডাঃ মোফাটের সঙ্গে তিনি যাত্রা করলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানকার আদিম এবং আদিমতর মানুষের মধ্যে ধর্ম এবং শিক্ষার আলোকবর্তিকা ছড়ানোই ছিলো তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যে ডাঃ লিভিংস্টোনের জীবনে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। তিনি হঠাৎ ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে ডাঃ মোফাটের কন্যা মেরীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু সাংসারিক ক্রিয়াকর্ম তাঁকে আকর্ষণ করতে পারলো না। বহির্মুখী মন তাঁকে অন্তর্মুখী করতে পারলো না। তাই তিনি বেচুয়ানাল্যাণ্ডের কুরমান-এ এসে সেখানকার অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে স্তম্ভিত হলেন। তাঁর মন করুণায় বিগলিত হলো। ফলে তিনি এদেশের ভাষা শিখে এইসব অধিবাসীদের মধ্যে মিশে গিয়ে এদের রোগ ব্যাধিতে সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন। এছাড়াও তিনি এদের মধ্যে ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষার প্রসার ঘটাতে লাগলেন। ফলে অচিরেই তিনি এই সব অধিবাসীদের হৃদয় জয় করে এদের চোখের মণি হয়ে উঠলেন। আদিবাসীরাও লিভিংস্টোনের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হতো না।

এমনিভাবে প্রথম অভিযানেই ডাঃ লিভিংস্টোন সাফল্যের শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করলেন। তিনি স্থানে স্থানে মিশন প্রতিষ্ঠিত করে এক একজন ধর্মান্তরিত খ্রীস্টানকে সেইসব মিশনের দায়িত্ব দিয়ে তিনি কুরমান থেকে দুইশত মাইল ভেতরে আরও উত্তরে চলে গেলেন। অভিযান শুরু হলো। এ অভিযান পৃথিবীর অন্ধ কুসংস্কার এবং ঘৃণ্য জীবনের বিরুদ্ধে।

একদ যে দুর্গম বিশ্ব তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিলো সেই দুর্গমতা এবার ডাঃ লিভিংস্টোনকে যেন নেশাগ্রস্থ করে তুললো। লিভিংস্টোন বুঝতে পারলেন স্ত্রী, পুত্র পরিবার নিয়ে এই দুর্গম অঞ্চলে পরিভ্রমণ করা সম্ভব নয়। এখানে প্রতি পদে পদে আছে মৃত্যুর বীভৎসতা আর হিংস্র জন্তুর উৎপাত। এছাড়াও আছে ম্যালেরিয়া, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি সব মারাত্মক রোগ।

সুতরাং ১৮৫২ সালে তিনি কেপটাউনে স্ত্রী পুত্রদের বিদায় দিয়ে বেচুয়ানাল্যাণ্ডে ফিরে এলেন। কিন্তু এখানে এসে যা দেখলেন তাতে তাঁর অসীম ধৈর্যের বাঁধও চিড় খেল। তিনি দেখলেন এ দেশের ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকরা তাঁর ঘরবাড়ি লুটপাট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাঁর ওষুধের বাক্সটি নিয়ে গিয়েছে। আর স্থানীয় অধিবাসীরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সব ওলন্দাজ আর আরব দস্যুদের অত্যাচারের কথা তখন সর্বজন বিদিত। এরা গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে মানুষ ধরে নিয়ে আসে তারপর গরু

ছাগলের মতো বন্দরে বন্দরে বিক্রী করে দেয়। এ ছাড়াও এরা স্থানীয় অধিবাসীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে এদের কাছ থেকে হাতির দাঁত, পাখির পালক, জীবজন্তুর চামড়া সংগ্রহ করে সেগুলি বিদেশী সওদাগরদের কাছে বিক্রী করে দেয়।

লিভিংস্টোন এইসব মর্মন্তুদ কাহিনী শুনে ব্যথিত হলেন। তিনি এদের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ খুঁজতে লাগলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন যেমন করেই হোক তিনি এইসব অত্যাচার বন্ধ করবেনই। মধ্য আফ্রিকায় যাতায়াতের এমন একটি পথ আবিষ্কার করবেন যাতে এইসব বুয়রদের দেশের মধ্য দিয়ে যেতে না হয়।

সুতরাং এমনি একটা পথ খুঁজতেই ১৮৫২ সালের জুন মাসে কেপটাউন থেকে তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন। এবার পাকাপোক্ত ভাবে পাত্রীর কাজ ছেড়ে অভিযাত্রীর পথ বেছে নিলেন। সঙ্গে রইলো দশটি বলদ, কিছু অর্থ আর একটি ভাঙা গাড়ি।

কিন্তু তা বলে লিভিংস্টোন পিছু হটবার লোক ছিলেন না। এক দুর্দমনীয় মনের জোরেই তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। অরেঞ্জ নদী অতিক্রম করে তিনি যখন কালাহারীতে এসে পৌঁছালেন তখন ডিসেম্বর মাস। এর রুক্ষ নগ্নরূপ তাঁর চোখকে পীড়িত করতে লাগলো। তিনি দেখলেন নানা রকম জীবজন্তু সারা মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। স্থানে স্থানে বুনো ঘাস, লতাপাতা কিংবা কাঁটা ঝোপের গাছ। এরই আশেপাশে এক ধরনের মানুষের বাস। এরা ছোটখাটো হাসিখুশি, সরল এবং নিরীহ প্রকৃতির। এদের বলা হয় বুশমেন।

লিভিংস্টোন এইসব মানুষদের আতিথ্য এবং সহযোগিতা গ্রহণ করে সোজা উত্তর দিকে এগিয়ে চললেন। ১৮৫৩ সালের মে মাসে তিনি লিলিয়ানডি এসে পৌঁছালেন। তারপর লিয়াম্বী এবং লিবা নদী অতিক্রম করে আফ্রিকার গভীর এক গহন অরণ্যে এসে পৌঁছালেন। শুরু হলো আর এক অভিযান। প্রকৃতির ভয়ঙ্করতার কাছে অগ্নিপরীক্ষা। ভয়ালতার সঙ্গে দুর্জয় পাঞ্জা! লিভিংস্টোন সেই পরীক্ষা দিতেই এগিয়ে চললেন। অসভ্য জাতির ছোট ছোট রাজ্য পেরিয়ে যেতে যেতে তিনি হাতি, গণ্ডার, জেব্রা, হরিণ, সিংহের অবাধ বিচরণ ভূমি দেখলেন। ছোট ছোট এইসব অসভ্য জাতিরা কেউ কেউ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলো আবার শত্রুতা করতেও লাগলো। শুধু তাই নয়—কয়েকবার তিনি হাতি সিংহের কবলে পড়লেন। দাস ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে তাঁর প্রাণ যাবার উপক্রম হলো।

শরীর তখন তাঁর ভেঙে পড়েছে। বারবার জ্বরের আক্রমণে বেহুঁশ হয়ে পড়ছেন। কিন্তু লিভিংস্টোন অটল। অটল তাঁর ধৈর্য। এক দুর্দমনীয় মনোবাসনা চরিতার্থ করতেই তিনি সমস্ত রকমের বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ করে পাহাড় পর্বত মরুভূমি পেরিয়ে অবশেষে লোয়াণ্ডাতে এসে পৌঁছালেন ১৮৫৪ সালের ৩১শে মে।

এই লোয়াণ্ডা তখন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ অধ্যুষিত অ্যাঙ্গোলার একটি বড় বন্দর। লিভিংস্টোন এখানেই একজন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থেকে নিজেকে সুস্থ করে তুললেন।

কিন্তু এখানেও তিনি বেশিদিন থাকলেন না। একটু সুস্থ হতেই তিনি লিলিয়ানডিতে ফিরে এলেন ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর। আবার নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু হলো। এবার তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যতদিন না তিনি সমুদ্র তীরে গিয়ে পৌঁছাবেন ততদিন তিনি পূর্বদিকে চলতেই থাকবেন। সুতরাং লিভিংস্টোন জাম্বেসী নদী ধরে সোজা চলতে লাগলেন। কিছুদূর যেতেই সেখানকার লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করলো, তোমার দেশে কি ধোঁয়ায় গর্জন করতে পারে?

প্রশ্ন শুনে লিভিংস্টোন অবাক হয়ে গেলেন। এমন অদ্ভুত কথা তিনি এর আগে আর কখনও শোনেননি। তাই অদম্য কৌতূহলে তিনি জাম্বেসী নদী ধরে এগিয়ে চললেন। কিছুদূর যেতেই তিনি অবাক হয়ে দেখলেন পাঁচটা ধোঁয়ার স্তম্ভ যেন মেঘের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। লিভিংস্টোনের মনে হলো এমন সুন্দর স্থান যেন পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তাঁর জীবন যেন সার্থক হলো। তিনি তাকিয়ে দেখলেন প্রায় একমাইল বিস্তৃত এক বিশাল জলধারা প্রায় চারশত ফুট উঁচু থেকে প্রবলবেগে লাফিয়ে পড়ছে। আর তারই ফলে সেই বিশাল প্রপাতের জলরাশি এক ভয়ানক শব্দে ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে প্রায় দুইশত হাত উঁচু হয়ে উঠছে। আর তারই উপর সূর্যের আলো পড়ে সৃষ্টি হয়েছে রামধনুর এক অপূর্ব বর্ণ বৈচিত্র্য!

ইউরোপীয় কোন পর্যটক এর আগে এতবড় জলপ্রপাত আবিষ্কার করেননি। তাই তিনি ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার নামানুসারে এর নাম দিলেন ভিক্টোরিয়া। আর স্থানীয় নাম মসি-ওয়া-তুন্যা। অর্থাৎ গর্জনকারী ধোঁয়া। লিভিংস্টোন অবাক হয়ে দেখলেন এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। কিন্তু একটি প্রশ্ন তাঁকে আবার উদ্বেলিত করে তুললো: এই বিশাল জলধারা যায় কোথায়? তিনি খানিকটা এগিয়ে যেতেই

এবার সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল। তিনি দেখলেন সেই বিশাল জলধারা ফুলে ফেঁপে ভীষণ বেগে এক খরস্রোতা নদীতে গিয়ে পড়েছে। আর তারই ফলে জাম্বেসী নদী এক ভয়ংকর রূপ ধরে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে।

লিভিংস্টোন এবার সেই নদীর গতিপথ ধরে ক্রমাগত এগিয়ে চললেন। একটানা চলার পর ১৮৫৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী তিনি এসে পৌঁছালেন লোয়ান গোয়াতে। সেখান থেকে টেট্রিতে। তারপর সোনা এবং পূর্ব উপকূলের কুইলিমেন বন্দর হয়ে মে মাসে তিনি ফিরে এলেন ইংল্যাণ্ডে। একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলো। ইংল্যাণ্ডে তিনি রাজকীয় সম্বর্ধনা পেলেন। ভৌগোলিক আবিষ্কারক হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। দলে দলে লোক আসতে লাগলো তাঁকে দেখতে। দীর্ঘদিনের ভয়াবহ সব অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিখলেন একটি বই-এ। সে বই জলের মতো হু হু করে বিক্রী হয়ে গেল। লিভিংস্টোন ভাবলেন আর নয়। এবার এখানেই তিনি বাকি জীবনটা আরামে কাটিয়ে দেবেন। স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে গড়ে তুলবেন শান্তির গৃহকোণ।

কিন্তু হলো না। রক্তে যাঁর ঝোড়ো হাওয়ার মাতন তাঁকে রুখবে কে? তাই লিভিংস্টোনকে আবার কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকলো! কে যেন ফিসফিস্ করে বললো: অজানার অন্ধকারেই তো তুমি আজন্ম লালিত। তোমাকে কি মানায় শান্তির গৃহকোণ! সুতরাং এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো দুর্বার গতিতে। সভ্যতার আলোক শিখায় বিদীর্ণ করে দাও অন্ধকারের বুক।

লিভিংস্টোন শুধু অজানা পথেরই সন্ধান দেন নি। সভ্যতার আলোকবর্তিকাই শুধু দেখান নি, তিনি ভালোবেসেছিলেন আফ্রিকার মানুষদের গভীর মমতায়!

বিজ্ঞান সুভাষিত

প্রত্যেক দ্রব্যই যেখানে আপন ধারায় চলে, কাহারাও সহিত কাহারও মিল থাকে না, তখন উহাই তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম হইলেও, আমরা উহাকে নিয়ম বলিতে চাই না, উহাকে নিয়ম না বলিয়া অনিয়ম বলিলেই ভাল হয়। যেখানে অনেকগুলি জিনিসের একটা বিষয়ে মিল আছে, অনেকগুলিতে একজোট হইয়া এক ধারার চলে, সেইখানেই আমরা নিয়ম আছে বলিয়া থাকি। জগতে অনৈক্যের অভাব নাই; কিন্তু বহুতর অনৈক্যের মধ্যে বহু ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানই বিজ্ঞানের একটা প্রধান কার্য।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বাস্তব, কল্পনা, যুক্তি, গণিত ও বিজ্ঞান

বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

তোমরা বিদ্যালয়ে যে বিজ্ঞান ও গণিত পড়, তাতে কল্পনা শক্তির স্থান কতটা, তা নিশ্চয় কিছুটা বুঝেছ। আমরা চারিদিকে যেসব বাস্তব ঘটনা ঘটতে দেখি, তাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করি। 'যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে'—এই বলে আমরা দাবি করি তখনই, যখন দেখা যায় যে, সেই ঘটনা বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও মাপজোকের ফল এবং কল্পনা, যুক্তি আর গাণিতিক হিসাবের ফল একই রকম। কিন্তু কল্পনা, যুক্তি ও গণিতের ভিত্তিতে বাস্তব ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে কতরকম কূটকচালে প্রশ্নের ধাক্কায় পড়তে হতে পারে। তার কতকগুলি উদাহরণ দিই ; তা হলেই তোমরা উপলব্ধি করবে যে, তথাকথিত 'বাস্তব সত্যকে' বোঝা সহজ ব্যাপার নয়।

তোমরা পরীক্ষা পাশের জন্য খুব সহজেই মুখস্থ কর বটে, কিন্তু বিষয়টিতে একটু গভীরভাবে ঢুকলেই বুঝবে যে, সেই ক্ষেত্রে কল্পনা ও বাস্তবকে সমন্বিত করা কত কঠিন।—নিউটনের প্রথম গতিসূত্রে তোমরা পড় যে, একটা বস্তু যদি থেমে থাকে, তবে সেটা সেই অবস্থাতেই থাকবে, অথবা যদি সেটা একবার চলতে শুরু করে, তবে সোজা পথে সমান বেগে চলতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও বল (force) সেটার ওপর প্রয়োগ না করা হয়। স্থিতির অবস্থাটাকে নিয়ে বিশেষ আলোচনার দরকার নেই, কারণ স্পষ্টই দেখা যায় যে, বল প্রয়োগ না করলে একটা স্থিতিশীল জিনিস

পড়ে না। কিন্তু তোমরা অন্ততঃ একটা উদাহরণ দাও যেক্ষেত্রে বলের সাহায্য ছাড়া কোনও বস্তু সোজাপথে সমবেগে চলে। বলা বাহুল্য, একটাও নজির দেখাতে পারবে না। মোটরগাড়ি বা রেলগাড়িকে সরলরেখায় সমবেগে চলনশীল রাখতে গেলে তো পেট্রোল বা কয়লা পুড়িয়ে ক্রমাগত বল প্রয়োগ করেই চলতে হবে। তোমরা যে পৃথিবীর ওপর বসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর, সেখানে তো প্রতি পদে নানা রকমের বল কাজ করছে। যেমন বাতাসের বাধা, চলার পথে ঘর্ষণের বাধা (পথকে যতই মসৃণ করা হোক), অভিকর্ষ বলের বাধা। তাছাড়া, পৃথিবী তো গোল; তার পৃষ্ঠে সোজা পথে অর্থাৎ 'সরলরেখায়' চলার প্রশ্ন ওঠে কি করে? তোমরা বলবে যে, একটা খুব লম্বা অনুভূমিক (horizontal) মসৃণ টেবিলে পরীক্ষার গোলককে

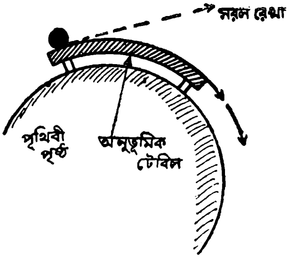

গড়িয়ে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এখন জিজ্ঞাসা করি: তোমাদের ল্যাবরেটরি কত বড় হতে পারে? কত, কত…কিলোমিটার লম্বা টেবিল নিয়ে কাজ করবে?—দ্বিতীয়ত, 'অনুভূমিক' মানে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল; যদি তোমাদের পরীক্ষার গোলক অনুভূমিক টেবিলে গড়িয়ে চলে। তবে সেই চলন এবং সরল-রেখায় চলন কি একই হল? চিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখো।

দেখা যাচ্ছে যে, চলার পথকে বাস্তব জীবনে বাধা শূন্য (অর্থাৎ, নানা বলের প্রভাব থেকে মুক্ত) না করতে পেরেও এবং একটা খাঁটি সরল পথকে বাস্তবভাবে না পেয়েও আমরা এমন একটা বৈজ্ঞানিক সূত্রকে মেনে নিচ্ছি, যেটার মূল সুরটা হচ্ছে 'মাসির যদি গোঁফ গজাতো, তবে তিনি মামা হতেন'। অতএব, সহজ সরল বুদ্ধি (common sense) দিয়ে নিউটনের গতিসূত্রটি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের দার্শনিক আরিস্তোতেলীস্ (বা অ্যারিস্টটল্) সহজ বুদ্ধি দিয়ে গতিস্থিতিকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে, তিনি প্রথম গতিসূত্রটির স্রষ্টা হতে হতেও ব্যর্থ হলেন। আমাদের ঠিক এখনকার আলোচনার খাতিরে নানা খুঁটিনাটি কথা বাদ দিয়ে সংক্ষেপে বলি, আরিস্তোতেলীস্ মনে করতেন শূন্যতা (Vacuum বা Void) অসম্ভব, এবং তিনি বিভিন্নভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে-ছিলেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ যদি বায়ুশূন্য হত, তবে পার্থিব জিনিসের গতি স্থিতি ব্যাখ্যা

করাই যেত না। তিনি বলেছিলেন: 'একটা বস্তুকে শূন্যতার মধ্যে একবার গতি দিলে, সেটা কখনও কোথাও থামবে না; কেনই বা সেটা একটা জায়গার পরিবর্তে আরেকটা জায়গায় থামবে? অতএব, বস্তুটি একটা জায়গায় যদি প্রথমেই স্থিতিশীল থাকে, তবে সেটা স্থিতিশীল থাকবে, অথবা যদি একবার গতিশীল হয়, তবে শূন্যতার মধ্যে সেটা চিরকালই চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও একটি বাধার সঙ্গে তার সংঘাত না হয়; সেইরকম অনন্ত চলন একটা অসম্ভব ব্যাপার।'—একটা জিনিস সম্পূর্ণভাবে বাধামুক্ত হলে সেটা অনন্তভাবে চলতে থাকবে—এই সম্ভাবনাটা আরিস্তোতেলীসের সহজ বুদ্ধির বিচারে (এমন কি বর্তমান অত্যাধুনিক যুগেরও অনেক সাদামাটা মানুষের চোখে) একটা অভাবনীয় ব্যাপার। 'অতএব, প্রকৃতিতে শূন্যতা অসম্ভব।'—অথচ আরিস্তোতেলীস্ অন্য সবার মতই দেখেছিলেন যে, ঊর্ধ্বাকাশে গ্রহ, চাঁদ সবই ক্রমাগত চলছে। কাজেই, তাঁকে ঐ বিরামহীন চলন সম্বন্ধে একটা ব্যাখ্যা দিতেই হয়েছিল। সেই ব্যাখ্যাটাও ছিল সহজ বুদ্ধি প্রসূত। তিনি ধরে নিলেন, পার্থিব গতিস্থিতির নিয়ম এবং ঊর্ধ্বাকাশের নিয়ম আলাদা; ঊর্ধ্বাকাশের গতির ক্ষেত্রে কোনও দৈবশক্তি কাজ করছে এবং পৃথিবীতে বায়ুর অস্তিত্বটাই গতি-স্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আরিস্তোতেলীসের চিন্তাপদ্ধতি ও ব্যাখ্যাগুলি ইউরোপের মধ্যযুগ পর্যন্ত বেশির ভাগ পণ্ডিতদের মনকে মোহমুগ্ধ করে রেখেছিল।

১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে কোপার্নিকাস্ পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে সূর্যকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মহলের চিন্তা ভাবনার নানা ওলোটপালট শুরু হল। সেই পরিবর্তনের ধারায় এলেন গালিলেও (১৫৬৪—১৬৪৯)। তিনি উপলব্ধি

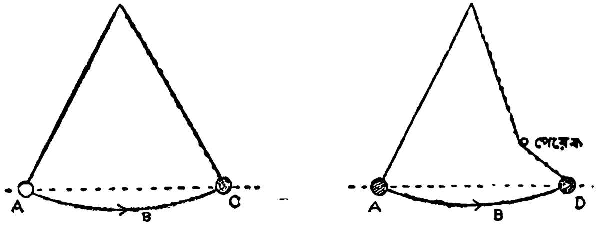

করলেন যে, জ্যোতিষ্কদের এবং পার্থিব বস্তুর গতিস্থিতির নিয়ম আলাদা হ'তে পারে না; এবং এই দুই জগতের গতিস্থিতির নিয়মে ঐক্য স্থাপন করতে হ'লে সহজ বুদ্ধি যথেষ্ট নয়। তখন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু।

গালিলেও একটা সামান্য পরীক্ষা এবং চিন্তার ভেতর দিয়ে বুঝলেন যে, কোনও বস্তুর গতির মূল সূত্র বার করতে গেলে গোড়াতে কল্পনা করা দরকার যে, চলার পথে কোনও রকম বাধা নেই ; বাধাহীন ভাবে বস্তুটির চলন কেমন হ'ত, সেইটা নির্ণয় ক'রে নিয়ে তারপর বাস্তব বাধাগুলির হিসাবে নিলেই চলবে। তাঁর সরল পরীক্ষাটি ছিল এই (চিত্র দেখো): একটা দোলকের গোলকটিকে যদি তার স্থিতিশীল অবস্থান B থেকে A-তে টেনে তুলে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে দেখা যায় যে, সেটা যে-উচ্চতা থেকে ছাড়া হয়েছে, সেই উচ্চতা C পর্যন্তই ওঠে। এবার, যদি পেরেক রেখে সুতোর চলনটাকে ব্যাহত করা যায়। তবে দোলার পথটা ABC না হয়ে, হবে ABD ; কিন্তু দেখা যাবে যে, D-র উচ্চতা আগের মতই (C-র মতই)।

এই পরীক্ষা থেকে গালিলেও 'যা' পর্যবেক্ষণ করলেন, তা'র সঙ্গে যোগ করলেন কল্পনা ; একটা 'কাল্পনিক পরীক্ষার' (thought expriment) কথা ভাবলেন (দেখ): একটা গোলককে যদি একটা বিশেষ উচ্চতা h থেকে ঢালু ও অতি

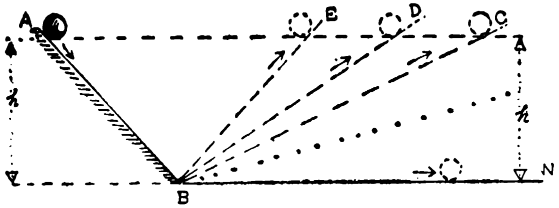

মসৃণ পাঁচিল AB-র গা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে সেটা তার চলার ঝোঁকে আরেকটা মসৃণ ঢালু পাঁচিল বেয়ে ঠিক একই উচ্চতায় উঠবে—এই পাঁচিলটির ঢালুত্ব BC, BD, BE...যাই হোক না কেন, ঢালুত্ব অনুযায়ী, হয় তাড়াতাড়ি, না-হয় আস্তে আস্তে উঠবে, তা হলে "চড়তি" পাঁচিলের "ঢালুত্ব" যদি শূন্য হয় (অর্থাৎ অনুভূমিক তল BN), তবে গোলকটি h-উচ্চতায় ওঠবার জন্য যাত্রা করবে কিন্তু সেই উচ্চতায় কখনই পৌঁছবে না, এবং চলার ঝোঁকে চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে...সোজা পথে যতক্ষণ কোনও বাধার সম্মুখীন না হয়। তার মানে, গালিলেও চারিদিকের বাতাসের বাধা, চলার পথের স্বাভাবিক ঘর্ষণের বাধা, অভিকর্ষ-টানের বাধা, পৃথিবীর গোলাকৃতি পথের সীমাবদ্ধতা—এই সব কিছু প্রশ্নকে কল্পনায় অগ্রাহ্য ক'রে উপলব্ধি করলেন যে, সেই রকম আদর্শ বন্ধনমুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলে, চলন্ত গোলক অনন্ত আকাশে

সরল রেখায় চলতেই থাকবে। তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে হাতে কলমে পরীক্ষা এবং কাল্পনিক পরীক্ষার ওপর নির্ভর ক'রে গ্যালিলেও নিউটনের প্রথম গতিসূত্রের বনিয়াদ তৈরি করলেন।

তার প্রায় আধ শতক পরে নিউটন সেই সূত্রকে একটা স্পষ্ট রূপ দিলেন এবং 'জড়ত্ব' ও 'প্রযুক্ত' বলের স্পষ্ট সংজ্ঞা দিলেন। মানুষের সহজবুদ্ধি অনুযায়ী, একটা জিনিসকে সোজা পথে সমবেগে চলন্ত রাখতে গেলে 'যা' দরকার, তা হল প্রযুক্ত বল। নিউটনের বৈজ্ঞানিক বিচার অনুযায়ী, একটা জিনিসের পক্ষে স্থিতিশীল অবস্থাটা যতটা স্বাভাবিক, তার পক্ষে সমবেগে সরল রেখায় চলাটাও ততটাই স্বাভাবিক; জিনিসটা তার নিজস্ব 'জড়ত্বের' ঝোঁকে অনন্ত ভাবে চলতেও পারে, থেমেও থাকতে পারে; কিন্তু আমরা তখনই বলতে পারি 'একটা বল প্রযুক্ত হ'ল', যখন চলন্ত জিনিসটার বেগ বেড়ে গেল বা ক'মে গেল বা সে দিক পরিবর্তন করল, অর্থাৎ যখন তার গতিতে কোনও পরিবর্তন হ'ল। সহজবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক বিচার থেকে যে-সংজ্ঞাগুলি পাওয়া গেল, তাদের মধ্যে ফারাক খুবই স্পষ্ট।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে, অনেকগুলো 'অবাস্তব' অবস্থা (যা' ল্যাবোরেটরিতে বা পৃথিবী পৃষ্ঠে কার্যকর করা অসম্ভব) কল্পনা ক'রে নিয়ে প্রথম গতিসূত্রটি তৈরি করতে হয়েছে। চলার পথটাকে খুব, খুব মোলায়েম ও লম্বা করে তার ওপর একটা ড্রাই-আইসের (জমানো কার্বনডাই অক্সাইড্) ছোট চাক্তিকে ক্যারমের স্ট্রাইকারের মত টোকা মারলে সেটা 'অনেক দূর' যাবে নিশ্চয়, কিন্তু সেই চলনটা তো অনন্ত নয়; তাছাড়া, পৃথিবীর অভিকর্ষকে ব'দ দেওয়া তো দুঃসাধ্য। এইখানে এখন বলা দরকার যে, ড্রাই আইস্ চাক্তির সহজ চলন বা দোলকটির একই উচ্চতায় আরোহণ ইত্যাদি কতকগুলি চোখে-দেখা বাস্তব লক্ষণ থেকে চিন্তাশীল মানুষের মন কল্পনা করে নিতে পারে, আদর্শ বন্ধনমুক্ত অবস্থায় কি ঘটতে পারে। সেই রকম 'আদর্শ অবস্থাকে' কল্পনা করার ভেতর দিয়েই আধুনিক গতিবিজ্ঞানের (তথা পদার্থবিজ্ঞানের) জন্ম।—এবার একটু সচেতন ভাবে খেয়াল ক'রে দেখো যে, তোমরা বয়্‌লের সূত্র, চার্ল্‌সের সূত্র (Boyle's law, Charles law), ইত্যাদি বিষয়ে যখন অঙ্ক ক'ষ, তখন কোন্ রকম গ্যাস নিয়ে চিন্তা ক'র? বাস্তব গ্যাস্? নিশ্চয় না। তোমরা তখন আলোচনা ক'র 'আদর্শ গ্যাস' (ideal gas) নিয়ে।

এখন তোমরা স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করবে: 'নিউটনের প্রথম গতিসূত্রকে পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে সোজাসুজি যাচাই করতে না পেরেও কেন সেটাকে মানছি? মেনে নিয়ে সুবিধাটাই বা কি হচ্ছে?' উত্তরে বলব: নিউটন যখন এই সূত্রের সঙ্গে তাঁর মহাকর্ষ-সূত্র (gravition law) এবং গালিলেওর পতন সূত্র $S \propto t^2$-কে সমন্বিত ক'রে নতুন গতিবিজ্ঞান তৈরি করলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর সেই নতুন বিজ্ঞান একদিকে যেমন কামানের গোলার গতিপথ, জোয়ার-ভাঁটা, ইত্যাদি সব পার্থিব ঘটনার সঠিক গাণিতিক বর্ণনা দিতে সক্ষম হ'ল, তেমনই অপরদিকে গ্রহচন্দ্রের গতিবিধি, "ভয়াবহ" ধূমকেতুর আসা-যাওয়া, ইত্যাদি সবরকম "অপার্থিব" (উর্ধ্বা-কাশের) ঘটনারও ত্রুটিহীন গাণিতিক বর্ণনা দিতে পারল।

এর থেকে একটা কথা তোমরা নিশ্চয় বুঝলে-যে, কোনও বৈজ্ঞানিক কল্পনা সহজ-বুদ্ধির কাছে অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু যদি সেই কল্পনার ভিত্তিতে আমরা বহু রকম প্রাকৃতিক ঘটনার সুষ্ঠু গাণিতিক ব্যাখ্যা দিতে পারি। তবে সেই কল্পনাকে বাস্তব সত্য ব'লে মেনে নিতে হবে। অবশ্য, নতুন নতুন ব্যতিক্রম হাজির হলে আমরা আরও নতুন বা সূক্ষ্মতর তত্ব কল্পনা করতে বাধ্য হই, যেমন পরমাণু, ইলেক্ট্রন্, প্রোটন্, প্রভৃতি বস্তুকণার ক্ষেত্রে নিউটনের গতিবিজ্ঞান অচল; সেই জায়গায় আনতে হল "কোঅন্টাম্ মেক্যানিক্স্" (quantum mechanics) আর তার সঙ্গে আইনস্টাইনের (relativity) আপেক্ষিকতাবাদ।

বাস্তব, কল্পনা ও বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক কথা হ'ল। সামান্য প্রশ্ন করব। তোমরা হয়তো জান যে, নিউটনের কিছু আগে কয়েকজন পণ্ডিত মহাকর্ষের ব্যস্ত-বর্গসূত্র (inverse—square law of distance) কল্পনা করেন এবং নিউটন্ সেটার আরও পাকা গাণিতিক ভিত তৈরি করেন। কিন্তু "মহাকর্ষ-বল: $F \propto \frac{1}{r^2}$" এই সূত্রটি আদৌ তাঁদের মাথায় এল কি ক'রে? বলতে পার? একটা মাত্র আভাস দেব*: r-ব্যাসার্ধ-বিশিষ্ট একটি গোলকের পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল $4\pi r^2$ বাকী উত্তরটা তোমরাই দেবে এবং দেখতে পাবে যে, আলোর ও শব্দের প্রখরতা (intensity) হিসাব করতে গিয়ে সেই উত্তরটাই কাজে লাগবে।

---

* Mensuration-এ তোমরা এটা পড়েছ।

সেকালে এদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান

অরূপরতন ভট্টাচার্য

যদি কোনোদিন ইতিহাসের পাতা উল্টোই, তাহলে আমরা অবাক হয়ে যাবো। আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস বিচিত্র এবং চমক লাগানোর মত এক কাহিনী। বিজ্ঞানের কোন্ বিভাগটি তার মধ্যে নেই? আছে, জ্যোতির্বিজ্ঞান—জ্যোতির্বিজ্ঞানে পাই পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র আর আকাশের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের কথা। কথা মানে গল্প-কাহিনী নয়, তাদের সম্পর্কে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রাচীন কালে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আছে তার পরিচয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া আছে গণিত—গণিতের মধ্যে রয়েছে পাটীগণিত, বীজগণিত আর জ্যামিতি। সেই সঙ্গে আছে ত্রিকোণমিতি, পরিমিতি নামে অন্যান্য বিষয়। গণিতেও ভারতীয় মনীষা পৃথিবীকে অবাক করে।

মানুষ কেন বিজ্ঞানচর্চা করতে শুরু করল? আজ থেকে দু'হাজার আড়াই হাজার বা তার চেয়েও বেশি সময়ের আগের পরিবেশের মানুষ! একেবারে সহজ, সরল, পরিবেশ। সকালে সূর্যোদয়ে ঘুম থেকে ওঠা, সারাদিন কেটে যায় অন্ন এবং পানীয় সংগ্রহ করতেই, সন্ধ্যায়, না, অট্টালিকা বা প্রাসাদে নয়, আবার নিজের কোটরে ঢুকে আসা! এই সাদা-মাটা জীবনের মধ্যে বিজ্ঞান এসে ঢুকে পড়ল কি করে?

বিজ্ঞানও এলো কিন্তু খাদ্য-সংগ্রহ আর খাদ্য সংগ্রহ মানেই প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে। কি ভাবে?

গাছের ফল আর নদীর জলের সঙ্গে মানুষ চাষ-বাস করতেও শিখল। চাষের জন্যে জলের প্রয়োজন আর সে জল তো পরিমাণে কম নয়। তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে দু হাত ভরে জল তুলে খাওয়া যায়। কিন্তু চাষের জন্যে যে জলের দরকার সে জল পাওয়া যাবে কোথা থেকে? তা ছাড়া মানুষের সুবিধের জন্যে চাষের জমি তো ঠিক নদীর গা ঘেঁষে ঘেঁষে যাবে না। বিজ্ঞানও তখন একেবারেই অর্থহীন মানুষের কাছে। ফলে মানুষকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হচ্ছে প্রকৃতির উপরে। আর এই প্রকৃতির দান তো বৃষ্টি।

মানুষ এটুকু দেখেছে, প্রবহমান সময়ের মধ্যে কখনো শীত কমে, কখনো গরমে পৃথিবী তেঁতে ওঠে, কখনো বর্ষায় চারিদিক ভেসে যায়। আর গরমের দিন, বর্ষণ আর শৈত্যের দিন—কার পরে কোন্ দিন আসে তাও সে জানে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে। কিন্তু অনন্ত সময় তো বয়ে চলেছে। তার মধ্যে বছরের কোনো বিভাজন মানুষ তখনো শেখেনি। পঞ্জিকা, না থাকলে বছরের হিসেব থাকবে কি করে? কোন্ সময়ে বছরের শুরু, কোন্ সময়ে বছরের শেষ—তার খবর আগে থেকে কে বলবে?

এ যুগে সময় ভাগ করা আমাদের কারোর কাছেই কোনো সমস্যা নয়। যদি ইংরেজি বছর শুরুর সময়ের কথা ধরি, তাহলে জানি ওই সময়টা শীতের সময়। তারপর দিন পার হয় একটু একটু করে শীত কমে যায়, গরম পড়ে। সে গরম এত বেড়ে ওঠে যে, আমরা তার তাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। কিন্তু সে গরমের তাপও একদিন মেঘের আড়ালে চলে যায়। বর্ষণে পৃথিবী শীতল হয়, জমি উর্বরা।

কিন্তু বর্ষার সময় কখন্ তা আগে থেকে জানা যাবে কেমন করে?

এখানেও মানুষ প্রকৃতিকে কাজে লাগাল বুদ্ধি দিয়ে। সন্ধ্যের অন্ধকারে মেঘহীন আকাশের দিকে কে না চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেছে? নীল আকাশের পটে কত তারা!

প্রাচীনকালের মানুষেরা আকাশপটে তারাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কৌতূহল ভরে তারা লক্ষ্য করলেন, এরা স্থির নয়। গতি যুক্ত হয়ে এরা আকাশপটে আবর্তন করে চলেছে। সূর্য, চন্দ্র যেমন, আকাশে চোখ তুলে তাদের যেমন দেখি, চলেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, যত তারা দেখা যায় আকাশ জুড়ে, সে সব তারাও ওরকমই। চোখে দেখা তাদের পথ পূর্ব থেকে পশ্চিম অভিমুখে! সূর্যকে সকাল ৯টায় পূর্ব আকাশে যেখানে দেখছো বারোটার সময়ে সে সেখানে থাকে না। তখন সে মাথার

উপরে। বেলা তিনটেয় সে পশ্চিম আকাশে অনেকটা নেমে যায়। পূর্ণিমার চাঁদকে আমরা দেখছি সন্ধ্যা ৬টায় পূর্ব আকাশে দিগন্তের কাছাকাছি। রাত গভীর হয় আর সে উঠে আসে মাথার উপরে, শেষ রাতে সে পশ্চিম গগনে। তারাও সেরকম। একটি উজ্জ্বল তারা দেখে রাখো মাথার উপরের আকাশে। সময় যত পার হবে দেখবে সে তারা তত সরে যাবে আকাশের পশ্চিমদিকে।

কিন্তু, একই তারাকে কি রোজ সন্ধ্যায় একই সময়ে তুমি মাথার উপরে দেখতে পাবে? ধরো, একদিন একটি উজ্জ্বল তারাকে সন্ধ্যার এক নির্দিষ্ট সময়ে তুমি মাথার উপরে লক্ষ্য করলে? তারপর রোজ তারাটিকে তুমি একই সময়ে লক্ষ্য করো! কি দেখবে তুমি? অবাক হয়ে তুমি দেখবে, তারাটি রোজ একটু একটু করে পশ্চিমদিকে সরে যাচ্ছে। এত সামান্য সরে যে, একদিনের সরে যাওয়াটা তুমি বুঝবে না। কিন্তু দিনের পর দিন, সন্ধ্যার একই সময়ে যদি তুমি সেই উজ্জ্বল তারাটিকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করো, তাহলে পনেরো দিন বা এক মাস বাদে তুমি দেখবে তারাটি অনেকটা পশ্চিমদিকে সরে গেছে। তাহলে বরাবর যদি রাতের আকাশের হিসেব রাখো তখন কোনো একটি উজ্জ্বল তারকাকে রাতের একটি নির্দিষ্ট প্রহরে আকাশের একটি বিশেষ অঞ্চলে দেখতে পাবে না। অথচ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাতের এক বেঁধে দেওয়া ক্ষণে আকাশপটে একটি বিশেষ তারা একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে। রাতের কোনো বেঁধে দেওয়া সময়ে ওই তারা আর তার অবস্থান একটা বিশেষ ঋতুকেই নির্দেশ করবে। প্রাচীন কালের আকাশ পর্যবেক্ষকেরা ঋতুর হিসেব রাখতেন এই সূত্রকে অবলম্বন করে। অনেকদিন ধরে আকাশ দেখে দেখে তাঁরা নিশ্চয়এ রকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকবেন যে, আকাশে যখন ওই উজ্জ্বল তারাটা দেখা যায়, সন্ধের অন্ধকারে বা রাতের গভীরে উত্তর বা দক্ষিণ দিগন্তে, সেই সময়েই বর্ষণ নামে আর কালচক্রে প্রত্যেকটি বর্ষা নামার আগেই ওরকম হয়।

প্রাচীনকালে সমস্ত উন্নত দেশেই কৃষির প্রয়োজনের সময়ের হিসেব রাখার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন্ করা হত। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায়, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায়, সমৃদ্ধির অন্যতম কারণও জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োগ। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি সেখানে গড়ে উঠেছিল। প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যাকে ভিত্তি করে।

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যজাতির মত বৈদিক যুগের ভারতীয়েরাও কৃষির জন্যেই মাস,

ঋতু, বছরের হিসেব রাখবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে বিবর্তন তাতে কৃষির চেয়ে পূজা-পার্বন, যাগ-যজ্ঞ আর ধর্মানুষ্ঠানই বড় ভূমিকা পালন করেছিল।

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। এই গ্রন্থেই আমাদের দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার কিছু কিছু আভাষ আছে। প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং আকাশ পর্যবেক্ষকেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু তারা দেখেননি, তারায় তারায় তাঁরা এক একটি মণ্ডলেরও কল্পনা করেছিলেন। এইরকম বিখ্যাত মণ্ডল সপ্তর্ষি আছে উত্তরের আকাশে, অনেকটা জায়গা জুড়ে। সপ্তর্ষি মানে সপ্ত ঋষি। এক একটি উজ্জ্বল তারা এক একটি ঋষির মত। ফাল্গুন, চৈত্র মাসে সন্ধ্যার অন্ধকারে এখনও সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখা যায় উত্তরের আকাশে। ঋগ্বেদেও, এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের কথা বলা হয়েছে (১।২৪।১০)। শুধু তারা বা তারকামণ্ডল নয়। ঋগ্বেদে কিছু কিছু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথাও আছে।

সূর্যের বর্ণচ্ছটায় আমরা কটা রং দেখি? নিশ্চয়ই সাতটা রং। ঋগ্বেদে সূর্যের সপ্তরশ্মির বর্ণনা আছে (৮/৭২/১৬)। ঋগ্বেদের এই বর্ণনা লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই এ রকম একটা সিদ্ধান্ত করতে পারব যে, আধুনিক যুগের আবিষ্কার সূর্যের আলো ৭টি বর্ণযুক্ত—বহু প্রাচীনকালেই ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন।

ঋতুনিয়ন্ত্রণ করে কে? সবাই জানে সূর্য। সূর্যই যে ঋতুনিয়ন্ত্রণ করে ঋগ্বেদে কিন্তু তারও পরিচয় আছে (১ ১৫।৩)। প্রথমদিকে বৈদিক হিন্দুরা ৩০ দিনে ১ মাস আর ১২ মাসে ১ বছর ধরে সময়ের হিসেব রাখতেন। তাহলে ৩৬০ দিনে ১ বছর।

মহাকাশে চাঁদকে নিয়েই প্রথম মাস গণনা শুরু করা হয়। সূর্যকে কাজে লাগিয়ে একটা দিনের হিসেব রাখা খুবই সহজ। কিন্তু প্রথম দিকে সূর্যকে নিয়ে মাস গণনা ততটা সহজ ছিল না। মহাকাশে চাঁদ কখনো একেবারে অদৃশ্য, তখন অমাবস্যা, যখন সে আবার পূর্ণাকারে আসে, তখন পূর্ণিমা। সেকালের আকাশে দর্শকেরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, একটা অমাবস্যা বা পূর্ণিমা থেকে পরের অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়কাল প্রায় ২৯½ দিন। এই সময়সীমাই হচ্ছে ১ মাস। প্রাচীন ভারতে চন্দ্রকে চন্দ্রমস্ বলা হত। এই চন্দ্রমস্ থেকে মাস শব্দটি আসে।

কিন্তু চাঁদকে কাজে লাগিয়ে বছরের যে হিসেব পাওয়া যায়, তাতে আবার ঋতুর সময়ের হেরফের ঘটে। অথচ ঋতুর খবরের বিশেষ দরকার।

তখন সূর্যের কথা এল। সূর্য ও চন্দ্র রোজ পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে নক্ষত্রদের ভেতর দিয়ে। কিন্তু এদের পূর্ব অভিমুখী আর একটা গতি আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই গতির কথাও জানতেন। কোনো একটি তারার পটভূমিতে যদি সূর্যের হিসেব নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে রোজ সেই তারা থেকে একটু করে পশ্চিমদিকে সরতে সরতে ৩৬৫ দিনে আর কয়েক ঘণ্টায়, ঠিকমতো বললে, ৩৬৫¼ দিনে সূর্য আবার সেই তারায় ফিরে আসে। কিন্তু বৈদিক কালের এ দেশের আকাশ পর্যবেক্ষকেরা ৩৬৫¼ দিনে বছর না ধরে ৩৬০ দিনে বছর ধরেছিলেন। ২৯½ দিনে ১ চান্দ্রমাস হলে ৩৫৪ দিনে ১২ চান্দ্রমাস। ৩৫৪ দিনে চন্দ্রকে কেন্দ্র করে বছরের হিসেবের চেয়ে ৩৬০ দিনে সূর্যের ভিত্তিতে বছরের হিসেব আর একটু ভাল হিসেব। কিন্তু এ হিসেবকে একেবারে নিখুঁত হিসেব বলা চলল না। ১ বছরে ৫¼ দিনের বা পূর্ণসংখ্যায় ৬ দিনে তফাৎ রয়ে গেল। যদি ৩৬৫¼ দিনকে ৩৬৬ দিন ধরি, তাহলে ৩৬০ দিনে বছরের হিসেবে ৫ বছরে ১টা মাস বেশি আসবে। এই বেশি মাসের নাম অধিমাস।

বৈদিক সাহিত্যে চান্দ্রমাস এবং সৌরমাস—দুই ধরনের নামের উল্লেখই আমরা দেখতে পাই। বৈদিক সাহিত্যে যেখানে ৬টি ঋতুতেই ঋতুচক্র সম্পূর্ণ হয়েছে, সেখানে বসন্ত ঋতুই প্রথম ঋতু। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, মধু ও মাধব বসন্ত ঋতুর মাস। শুক্র ও শুচি গ্রীষ্ম ঋতুর মাস, নভস্ ও নভস্য বর্ষা ঋতুর মাস, ঈষ ও ঊর্জ শরৎ ঋতুর মাস, সহস্ ও সহস্য শীত ঋতুর মাস এবং তপস্ ও তপস্য হেমন্ত ঋতুর মাস। চান্দ্রমাসের নামগুলি ছিল এখনকার মতনই। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র। কিন্তু বৈশাখ মাসেই বছর শুরু হতো না। বৈশাখের আগে ছিল চৈত্র মাসে বছরের শুরু, তারও আগে ছিল ফাল্গুন মাসে। চৈত্র, বৈশাখে যে বসন্ত ঋতু প্রাচীন ভারতের অনেক গ্রন্থেই তা পাওয়া যায়।

তবু আরও প্রশ্ন মনে আসে। একটা মাস শেষ হয়ে আর একটা মাস শুরুর হিসেব করা হত কি ভাবে? তা ছাড়া মাসের নামগুলি এল কি ভাবে? কি ভাবে এল বৈশাখ, কি ভাবে চৈত্র, কি ভাবে জ্যৈষ্ঠ?

সূর্য আর চাঁদ তাদের রোজকার পশ্চিমদিকের গতি ছাড়া তারাদের ভেতর দিয়ে যে আলাদা আলাদা পথে মহাকাশ ঘুরে আসে, সে দুটো পথ দুটি জ্যোতিষ্কের বেলাতেই বরাবরের মত একেবারে নির্দিষ্ট। সূর্যের এক পথ, চাঁদের পথ সেই পথ থেকে সরে গেছে। কিন্তু সেই সরে যাওয়া একেবারেই সামান্য। ফলে চাঁদ আর সূর্যের পথকে, প্রায় একই বৃত্ত হিসেবে মনে করা যায়। সূর্যের এই আপাত পথকে বলা হয় রবিমার্গ বা ক্রান্তিবৃত্ত, ইংরেজি নাম Ecliptic। প্রাচীনকালের ব্যাবিলনীয়,

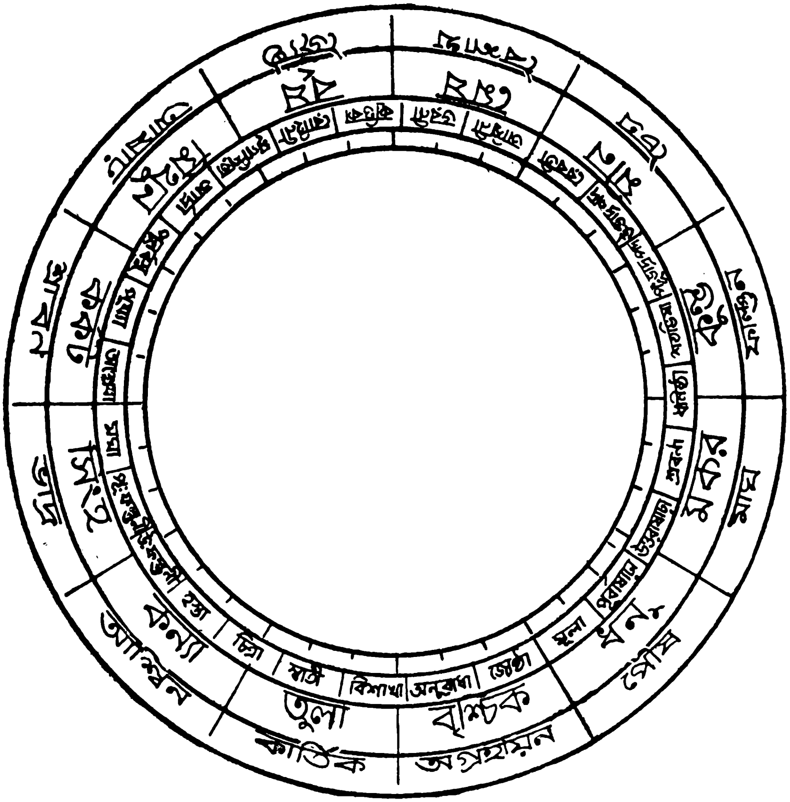

মিশরীয় এবং চৈনিক জাতির মত ভারতীয়েরা সূর্যের বার্ষিক পথটাকে তারায় তারায় বারোটি ভাগে ভাগ করেন। এক একটা ছবির কল্পনা করা হল এক এক ভাগের তারাদের নিয়ে। এরা মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। সূর্যের পথ জুড়ে বারোটি ছবিতে হল একটি রাশিচক্র। আর

মেষ, বৃষ সবাই এক একটি রাশি। ঋগ্বেদের একটি স্তোত্রে আকাশ-পথে সূর্যের আপাত-গতিকে বারোটি পাকিযুক্ত চাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সায়ণের মতে বারোটি পাকি রাশিচক্রের বারোটি রাশি ছাড়া আর কিছুই নয়। এক বছরে বা বারো মাসে সূর্য বারোটি রাশি পার হয় বলে এক মাসে এক এক রাশির প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করে। বৈদিক যুগেই হিন্দুদের বারো মাসে বছরের ধারণা থেকে বোঝা যায় যে, বৈদিক হিন্দুরা রাশির সঙ্গে পরিচিত ছিল।

এই রাশিচক্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। কে বা কোন্ জাতি এই রাশিচক্র আবিষ্কার করেন? কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, ব্যাবিলনীয়েরা রাশিচক্র আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এ কথা সুনিশ্চিত করে বলা কঠিন। আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সূর্যসিদ্ধান্ত। এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ব'র্জেস। তিনি বলেন, রাশিচক্র সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়দের জ্ঞান সমসময়ের যে কোনো প্রাচীন জাতির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়; কিন্তু অগ্রাধিকারের প্রশ্ন যদি ওঠে, তাহলে অন্যান্য জাতির অন্তত কয়েক শত বছর আগে ভারতীয়েরা যে রাশিচক্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিল, সন্তোষজনক প্রমাণের অভাব থাকলেও তার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

রাশিচক্রে সূর্যের গতি ঠিক করবার জন্যে তাকে বারোটি অংশে ভাগ করা হয়। এবার চাঁদের গতি সহজে ঠিক করবার জন্যে রাশিচক্র আর চন্দ্রপথের সামান্য পার্থক্যের জন্য রাশিচক্রকেই ২৭ ভাগে ভাগ করা হয়। কেন ২৭ ভাগে? কারণ পূর্বমুখী গতিতে চাঁদের তারকাপুঞ্জের ভেতর দিয়ে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করতে সময় লাগে ২৭⅓। তাহলে চাঁদের গতি নির্ণয় করবার জন্যে পণ্ডিতেরা ২৭⅓ দিনের সামঞ্জস্যপূর্ণ ২৮টি তারকাপুঞ্জ স্থির করেন। প্রতিটি তারকাপুঞ্জই চাঁদের এক একটি আবাসস্থল আছে চাঁদের পথের উপরে, পুরো পথ জুড়ে। পণ্ডিতেরা এই ২৮টি আবাসস্থলকে গণনার সুবিধার জন্যে পরে ২৭ ভাগে স্থির রাখেন। প্রতিটি ভাগের উপরে এক একটা তারকাপুঞ্জকে এক একটা নক্ষত্র নামে ডাকা হয়। এই ২৭টি নক্ষত্রের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরআষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী। চন্দ্র

২৭ দিনের প্রত্যেক দিনে এক একটা নক্ষত্র পার হয়ে যায়।

বারো রাশি আর ২৭ নক্ষত্রের কথা বলার পরেই আমরা বাংলা মাসের নামের কথা বুঝতে পারি। বৈদিক যুগে পূর্ণিমার পরের দিন থেকে এক একটি চান্দ্রমাসের শুরু ধরা হতো এবং মাস পূরণ হতো পূর্ণিমায়। রাশিচক্রের উপরে সাতাশটি নক্ষত্র আছে। যে নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হচ্ছে সেই নক্ষত্রের নামে মাসের নাম স্থির থাকতো। ধরা যাক, বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হচ্ছে। তাহলে তার পরে যে মাসের শুরু হচ্ছে তার নাম বৈশাখ। জ্যৈষ্ঠ মাসের নাম এল কি ভাবে? জ্যৈষ্ঠ নাম এল জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র থেকে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হওয়ার পরে যে মাস শুরু হচ্ছে তার নামই জ্যৈষ্ঠ। আষাঢ় নাম এল পূর্বাষাঢ়া থেকে। শ্রবণা নক্ষত্র থেকে শ্রাবণ, পূর্বভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন। তাহলে বাকি রইল আরও ছটা মাসের নাম। কার্তিক মাস কৃত্তিকা থেকে, মৃগশীর্ষ থেকে অগ্রহায়ণ, পুষ্যা থেকে পৌষ আর মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র যথাক্রমে মঘা, উত্তরফাল্গুনী আর চিত্রা থেকে।

চান্দ্রমাসে সময় গণনার কালে মাসের নামগুলি এসেছিল আর তা এসেছিল ওই-ভাবেই। কিন্তু বারো চান্দ্রমাস তো ৩৫৪ দিনে শেষ হয়ে যায় আর সৌর বর্ষে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন। ঋতু নিয়ন্ত্রণও করে সূর্য। ফলে চান্দ্র বর্ষে ঋতুর হিসেব ঠিক রাখা গেল না। এল সৌরমাস আর সৌরবর্ষ। বিভিন্ন রাশিতে সূর্যের আসার সঙ্গে সঙ্গে নতুন মাসের গণনা আরম্ভ হল ঠিকই, কিন্তু মাসের নাম বদলানো হলো না। কেন নয়? কারণ পূর্ণিমার সময়ে সূর্য রাশিচক্রে চাঁদের ঠিক উল্টোদিকে থাকে। তাহলে বিশাখা নক্ষত্রে যখন পূর্ণিমা, তখন সূর্য উল্টোদিকে মেষ রাশিতে আসছে। আবার কৃত্তিকা নক্ষত্রে যখন পূর্ণিমা, তখন সূর্যের অবস্থিতি তুলা রাশিতে। সেই জন্যে যে নক্ষত্র থেকে প্রথমে চান্দ্রমাসের নামকরণ হয়েছিল, সেই নক্ষত্রের নামেই সৌরমাসটিকে নির্দিষ্ট করা হল।

বৈদিক যুগের মানুষেরা কি গ্রহদের কথা জানতেন? সূর্য, চন্দ্র সম্বন্ধে বেদে অনেক উল্লেখ আছে। রাহু, কেতুর কথা বাদ দিলে আর পাঁচটি গ্রহ থাকে। অনেকে মনে করেন, বৈদিক ঋষিরা পাঁচটি গ্রহের কথাই জানতেন। ঋগ্বেদে একটি সূক্তে (১।১০৫।১০) 'এই যে পঞ্চ অভীষ্টদাতা বিস্তীর্ণ আকাশে আছেন' কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে। এই পঞ্চ অভীষ্টদাতা কি পঞ্চ গ্রহ? মনে হয় তাই। বেদে পঞ্চগ্রহের পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ থাকলেও শুক্র এবং বৃহস্পতি সম্পর্কে তখনকার ঋষিরা

নিশ্চয় সচেতন ছিলেন। ঋগ্বেদে বৃহস্পতি শব্দটি অনেক জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। (৩।৪৩ ১২) ঋতে বৃহস্পতির অনেক বিশেষণ আছে। সে সব বিশেষণ বৃহস্পতি গ্রহের বিবরণের সঙ্গে মিলে যায়। ঋগ্বেদে (১০।১২৩।১) একটি দেবতার কথা আছে, তাঁর নাম বেন। বলা হয়েছে, ইনি জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত আর আকাশে দীপ্যমান। এই বেন দেবতাই শুক্রগ্রহ। বেনের সঙ্গে শুক্রগ্রহের ইংরেজি Venus এর মিল দেখা যায়।

ভারতীয় জ্যোতিষের উপরে সবচেয়ে পুরাতন বই কোন্‌টি। এটির নাম বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। বৈদিক যুগের শেষভাগে এটি রচনা করা হয়। (খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০ অব্দের মধ্যে)। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে হিন্দুরা ৩৬০ দিনে আর বছর গণনা করতেন না। তখন বছর গণনা করা হত ৩৬৬ দিনে। ৩৬০ এর বদলে ৩৬৬ দিনে বছর নিশ্চয়ই বছরের গণনায় আরও উল্লেখ করবার মত অগ্রগতি।

বেদ ও বেদাঙ্গ যুগের পরে বেশ কিছুকাল আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানে অন্ধকারযুগ। প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ বছর ধরা যায়, এই সময়ের রচিত কোনো পুঁথিই কিন্তু ঐতিহাসিকদের হাতে এসে পৌঁছোয় নি। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানে সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি লেখা হয়েছিল খ্রীস্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে। এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ মূল্যবান।

আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানে কয়েকজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা হলেন আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মুঞ্জাল, শতানন্দ ভাস্করাচার্য (দ্বিতীয়)।

আর্যভট জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে, তিনি আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আর্যভটীয় নামে একটা অত্যন্ত বিখ্যাত বই লেখেন। আর্যভটকে যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়, তেমনি ভাস্করাচার্যকে বলা যায় ওই পর্বের সর্বশেষ জ্যোতিষ্ক। তিনি শুধু সর্বশেষ নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ১১১৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখেন, অতি বিখ্যাত বই, নাম সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

প্রদীপ নেবার আগে যেমন দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, ভাস্করাচার্য ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে অনেকটা ওইরকম। তাঁর পরেই আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসের ওপরে অন্ধকার নেমে আসে।

গবেষক

অলক চক্রবর্তী

যখন কোন জিনিস আমার থাকে কিন্তু আর কারোর থাকে না তখন মনে বেশ অহংকার হয়, তাই না ? তারকবাবুর বাড়ি টি. ভি আছে, উনি যেন মাটি থেকে চার ইঞ্চি উঁচু দিয়ে চলেন। কিন্তু যেই পাড়ায় আশে পাশে সকলেই কিনে ফেললেন নানা কোম্পানীর নানা ধরনের টি.ভি. তখন তারকবাবু একেবারে মাটিতে। বেশ একটু উঁচুতে ছিলেন তিনি এখন জনগণের সমান হয়ে গেলেন। তবুও সুযোগ সুবিধা পেলে ঠোককর দিতে ছাড়েন না। আপনারা বেশ সস্তাতেই পেলেন, এখন টি.ভি. পার্টস্ কত সস্তা ইত্যাদি।

আমারও এইরকম একটা গর্ব করার জিনিস ছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের তুলনায় নিজেকে বেশ বড়লোক মানে কেউ কেটা বলে মনে করতাম। কিন্তু হায়, বছর খানেক হলো সে সুখ হারিয়েছি। এখন প্রায় সকলেই সমান।

আমি লোড-শেডিং এর কথা বলছি। আমি যে এলাকায় থাকি সেটা হচ্ছে একটা বাজারের পিছনে তস্য তস্য ছোট গলি। গত পাঁচ-ছ বছর ধরে আমার এই অঞ্চলে লোডশেডিং আর ইলেকট্রিক বিল দুটো যথাক্রমে সমান্তর আর গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়ছিল। পথেঘাটে, অফিসপাড়ায় কোথাও আমি উপস্থিত থাকলে এবং লোডশেডিং-এর কথা উঠলেই সকলে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বলতো, 'ভূপতিবাবু, আপনার অঞ্চলে একবার লোডশেডিং-এর ঘটাটা বলুন তো।'

সমাজে আমার একটা আলাদা পোজিশন ছিল। হায়, হায় আজ আর তা নেই আজ সকলেই লোডশেডিংএর সমান মালিক হয়ে গেছে। আর আমি শ্রী ভূপতি খাসনবীশ কৌলিন্য হারিয়ে একেবারে পথে বসে গেছি।

অথচ—

অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত এরকম ছিল না। বেপাড়ার ছেলেরা আমার কাছেই ছুটে আসত। 'লোডশেডিং' সম্বন্ধে রচনা লিখতে কয়েকটা পয়েন্ট চাই। কই কতো তাবড় তাবড় ব্যক্তি তো এদিক ওদিক থাকেন, তাঁদের কাছে তো কেউ যেতো না। আসতো এই শর্মার কাছেই। আমিই তাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট দিয়েছিলাম, 'তড়িৎ বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান লোডশেডিং'। তড়িৎ না থাকলে তো আর লোড-শেডিং-এর কথা উঠতো না, 'তোমরা কি বল?'

একবার আমাদের পাড়ায় একটি ছোট ছেলে, তার নাম হাবলা, আমায় জিগ্যেস্ করেছিল 'আপনি তো নিজেকে লোড-শেডিং বিজ্ঞানের বিশারদ হিসাবে ভাবেন, বলতে পারেন লোডশেডিং-এর বাবার নাম কি?' কি ফচকে ছেলেরে বাবা! রেসের ঘোড়াকে দিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ি টানাবার মতলব? আমি তাকে বলেছিলাম, 'এটা খুব মামুলি প্রশ্ন গোপাল—সকলে জানে। লোডশেডিং-এর বাবার নাম কেবল ফল্ট।'

উত্তরটা শুনে ঐ হাবলা খুশি হয়েই চলে গিয়েছিল, ঠাকুরদাদার নামটা না জিগ্যেস করেই।

এহেন আমি, শ্রীভূপতি খাসনবীশকে একবারে নভিস্ করে ছেড়ে দিলেন শ্রী এন্. সি. তলাপাত্র!

হ্যাঁ শ্রী এন. সি. তলাপাত্র, বি এসসি (ডিস্টিংশন) আই. এসসি. (সেকেণ্ড ডিভিশন) ম্যাট্রিকুলেশন (থার্ড ডিভিশন্)।

নামের পাশের উপাধিগুলি তাঁরই ছাপা প্যাড থেকে পেয়েছি। গুণীলোক সন্দেহ নেই কারণ তাঁর পাল্লায় পড়ে আমার যা হাল হয়েছিল—

না, মাঝখান থেকে আরম্ভ করলে ঠিক হবে না। শুরু থেকেই শুরু করি।

প্রতি বৃহস্পতিবার আমার অঞ্চলে বিকেল চারটে থেকে আটটা পর্যন্ত লোড-শেডিং হয়। একটা তেতলা বাড়ির এক তলার একটা কোণের ঘরে আমরা থাকি। আমরা মানে আমি, কয়েকটা ইঁদুর, কয়েক গণ্ডা টিক্‌টিকি, কয়েকশো আরশোলা, আর কয়েক হাজার মশা। সংসারে আমার কোন উপদ্রব নেই নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। কত লোককে শুনেছি রক্তদান করতে ব্লাড ব্যাঙ্কে যেতে হয়, আমি বাড়ি বসে সেই সুখ পাই। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর কি!

তখন সন্ধ্যা ছটা হবে। আমার বন্ধু মশারা তখন পূর্ণমর্যাদায় আমার পদসেবা করছে, আর আমি খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে পায়ের পাতা ছুটো চুলকে একটু মৌজ করছি।

খট্, খট্, খট্।

দরজাটা খোলাই ছিল। আগন্তুক আওয়াজ করে, নিজগুণে হাত দিয়ে দরজাটা খুললেন এবং নিজগুণে সরসর করে ঘরের মধ্যে এসে সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন।

ঘরে আমার একটা নড়বড়ে টেবিল আর ছুটো চেয়ার। একটাতে তো আমি বসে আছি। উনি সামনেরটাতে বসলেন। আমি মৌজ ভঙ্গ করে তাঁর দিকে ভাল করে তাকাবার আগেই তিনি বললেন—'সো ইউ আর মিঃ খাসনবীশ।'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। মৌজটা ভেঙ্গে যাওয়াতে একটু বিরক্ত যে হইনি একথা হলফ্ করে বলতে পারব না, তাছাড়া সারা দিনমানে একটু জীব সেবা করি, সেটাও—

—'আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা আছে।' আমার চিন্তা-তরঙ্গে তাঁর কথাকটার ঢিল ছুঁড়ে মারলেন তিনি।

চোখ তুলে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম, বেশ বয়স হয়েছে। সত্তরের উপরে তো হবেই। ভীষণ রোগা, চোখে সরু চশমা। ঢোলা প্যান্ট, ঢোলা ফুল হাতা সার্ট, ঘেমে প্যাচ প্যাচ করছে। গলায় সরু একটা টাই ঝুলছে। হাতে বিরাট ব্যাগ এবং একটা ছাতা। লক্ষ্য করে দেখলাম ছাতায় কয়েকটা তালি। তালি দিতে যে কাপড়টা ব্যবহার করা হয়েছে সেটার রঙ আর জামার কাপড়ের রঙ একই বলে মনে হলো। আর হ্যাঁ, কোমর বন্ধনী আছে মানে বেলট। সরু একটা বেলট কোমরে ছুবার ঘুরিয়েও কিছুটা অতিরিক্ত।

'একটু বসুন' বলে আমি উঠলাম। তাকের উপর থেকে একটা লম্প নিয়ে বেশ খানিকটা লম্ফ জম্ফ করে সেটাকে জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখলাম। আলো অবশ্যই হল না, লাভের মধ্যে থেকে হয়তো অন্ধকার মনে মনে হাসলো। আমার অবশ্য প্রায়ান্ধকারেই চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোকের এই আলোতে অসুবিধা হবে ভেবে মুখটা একটু কাঁচুমাচু করে বললাম, 'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না! আর আমাকেও আপনি, মানে, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

—'সিট ডাউন, সিট ডাউন, সব আপনাকে বলছি। আপনার সঙ্গে আমার

ট্রেডের মিল হবে, আমরা যৌথভাবে একটা বিস্ময়কর, চমকদার, চমৎকার কিছু করবো।'

আমার ট্রেড—মানে ব্যবসা ? আমার তো কোন ব্যবসাই নেই। কিছু না করাই আমার ব্যবসা। হাঁ করে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। হয়তো হাঁ-এর বহরটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, তাই আগন্তুক ভদ্রলোক একটু সদয় হলেন।

—'আপনাকে সব বলছি ডিটেলড্, আপটুদি ফাইনেট।' তার পর একটু থেমে বললেন, 'কথায় কথায় ইংরাজী বলি, আমি বিলাত ফেরৎ কিনা। আপনি আমার নাম শোনেন নি ? আই অ্যাম মিষ্টার এন. সি. তলাপাত্র বি. এসসি (ডিস্টিংশন) আই. এসসি (সেকেণ্ড ডিভিশন) ম্যাট্রিকুলেশন্ (থার্ড ডিভিশন)। আমাদের যুগে ম্যাট্রিক থার্ড ডিভিশন আজকের ঐ আই এসসি, হায়ার সেকেণ্ডারী এসবের ফার্ষ্ট ডিভিশনের সমান। আমার যুগের আই. এসসি সেকেণ্ড ডিভিশন মানে কি জানেন? আজকালকার বি. এসসি অনার্সের ফার্ষ্ট ক্লাশ, তখনকার বি. এসসি ডিষ্টিংশন মানে জানেন ?

—'হ্যাঁ আজকালকার এম. এসসি তে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম', আমি বেশ বিজ্ঞের মতো বলি।

—'খানিকটা হয়েছে সবটা নয়। ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট, ইট ইস্ অল রাইট বাট ইন থ্রি সাবজেক্টস্ সাইমাল টেনিয়াসলি—এক সঙ্গে। ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স। যাক নিজের সম্বন্ধে বেশি প্রশংসা করব না, আমার জ্ঞানের পরিচয় আপনি নিজে নিজেই জানতে পারবেন।'

তারপর বুক পকেটে হাত দিয়ে কি যেন বার করতে গিয়ে আপন মনেই বললেন 'বুক পকেটটাতো নেই। নো মোর! ছাতাটাতে তাপ্পি দিতে কাপড়ের দরকার হলো, পকেটের কাপড়টা কেটে ছাতায় আটকে দিয়েছি। এর ফলে সেভড্ ইন টুওয়েজ। একটা হলো ছাতাটা মেরামত হয়ে গেল আর একটা হল কেউ পকেট কাটতে পারবে না। নিজেই নিজের পকেট কেটে বসে আছি।'

আমি নির্বাক, অবাক, হতবাক, বাকশক্তি রহিত হয়ে গেলাম।

—'আমার নীতি মশাই ওয়েষ্ট নট্ ওয়াণ্ট নট। আপনি কি বলেন ?'

ইসারা করলাম। ঐ একই কথা বলি।

—'বলবেনই তো। আপনার মুখ চোখ দেখেই বুঝেছি, আপনি খুব বিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার বয়স আটাত্তর, বিশ বছর ধরে পেনসন পাচ্ছি সেণ্ট্রাল গভর্মেণ্টের।'

—'বিশ বছর? কেন্দ্রীয় সরকারের এতবড় সর্বনাশ'। মুখ ফসকে কথা কটা বেড়িয়ে গেল।

—'কি বললেন সর্বনাশ? বলেই বাঁ হাতের ছাতাটা তুলে আমায় মারতে আসেন আর কি।

—'না, না, আমি কি বলতে চাইছি, আপনি বুঝতে পারেন নি। আমি বলছিলাম আপনার রিটায়ার করার সময় মূল বেতন তো অনেক কম ছিল, তাই পেনসনের পরিমাণ তো খুব কম।' কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কথাগুলি বলি।'

—'ঠিক বলেছেন, তাই তো এই বৃদ্ধ বয়সেও রোজগারের ধান্ধায় বেরুতে হয়। ছাত্র ছাত্রী পড়াই মশাই, যাকে বলে টিচিং, এ নোব্‌ল্ প্রফেশন্'।

—'হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছেন, বর্তমান বাজারে এইটাই একমাত্র চাকরী যেখানে নো ওয়ার্ক ফুল পে।'

কথাগুলি তাড়াতাড়ি বললাম যাতে মি. তলাপাত্র পরিষ্কার করে সব বুঝতে না পারেন। বুঝলেই তো আবার ছাতি পেটা। আমার নিজের ছাতি তিরিশ, ফোলালে আটাশ, এর ভরসায় বিশেষ কিছু করা যায় না।

কথাগুলি সত্যিই তলাপাত্র সাহেব শুনতে পান নি। নিজের মনেই সরু লিকলিকে টাইটাকে টাইট আর ঢিল, ঢিল আর টাইট করতে করতে বললেন, 'আপনার পাড়াতেই একটা ছেলেকে পড়াই। ছেলেটা পড়াশুনোয় ভালো, তবে বড্ড ফচকে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের আর কি শ্রদ্ধা ভক্তি আছে? সে ছিল আমাদের আমলে, গ্রীফিথ সাহেব ক্লাশে এলেন, আমরা উঠে দাঁড়ালাম—'

তাঁর কথার মধ্যেই খুব তাড়াতাড়ি বলি, পুরো পিরিয়াডটাই তো?'

এবারও মি. তলাপাত্র আমার কথা শুনতে পেলেন না। দু দুবার পরীক্ষা করে বুঝলাম, ভদ্রলোক কানে একটু কম শোনেন মতান্তরে ছোট কথা কানে নেন না।

গ্রীফিথ সাহেবের কাহিনী শোনার আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তাই পরিষ্কার করে বললাম, ছেলেটাকে ফচকে বললেন কেন?'

—'ফচকেকে ফচকে বলব না তো কি মানকে বলবো? আরে মশাই, সেদিন আমার প্যান্টের পকেটে একটা সিগারেটের প্যাকেট আট্‌কে দিয়েছে সেফটি পিন দিয়ে। অত লক্ষ্য করিনি, রাস্তায় দেখি দু একটা লোক আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। বুঝুন ব্যাপারটা! আমি হলাম গিয়ে মি. এন. সি. তলাপাত্র, বিলাত ফেরৎ'—

—'তাছাড়া বি. এসসি ডিষ্টিংশন, আই এসসি সেকেণ্ড ডিভিশন, ম্যাট্রিকুলেশন থার্ড ডিভিশন।'

—হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। হিম্মৎটা বুঝুন। জাষ্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। রেগে গেলাম মশাই, ভীষণ রেগে গেলাম। দুবার আমার টাইটাকে দুলিয়ে তেড়ে গেলাম তাদের কাছে। জিগ্যেস করলাম হাসার কারণটা কি? তারা আমার প্যান্টের পকেটটা দেখিয়ে দিলো। দেখি সেফটি পিন দিয়ে ঝুলে রয়েছে সিগারেটের প্যাকেটটা।

তখনি চিন্তা করে নিলাম। জাজমেণ্ট—ইয়েস জাজমেণ্ট।

বাধা দিলাম আমি।

—'কি করলেন? ছেলেটির বাবাকে গিয়ে বলে দিলেন?'

—'দূর মশাই, আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, সিগারেটের প্যাকেটটা রেখে দিলাম। পরের দিন উনুন ধরানোর কাজে একটু তো খবরের কাগজ কম লাগবে। আর সেফটিপিনটা টাকার ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখলাম, কত সময়ে জামার বোতামটোতাম ছেঁড়া থাকে—আপদে বিপদে কাজে লাগবে, বুঝলেন না, ওয়েষ্ট নট ওয়াণ্ট নট।'

মাথাটা ঘুরে গেল। সাজ্ঘাতিক ভদ্রলোক। পিঁপড়ের ইয়ে টিপে গুড় বের করে খাবার লোক। গুম হয়ে গেলাম। ভদ্রলোকও একটু দম নিলেন।

—'ঐ ছাত্রটিই আমায় বললো, আপনি নাকি গবেষণা করেন, ইলেকট্রিসিটি নিয়ে?'

—'গবেষণা করি? আমি!! না মশাই আমি ওসব ঝামেলায় নেই। ভুল শুনেছেন।'

—'সেকি? ছেলেটি যে বললো, এ পাড়ায় আপনি ইলেকট্রিসিটি নিয়ে গবেষণা করে নাকি বিখ্যাত হয়ে গেছেন?'

—'কে বললো? ছেলেটির নাম কি? আমি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। কে আমার এতবড় সর্বনাশ করলো?

—'ছাত্রটির ভাল নাম তো জানি না, তবে তার বাবা হাবলা, হাবলা করে ডাকে।

আমার মাথাটা কেমন যেন করে উঠলো। পাড়ার সেই ছেলেটা! যেটা আমায় লোডশেডিং-এর বাবার নাম জিগ্যেস করেছিল। আচ্ছা ব্যাটা আমায় চেনো না। আমি হলাম ভূপতি—আমায় করবে ভূপতিত? মুখে বললাম, 'কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। ইলেকট্রিসিটি একটা বিরাট বড় সাবজেক্ট। বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, কণ্ট্রাক্টর, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সকলেই এর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করছেন। আমি এরই একটা ছোট্ট অংশের উপর কাজ করছি। ইলেকট্রিসিটি বি-রা-ট বড় মহীরূহ। তার কাণ্ডের মধ্যেই কতো কাণ্ডকারখানা। তারপর তার শাখা প্রশাখা। স্টেট ব্যাঙ্কের যে এতোগুলি ব্রাঞ্চ সারা ভারত জুড়ে—এর কাছে তো নগণ্য।' কথাগুলি শেষ করে মিঃ তলাপাত্র বি. এসসি ডিষ্টিংশন ইত্যাদি, ইত্যাদির দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাইলাম।

—'তা আপনার গবেষণা ইলেকট্রিসিটির কোন্ অংশের উপর?'

আস্তে কথা বললে তলাপাত্র সাহেব শুনতে পান না সেটা আগেই বুঝে গেছি তাই গলা নামিয়ে বললাম, 'লোডশেডিং।'

কি শুনলেন তিনি ভগবান জানেন। বললেন, 'ফেডিং? ফেডিং এর উপর অনেক কাজ হয়েছে হচ্ছেও। তা এটা ঠিক কি ইলেকট্রিসিটির আওতায় ফেলা যায়? বোধহয় যায় না।' কোন উত্তর দিলাম না। আমি নিজেই ফেড হয়ে গেছি। একেবারে ফেড আউট।

—'যাক্ এতেই আমার চলবে। আমার একটা ট্রেইনড্ ব্রেন চাই। আপনাকে দিয়েই হবে। হাবলা ঠিকই বলেছিল। আমার গবেষণায় আপনি অনেক সাহায্যে আসবেন।'

—'আপনার গবেষণার বিষয় বস্তু কি?' কোনরকমে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে জিগ্যেস করলাম।

—মালটি ভেরিয়াস। বিভিন্ন ধরনের। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, তবে সব সময়ই মানব কল্যাণে, জন হিতার্থে। আলতু ফালতু নয়। ঐ যে আজকাল সব গবেষণা হয়েছে জানেন? বললেই বলে থিয়োরোটিক্যাল কাজ। কয়েকপাতা

ফালতু গুণ-ভাগ তারপর এক আজগুবি সিদ্ধান্ত। ব্যস হয়ে গেল। বলি কিছু বুঝলেন, কি বলতে চাইছি? ড্যু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

ঘাড় নাড়লাম। অসম্মতি সূচক!! অর্থাৎ বুঝলাম না!!!

—'হুঁ, সহজ করে বলি তাহলে। থিয়োরিটিক্যাল কাজগুলি কিরকম জানেন? মাসির যদি দাড়ি গজায়, তাহলে ভারত ব্লেড জেনিথ না সেভেন ও ক্লক ব্লেড কোন্‌টা উপযুক্ত হবে সেটা একগাদা অঙ্ক করে, হাতির শুঁড় মানে ইন্টিগ্রেশন করে বার করা। আরে মাসির দাড়ি গজাবেই না।'

তলাপাত্র সাহেবের বক্তব্যে বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে অন্য কথায় আসবার চেষ্টা করলাম।

—'তা আপনার গবেষণার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যদি একটু আন্দাজ দেন তাহলে—'

—'দেবো বলেই তো এসেছি। আগেই বলেছি মশাই, আমার কাজ জনাইতার্থে। যখন যে ধরনের গবেষণা করলে মানবজীবনের ঐহিক হিতসাধন হবে, তখন আমি সে ধরনের কাজ করি।' ভদ্রলোকের মুখে এইরকম বাংলা শুনে আমি হাঁ,

—ডবল হাঁ।

মিঃ তলাপাত্র সেটা বুঝে বললেন—'আমি এতো বাংলা জানিনা। বাইবেল সংক্রান্ত একটা পুস্তিকা আমার কাছে ছিল, তার থেকেই কথাকটা নেওয়া কেবল 'যীশুর পদপ্রান্তে কথা দুটো বদলে 'ব্রহ্মেলীন' করে দিয়েছি।'

—'আপনি নিজে করেছেন?' আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো।

—'না ঠিক আমি নই। বাংলার একজন প্রফেসরকে দিয়ে ঠিক করিয়ে নিয়েছি, অবশ্য সে অনেক কিছু করতে চাইছিল কিন্তু আই ডিড্ নট অ্যালায়েড হিম।'

'আপনার উল্লেখযোগ্য গবেষণার এক-আধটা নমুনা যদি'—

—'দেন? নিশ্চই দেবো নিশ্চই দেবো'—

টাইটাকে টাইট আর ঢিল, ঢিল আর টাইট করতে করতে কি যেন চিন্তা করলেন তলাপাত্র সাহেব কিছুক্ষণ। তারপর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর।

—'একেবারে লেটেষ্টটা বলি! কি বলেন?'

মাথা নাড়লাম! সম্মতি সূচক!! অর্থাৎ, হ্যাঁ বলুন!!!

—'আজকাল লক্ষ্য করেছেন ফুটবল মাঠে বেলেল্লাপানাটা ? মোহনবাগান, ইস্ট-বেঙ্গল, মহামেডান এঁদের খেলা থাকলেই ?'

—'তা দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে আপনার গবেষণার—'

—'একটু ধৈর্য্য ধরুণ, সব বুঝতে পারবেন ! এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি সম্প্রতি উচ্চমানের গবেষণা করেছি। আপনাকেই প্রথম বলছি তারপর বাজারে ছাড়বো।'

একটু দম নিলেন তলাপাত্র সাহেব।

—'আচ্ছা বলুন তো ফুটবল খেলতে গোল কি নিয়ে ?'

—'কেন ? আপনিই তো বললেন গোল নিয়ে ! কোনরকমে একটা ঢুকিয়ে তারপর ইঁট, পাটকেল, ক্ষুর, ছুরি, ব্লেড, ইত্যাদি দিয়ে……'

—'দূর মশাই। গোল মানে ট্রাব্‌ল্, অশান্তি। আসলে বাংলা ভাষাটা এত পুওর।'

—'ট্রাবল্ তো গোল নিয়েই। যেমন করে হোক আমার দলের পক্ষে গোল চাই। পেলাল্টিতে হোক, একস্ট্রা টাইম দিয়ে হোক, অফ্সাইড থেকে হোক, কোচের চেঁচানিতে বিপক্ষের গোলকিপারের পিলে চমকে হোক—'

—'আপনি ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি। পারবেন কি করে ?

তাহলেতো আপনার নাম হতো মিঃ এন. সি. তলাপাত্র'—এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয় বলেই মনে হলো। তাই বেশ চেঁচিয়েই ধরতাই দিয়ে বললাম—'বি. এসসি ডিষ্টিংশন, আই. এসসি সেকেণ্ড ডিভিশন, ম্যাট্রিকুলেশন থার্ড ডিভিশন।'

—'ইয়েস ইয়েস !! ঠিক একবারে কারেক্ট। যাক যে কথাটা বলছিলাম, ট্রাবলটা হচ্ছে বাইশটা হুমদো ছেলে বা লোক যাই বলুম সকলে মিলে একটা বলকে লাথাচ্ছে, তাই না, এ বল কাড়ছে ওর কাছ থেকে, ও তাকে ল্যাং মারছে; ইত্যাদি ঘটছে। সমাধান কি ?'

চুপ করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ। হয়তো আমি বলতে পারি কিনা সুযোগ দিলেন। আমার বিদ্যের দৌড় বুঝে নিজেই বললেন, সমাধান চাই ! আমি সেই সমাধানের আবিষ্কর্তা। বাজারে আমার সমাধান ছাড়লেই দেখবেন পত্র পত্রিকার টপ্‌এ আমার নাম।'

—'তা সমাধানটা বলুন।' আমি উদগ্রীব গ্রীবা সঞ্চালনের সাহায্যে আমার আগ্রহটা বোঝালাম।

—'সোজা ! বাইশ জনকে বাইশটা বল দিয়ে দেওয়া। নিজে নিজে খেল গোপালরা। ধাক্কা ধাক্কি, মারামারির দরকার নেই—শান্তিতে যে যার নিজের বল লাথিয়ে যাও। অবশ্য প্রথমে একটু খরচ বেশি হবে কিন্তু তাতে আর কি করা যাবে ? সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে, জনসাধারণকে ফুটবল ট্যাক্স দিতে হবে। সমস্যাটাতো মিটবে।'

ফুটবলকে কেন্দ্র করে কোলকাতার অকথ্য ঝামেলা মেটানোর এরকম গবেষণা-প্রসূত সিদ্ধান্ত আমি শুনিনি। তাই কাশি আর হাসি মিলে একটা কাহাসি ধরনের আওয়াজ বের করলাম গলা দিয়ে।

'কি রকম মনে করেন আমার থিয়োরী ? সরকার কি গা করবেন ?'

—'করাতো উচিত। যদিও একটু খরচ সাপেক্ষ, তাহলেও এর চেয়ে ভাল সমাধান আর কি হতে পারে।'

'তাহলে কি সংবাদপত্রে এটা প্রকাশ করবো ?'

—'এক্ষুণি, বিলম্বে হতাশ-বলে একটা কথা আছে জানেন তো ?'

—'না তা হবে না, শীগ্‌গিরই এর ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তার চেয়েও বড় আবিষ্কার আমার আছে। বাঙালি সংসারে আমার এই আবিষ্কার নবদিগন্তের সুচনা করবে।'

আমি একটু ভুরু কুঁচকে মিঃ তলাপাত্রের দিকে তাকালাম। তিনি কি বুঝলেন জানি না তবে বললেন, 'নবদিগন্তের সূচনা কথা দুটো ঐ বাংলার অধ্যাপক দিয়েছিলেন।

আমার ভুরু কোঁচকানোর কারণটা তলাপাত্র সাহেব ঠিকই ধরেছেন। এবার নরম ভুরু করে জিগ্যেস্ করলাম, 'গবেষণাটা কি নিয়ে।'

'ইলেকট্রনিকস্ এর ব্যাপার সাফিস্-টিকেটেড ইলেকট্রনিকস্। দাঁড়ান আপনাকে দেখাচ্ছি। লম্পটাকে একটু বাড়ান দিকি !'

আমি লম্প বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলাম আর উনি ওর ব্যাগ খুলে কতকগুলি কাগজ বার করলেন। কত কি আঁকা তাতে। না মানুষ, সাপ, ব্যাঙ হাতী, ঘোড়া এমনকি গাছপালা, নদী, নালা, পাহাড়, পর্বত কিছুই নয়।

—'এগুলি হচ্ছে সার্কিট ডায়াগ্রাম, এটা হচ্ছে জেনার ডায়োড্, এটা হচ্ছে টেন্-কে লোড, এটা পট্ টাইপ—'

আমি বাধা দিলাম।

—'দেখুন, খুলেই বলি আপনার এসব কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি বরং একটু সহজ করে অল্প কথায় ব্যাপার-স্যাপারগুলি আমায় বলুন। আমার মগজে এসব শক্ত কথা—যাকগে আমার মগজ প্রাইভেট লিমিটেড নয় ওনারশিপ ব্যবসা।' কথাগুলি আস্তে জোরে হয়েছিল বোধহয়। সব কিছু উনি পরিষ্কার করে শুনতে পান নি। তবে এটুকু শুনতে পেয়েছেন যে আমি কিছু বলতে চাইছি।

তাই আমার মুখের দিকে তাকালেন। আর তাকিয়েই বুঝতে পারলেন আমি কিসস্যু বুঝিনি। হাজার হোক বিজ্ঞ লোক বি.এস.সি ডিস্টিংশন ইত্যাদি ইত্যাদি।

—'বুঝছেন না কিছু? এদের চেনেন না?'

ছবিগুলির বিভিন্ন অংশে আঙুল দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন তিনি!

মাথা নাড়লাম! অসম্মতি সূচক!! অর্থাৎ বুঝলাম না!!!

—'ফেডিং নিয়ে কাজ করেন অথচ ইলেকট্রনিকসের এ, বি, সি, ডি বোঝেন না?'

কিচ্ছু উত্তর দিলাম না। গুম মেরে রইলাম।

তলাপাত্র সাহেবও একটু গুম হয়ে রইলেন, তারপর বললেন,—'তাহলে কি হাবলা বলে ছেলেটা আমার সঙ্গে জোক করল? ছাট কাণ্ট বি, হি ইস্ এ গুড সোল।'

—'ব্যাপারটা না হয় সহজ করেই আমায় বলুন। আমার অনেক লোকের সঙ্গে জানাশুনো আছে। হয়তো কিছু কাজে আসতে পারি।

—'বলছেন?'

—নিশ্চয়ই বলছি, হাজার বার বলছি।'

—'তাহলে শুনুন। এই যে ছবিগুলি দেখছেন এগুলি হচ্ছে সার্কিট ডায়াগ্রাম। এই গুলি দেখে দেখে যন্ত্র তৈরি হবে। আমার এই যন্ত্রগুলি হচ্ছে গন্ধ সেনসেটিভ্। যন্ত্রটাকে চালিয়ে এর সামনে ধূপ জ্বালিয়ে ধরলেই কঁ্যা-কো-কি ইত্যাদি ধরনের আওয়াজ পাওয়া যাবে।'

—'আশ্চর্যের ব্যাপার।'

—'মোটেও না! আপনি একেবারে অপদার্থ। এটা যে কেউ জানে।'

—'তাহলে আপনি কি আবিষ্কার করলেন?'

—'সেটাই আমি বলছি—আপনিতো আমার কথার মধ্যে এতো বাগড়া দিচ্ছেন, গুছিয়ে বলতেই দিচ্ছেন না।'

—'বেশ আমি একটাও কথা বলবো না—আপনি বলুন।'

—'গু-উ-উ-ড। নাউ লিসন। আমার ঐ যন্ত্রটা এ-এ-এই ডায়াগ্রামটা দেখুন, একটু স্পেশ্যাল টাইপের। এর সামনে রোজ, মানে গোলাপের গন্ধ দেওয়া ধূপ ধরলে যে রকমের আওয়াজ দেবে, অন্য কোন সেন্টের ধূপ ধরলে আলাদা আওয়াজ দেবে। প্রত্যেকটা গন্ধের জন্য বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ। ডিফারিং ইন ফাণ্ডামেণ্টাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাণ্ড ওভারটোনস্ কিছু বুঝলেন?'

—'হ্যাঁ বুঝেছি।' আমার বিদ্যেবুদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছি আমি যেটুকু আহরণ করেছি তার থেকে বুঝলাম তলাপাত্র সাহেবের ঐ সফিস্‌টিকেটেড যন্ত্রের সামনে গোলাপের গন্ধবিশিষ্ট জ্বলন্ত ধূপ ধরলে যদি ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ বেরিয়ে আবার আতরের গন্ধ দেওয়া ধূপ জ্বালালে শব্দ বেরুবে কিঁ-কিঁ-কিঁ ইত্যাদি।

তলাপাত্র সাহেব মুখ খুললেন আর ঐ একই কথা বললেন 'এই যন্ত্রটাতে এক এক রকমের গন্ধের জন্য এক এক রকমের আওয়াজ বেরোবে।

'আওয়াজ কথাটা বড্ড মোটা দাগের, বলা উচিত এক একটা গন্ধের জন্য এক একটা নির্দিষ্ট ফাণ্ডামেণ্টাল ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়া যাবে। ফাণ্ডামেণ্টাল ফ্রিকোয়েন্সি— বাংলাটা হল মূলস্বর। অবশ্য তার সঙ্গে অনেকগুলি ওভারটোন অর্থাৎ, অর্থাৎ উপস্বর থাকবে। সব জড়িয়ে মিশিয়ে একটা নির্দিষ্ট ধরনের আওয়াজ আপনার কানে পৌঁছবে। বুঝলেন?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ এটাতো আগেই বুঝে গিয়েছি। এই জিনিস আমি ছোটদের প্রদর্শনীতে অনেক দেখেছি। কাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তৈরি করেছে।'

—'শেষ পর্যন্ত আমার কথাটা শুনুন। এবার আমার কাজটা শুনুন। আচ্ছা, তার আগে বলুন তো যখন টেলিফোনে কথা বলেন তখন টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে কি যায়? হোয়াট?'

—'কেন,' শব্দ যায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দি।

—'আপনার মুণ্ডু। কিসস্যু জানেন না, তাহলে দেখছি ঐ হাবলা আমার সঙ্গে জোক করেছে। আপনার সম্বন্ধে এতো বড় বড় কথা বললো! ভাবলাম—'

—'আমি ঠিক বুঝছি না। শব্দ না গেলে যায়টা কি?' ভীষণ আশ্চর্য হই আমি।

—'ইউ নো নাথিং। শব্দটাকে একটা যন্ত্রের সাহায্যে ইলেকট্রিসিটিতে বদলে

দেওয়া হয় আর ঐ ইলেকট্রিসিটি তারের মধ্যে দিয়ে যায়। শ্রোতার কানের কাছে আবার একটা যন্ত্রের সাহায্যে ঐ ইলেকট্রিসিটিকে শব্দে বদলে দেওয়া যায়। শব্দ হচ্ছে এনার্জি ইলেকট্রিসিটিও এনার্জি। এনার্জিকে একটা থেকে আর একটার বা বহুতে বদলানো যায়। এসব সহজ কথাও আপনি বোঝেন না?'

আমি লজ্জা লজ্জা মুখ করে, চুপচাপ বসে রইলাম।

—'যাকগে, যদিও আপনার কাছে এসব কথা বলে কিছুই লাভ হবে না সেটা স্পষ্ট বুঝছি, তবুও নাচতে নেমে—'

—'হ্যাঁ তাই বাকীটুকু বলেই ফেলুন।'

—'আমার কাজটা হবে এর বিপরীত। আমার যন্ত্রে আপনি এক এক ধরনের আওয়াজ দেবেন, আর এক এক ধরনের গন্ধ পাবেন।'

—'পেলামই না হয় কিন্তু তাতে লাভটা কি?'

—'লাভ? কোটি কোটি টাকা। ক্রোরস্ অফ রুপিস্। আমার কাজটা কি হবে জানেন? বিভিন্ন মাছ মাংসের বিভিন্ন ধরনের রান্নার গন্ধ রেকর্ড করা থাকবে। বাঙালী বাবুরা যখন ভাত ডাল আর তরকারী খাবেন তখন এই যন্ত্র চালিয়ে দেবেন। নাকে আসবে খাসা খুশবু আর সটাসট্ ভাত উঠে যাবে। মাছের খরচ নেই, গভীর সমুদ্রে ট্রলার নিয়ে যাওয়া নেই, মৎস্যমন্ত্রী নেই, বাজারে মাছ নেই, দেশের সব মাছ বিদেশে চালান করে কোটি কোটি টাকা রোজগার—'

আমি হাঁ হয়ে গেছি। কতটা বলতে পারব না। তলাপাত্র সাহেবের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি নিজের মনেই বলে চললেন, 'টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করা থাকবে এক একটা ক্লাশ বা টাইপ।'

—'ধরুন ইলিশ। ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ, ঝোলের গন্ধ, সরষে দিয়ে ঝালের গন্ধ, পাতুড়ীর গন্ধ, টকের গন্ধ সব একটাতে থাকবে। যেটা দরকার সেটা চালিয়ে দেবেন। শুধু ইলিশ কেন এনি টাইপ অফ ফিস্ অ্যাণ্ড মীট্। একটা চিকেন স্পেশাল, একটা মাটন, একটা হ্যাম, এনি থিং ইউ লাইক।' ভাবুন দেখি ঘরে ভুর ভুর করছে চিংড়ী মাছের মালাইকারীর গন্ধ। প্রতিটি নিঃশ্বাসে পেট ভরে সেই গন্ধ খাচ্ছেন।'

—'পাতে অবশ্য ডাল, ভাত আর কুমড়োর তরকারী' বাধা দিয়ে আমি বলি,—'তা ছাড়া আপনার ঐ গন্ধ মিটার দিয়ে এক সঙ্গে কজনকে আর সন্তুষ্ট করা যাবে?'

—'অনেক জনকে। এই দেখুন সার্কিট ডায়াগ্রামের এই জায়গাটায় চেয়ে দেখুন। একটা ফাইভ-কে ভলুাম কণ্টে াল দেখছেন। এটাকে কম বেশি করে আপনি গন্ধের ইনটেনসিটিও কম-বেশি করতে পারবেন। বুঝলেন কিছু?'

মাথা নাড়লাম। অসম্মতি সূচক!! বুঝলাম না!!!

—'আপনি আর জীবনেও পারবেন না। যাক্ আর বুঝেও কাজ নেই। এখন আমায় কিভাবে হেল্প করতে পারেন বলুন। বড় বড় শিল্পপতিদের সঙ্গে কি আপনার আলাপ-সালাপ আছে?'

—'না মশাই, পতি বলতে এক আছেন আমার ভগ্নীপতি। তিনি সারাদিন দাবা খেলেন। তাঁকে দিয়ে কিছু হবে না।'

—'আপনি যে কোন কম্মেরই নন, তা প্রথম থেকেই বুঝেছি, হাবলার কথা শুনে আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে বৃথাই সময় নষ্ট করলাম।'

তলাপাত্র সাহেব বিশেষ রকম গম্ভীর হয়ে তার কাগজপত্র সব ব্যাগে গুছিয়ে নিলেন, সেই আগের মতো বার ছয়েক টাই ঠিক করলেন।

দরজার দিকে যেতে যেতে নিজের মনেই বললেন, 'শুধু শুধুই টাইমটা ওয়েস্ট হলো, যত্তোসব ফালতু লোক। রিসার্চ করে—ছাই করে।'

'আপনি অসন্তুষ্ট হলেও একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। কথাটা হচ্ছে 'আপনার যন্ত্রটা সম্পূর্ণ নয়'—আমি সাহস করে কথা কটা বললাম।

মিঃ তলাপাত্র দরজার বাইরে একপা দিয়েছিলেন, ওই অবস্থাতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন 'হোয়াট ডু ইউ মিন্? কি বলতে চান?'

—'বলতে চাই যে ঘ্রাণে তো অর্ধভোজন হয়, পুরোটা তো হয় না।'

তলাপাত্র সাহেব অসীম করুণা সহ আমার দিকে তাকালেন। তারপর ঘরের বাইরে সম্পূর্ণ বেরিয়ে গিয়ে বললেন, 'এলিমেণ্টারি এরিথমেটিক্ও জানেন না? ইন দ্যাট্ কেস্ দুবার ঘ্রাণ নেবে। টোয়াইস্—'

আমাকে হতভম্ব করে সোজা হাঁটা দিলেন মিঃ তলাপাত্র বি. এসসি (ডিস্টিংশন), আই-এসসি (সেকেণ্ড ডিভিশন) ইত্যাদি ইত্যাদি।

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হীরক। সে আবার কী? আরে হীরক হলো হীরে। তা' হীরে কি খনিতে পাওয়া যায় নাকি? সে তো শুনেছি রাজা মহারাজের আংটি কিংবা মুকুটে থাকে। হ্যাঁ, তা' থাকে বৈকি। তবে তারও আগে থাকে খনির মধ্যে। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, হীরে থাকে পাথরের ভেতরে। তাই নাকি! তবে তো ভালো করে ব্যাপারটা জানতে হচ্ছে।

পৃথিবী বিখ্যাত বহু বড় আকারের হীরে, যেমন গ্রেট মোঘল, কোহিনূর, পিট বা রিজেন্ট, হোপ ব্লু, ওরলভ, নিজাম, ফ্লোরেনটাইন, ড্রেসডেন, স্যানসি, ডারিয়ান নূর, পিগট ট্যাভারনিয়ার নাসাক ইত্যাদি এই ভারতবর্ষেই পাওয়া গিয়েছিল। কিংবদন্তী শোনা যায়, 'কোহিনূর নামের হীরাটি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে অঙ্গদেশের রাজা কর্ণ নাকি গোদাবরী নদীর বালিতে পেয়েছিলেন। সেই জায়গাটির নাম মসুলিপট্টম। আরো শুনতে পাওয়া যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬ সালে নাকি এই 'কোহিনূর' ছিল উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে। তবে অনেকের মতে এসব নিতান্তই গল্পকথা।

হীরক বিশেষজ্ঞদের মতে 'কোহিনূর নামের হীরেটি প্রথম পাওয়া গিয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ গোলকুণ্ডার কাছে কলুর খনিতে। ১৩০৪ সালে। হায়দ্রাবাদ শহরের ১৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে গোলকুণ্ডা শহরে রয়েছে এক প্রাচীন দুর্গ। দুর্গটি তৈরি হয় ১৩৭৬ সালে। এর ভেতরে ছিল সেযুগের বিখ্যাত হীরক-বাজার। খনি থেকে তুলে এনে এখানে হীরে কাটা হতো সুচারুভাবে। তারপর বিক্রী হতো বাজারে। হীরে ব্যবসায়ীদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠতো সমস্ত গোলকুণ্ডা। সারা পৃথিবীতে তখন এ ধরনের হীরে-বাজার একটিই। সারা পৃথিবী থেকে বণিকরা এখানে জড়ো হতো হীরের খোঁজ। ক্যাপটেন মানের লেখা থেকে সেযুগের গোলকুণ্ডার হীরক খনির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

গোলকুণ্ডার দুর্গ তৈরির আগেও এখানে হীরকের ফলাও ব্যবসা ছিল। সে প্রায় ৮০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব সময়ের কথা। খুব সম্ভবত সেই সময়েই গোলকুণ্ডা অঞ্চলে প্রথম হীরকের সন্ধান মেলে। তারপর ২০০০ বছর ধরে হীরকের ব্যাপারে ভারতের আধিপত্য ছিল। সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই তখন সবচেয়ে বেশি হীরে পাওয়া যেত। তাই হীরের খোঁজে পৃথিবীর মানুষ জড়ো হতো ভারতে।

বর্তমান ভারতের যেসব অঞ্চলে হীরে পাওয়া যায়, তাদের মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) দক্ষিণ ভারত—অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা, কুরনুল, অনন্তপুর ইত্যাদি জেলা, (২) মধ্যপ্রদেশের পান্না অঞ্চল, (৩) ওড়িশার মহানদী ও গোদাবরী উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চল। দক্ষিণ ভারতে অনন্তপুর জেলার বজ্রকারুর অঞ্চলে বেশ ভালো জাতের হীরে পাওয়া গেছে। তবে বেশির ভাগ হীরের সন্ধান মিলেছে নদীর পলি মাটিতে। কারণ হীরকবাহী পাইপরক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মিশে গেছে এই পলিমাটির সঙ্গে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর বাজারে ছিল ভারতীয় হীরের রমরমা। কিন্তু ১৭২৫ সালে ব্রাজিলে নতুন হীরের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় পৃথিবীর বাজারে ভারতীয় হীরের কদর কমে এলো। তাছাড়া গোলকুণ্ডা থেকে তখন ভালো জাতের হীরে পাবার সম্ভাবনা বেশ কমে গিয়েছিল। এদিকে ১৮৬৭ সাল নাগাদ দক্ষিণ আফরিকার কিমবারলিতে এক ধরনের আগ্নেয়পাথরের ভেতরে পাওয়া গেল হীরকের সন্ধান। এই আশ্চর্য পাথরের নাম কিমবারলাইট। এরপর থেকে আফরিকার

হীরকের জয়যাত্রার শুরু। পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো জাতের হীরে এখন আসে আফরিকা থেকে। অবশ্য শুধু দক্ষিণ আফরিকা নয়, আফরিকার অন্যান্য দেশ যেমন কংগো, ঘানা, সিয়েরা লিয়োন, অ্যাঙ্গোলা, তানজানিয়া, গিনি, নামাকুয়াল্যাণ্ড, লেসেথো, নামিবিয়া, বথসওয়ালা ইত্যাদি দেশেও প্রচুর হীরের সন্ধান মিলেছে।

ইতিমধ্যে ভারতে হীরক উত্তোলনের পরিমাণ যথেষ্ট কমে গেছে। গোলকুণ্ডায় আর তেমন হীরে পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময় সকলের নজর পড়ে মধ্যপ্রদেশের দেশীয় রাজ্য পান্নার দিকে। পান্নায় হীরের জন্য খননকাজ শুরু হলো। পাওয়া গেল কিছু কিছু হীরে। ১৮৬০ সাল নাগাদ জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইনডিয়ারও নজর পড়ে পান্নার অবহেলিত হীরক ভাণ্ডারের দিকে। কিন্তু কাজকর্ম বিশেষ এগোয় না ওদিকে তখন দক্ষিণ আফরিকার কিমবারলিতে দলে দলে পর্যটক, ভাগ্যান্বেষীরা ভিড় করছে হীরের সন্ধানে। সারা পৃথিবী জুড়ে তখন হীরের নেশা। এমনই এক পরিস্থিতিতে পান্না অঞ্চলে হীরকের অনুসন্ধান চলে অনলসভাবে। অনেক পরিশ্রমে পান্না অঞ্চলে শেষ পর্যন্ত আবার মেলে হীরকের সন্ধান। স্বাধীনতার পর পান্নার হীরক ক্ষেত্রকে নিয়ে অনেক উদ্দীপনা, অনেক আশা।

ছবির ধাঁধার উত্তর :

এক নম্বর : 3 এবং 7 নম্বর কাঠি দুটি উঠিয়ে নাও। এ ছাড়া 9 আর 8 8 এবং 7 কিম্বা 7 আর 3, যে কোন জোড়া তুললেও হবে।

দুই নম্বর : 1 এবং 2—এই দুটি কাঠি তুলে নাও।

তিন নম্বর : কুড়িটা।

চার নম্বর : তিন নম্বর কাঠিটা বাঁদিকে ঠেলতে থাকে। যতক্ষণ না এর প্রান্ত চার নম্বর কাঠিটাকে ছোঁয়। এবার দুনম্বর কাঠিটা তুলে চারের সমান্তরাল করে তিনের অপর প্রান্তে নীচের দিকে বসাও।

পাঁচ নম্বর : তিরিশটা।

ছয় নম্বর : D এবং E।

ছবিধাঁধা

অমিতায়ু চক্রবর্তী

এক নম্বর ছবিতে বারোটা দেশলাই কাঠি সাজানো হয়েছে। মাত্র দুটো কাঠি তুলে নিয়ে দুটো বর্গক্ষেত্র তৈরী করতে হবে। পারবে? পারবে না? ভাবোই না!

দু নম্বর ছবিতে দশটা দেশলাই কাঠি দিয়ে তিনটে বর্গক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে। মাত্র দুটো কাঠি তুলে কেবল দুটি সমান বানাতে হবে। চেষ্টা কর। করই না!

তিন নম্বর ছবিতে মোট ক'টা ত্রিভুজ আছে গুণে বার করোতো। না, না, যা ভাবছো তার চেয়ে অনেক বেশী, গোণোই না!

চার নম্বর ছবিতে চারটে দেশলাই কাঠি দিয়ে একটা গেলাস মতো তৈরী করা হয়েছে। একটা ভাঙা দেশলাই কাঠির টুকরো আছে এর মধ্যে, দুটো কাঠি নাড়াচাড়া করে দেশলাই কাঠির টুকরোটা বাইরে ফেলে দাও দিকি। মনে রেখো গেলাসটা দেখতে গেলাসের মতই থাকবে কিন্তু! বলে দেবো উত্তরটা? না, না, চেষ্টা করে দেখো, হয়ে যাবে।

পাঁচ নম্বর ছবিতে কটা বর্গক্ষেত্র আছে বলতে হবে! এটাতে একটু মাথা ঘামাতে হবে, ভয় কি মাথা ঘামানো তো অভ্যাস আছে লোডশেডিং এর জন্য!

ছয় নম্বর ছবি বহুত মজার। এতে ছজন সার্কাসের ক্লাউনের ছবি আছে, আসলে পাঁচজনের। একজন দুবার ছবি তুলিয়েছে, ক্লাউনের কাণ্ড আর কি! কোন ছবি দুটি হুবহু এক বলো তো?

আমি জানি তুমি কি চাইছো? উত্তরগুলো কোন পাতায়, তাই না? উত্তর অবশ্যই এই বইতে আছে, কিন্তু কত পাতায় তা বলবো না। সমস্ত বইটাইতো তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে, দেখবে কোন না কোন জায়গায় উত্তর পেয়ে যাবে।

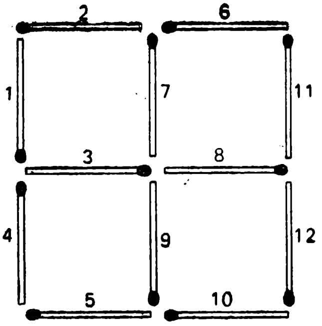

চিত্র ১

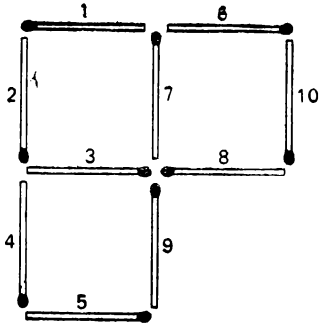

চিত্র ২

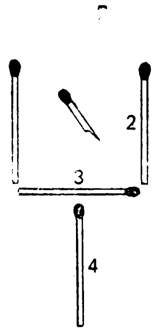

চিত্র ৪

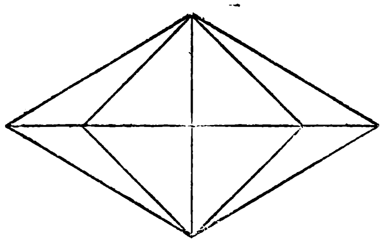

চিত্র ৩

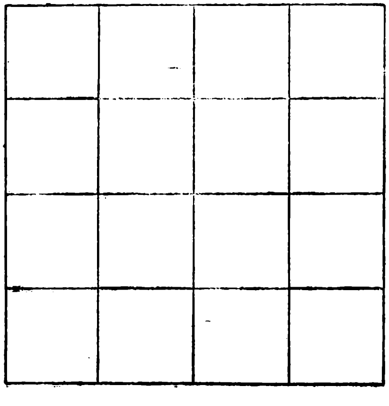

চিত্র ৫

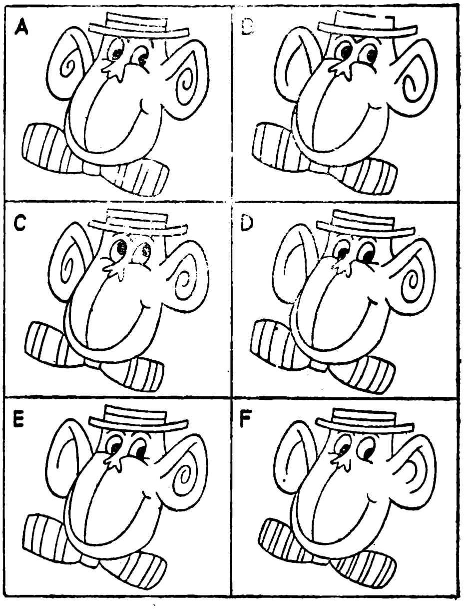

চিত্র ৬

নিরঞ্জন সিংহ

দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী মহলে ডঃ ত্রিভুবন লাহিড়ীর নাম জানেন না এরকম লোক বোধহয় নেই বললেই চলে। ডঃ ত্রিভুবন। পদবী ব্যবহার করা একদম পছন্দ করেন না। তিনি বলেন পদবী ব্যাপারটা মোটেও ভালো না, ওটা জাতিভেদ প্রথাটাকে জীইয়ে রাখে। আমার পরিচয় হচ্ছে আমি একজন খাঁটি ভারতীয় বিজ্ঞানী। ডঃ ত্রিভুবনের অদ্ভুত মতবাদের জন্যই তাঁকে সবাই এক বাক্যে চেনে। কেউ তাঁকে শ্রদ্ধা করে, কেউ পাগল বলে আড়ালে হাসি-মস্করা করে। তাতে অবশ্য ওঁর কিছু এসে যায় না। উনি বলেন আমাদের বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থে এমন সব তথ্য লুকিয়ে রয়েছে যা ঠিকমত গবেষণা করে আবিষ্কার করতে পারলে আজকে পৃথিবীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যা এগিয়েছে

তার থেকে অন্ততঃ একশ গুণ এগিয়ে যেত। আমাদের দেশের মানুষ এ সবের মধ্যে শুধু দর্শনই খুঁজেছেন, বিজ্ঞানকে খোঁজেন নি। এ সব কথা আমি আর আমার বাড়িওলা ন্যাটা মিত্তির খুব একটা ভাল বুঝতে পারি নে। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ আমরা দুজনেই ডঃ ত্রিভুবনের অন্ধ ভক্ত।

সেদিন রাতে ডঃ ত্রিভুবনের ল্যাবরেটরীতে বসে কথা হচ্ছিল। উপস্থিত রয়েছি আমি আর ন্যাটা মিত্তির। ডঃ ত্রিভুবনের কথা শেষ হতেই ন্যাটা মিত্তির মন্তব্য করলেন, 'আপনার কথা কিন্তু ভালভাবে বুঝতে পারলাম না।'

ডঃ ত্রিভুবন একটু হেসে বললেন, 'ভজঘট লাগছে তাই না? ঠিক আছে আমি সোজা করে বলছি। বহুদিন থেকেই আমাদের বিজ্ঞানীরা অন্য গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গে বেতার যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে একথা আজ বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে পৃথিবীতে আমরা ছাড়া এই সৌরমণ্ডলের আর কোন গ্রহে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। তাই শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সৌরমণ্ডলের বাইরে পাঠিয়েছেন মহাকাশযান 'পাইওনীয়ার' ও 'ভয়েজার'। সৌরমণ্ডলের বাইরের কোন গ্রহে যদি আমাদের মত বা আমাদের থেকেও উন্নত কোন প্রাণী থাকে তাহলে তারা 'পাইওনীয়ার' বা 'ভয়েজার' থেকে আমাদের কথা জানতে পারবে এবং খুব সম্ভবতঃ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে।' থামলেন ডঃ ত্রিভুবন। 'আপনার কি মনে হয় ভিনগ্রহবাসী বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গে একদিন না একদিন আমরা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারব?' প্রশ্ন করলেন আমার বাড়িওলা।

ডঃ ত্রিভুবন একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপর আমার বাড়িওলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিত্তির মশাই, পারব না, পেরেছি।' 'কি বলছেন আপনি? ভিনগ্রহবাসী বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি?' বিস্ময়ে চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম আমি। 'হ্যাঁ. আর সেই প্রমাণ দেওয়ার জন্যই তো এত রাতে আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি।' বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

আমি আর আমার বাড়িওলা ন্যাটা মিত্তির মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। ডঃ ত্রিভুবন আমাদের বিমূঢ় অবস্থাটা একটু উপভোগ করলেন। তারপর সামনের টেবিলের কাছে উঠে গিয়ে একটা যন্ত্রের উপর থেকে কালো সেলোফেনের শীটটা

আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলেন। একটা কিম্ভূতাকার যন্ত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে টেবিলটার উপরে। একটা টিভি পর্দার মত পর্দাও রয়েছে যন্ত্রটাতে। ডঃ ত্রিভুবন যন্ত্রটার পিছন থেকে একটা প্লাগ লাগানো তার বের করে ওদিককার দেওয়ালের প্লাগ পয়েন্টে লাগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এই যন্ত্রের সাহায্যে ভিনগ্রহবাসীদের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দেব।'

আমি আর ন্যাটা মিত্তির বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেই বিদঘুটে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর আমি একটু সন্দিগ্ধভাবে জানতে চাইলাম, 'এই যন্ত্রের সাহায্যে ভিনগ্রহবাসীদের দেখা যাবে?'

'নিশ্চয়।' দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন ডঃ ত্রিভুবন।

'এটা কি যন্ত্র?' প্রশ্ন করলেন আমার বাড়িওলা।

'নাম এখনো কিছু দিই নি,' বলে একটু থামলেন ডঃ ত্রিভুবন। তারপর হেসে বললেন, 'তবে এটাকে স্বপ্নাদ্য-যন্ত্র বলতে পারেন।'

আমি বললাম, 'তার মানে?'

ন্যাটা মিত্তির বলে উঠলেন, 'স্বপ্নাদ্য ওষুধের কথা শুনেছি মশায় কিন্তু স্বপ্নাদ্য যন্ত্রের কথা বাপের জন্মেও শুনিনি।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন স্বপ্নাদ্য ওষুধ পাওয়ার মতই এ যন্ত্র তৈরির নকশা ইত্যাদি আমি স্বপ্নে পেয়েছি।' বেশ একটু গম্ভীর ভাবেই বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'বলেন কি? স্বপ্নে যন্ত্র তৈরির নকশা পেয়েছেন?' এবার বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি।

'ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন মশাই। এরকম ধাঁধা লাগিয়ে দেবেন না।' বললেন ন্যাটা মিত্তির।

'স্বপ্নটা অবশ্য কোন দেবতাটেবতা দেখান নি, দেখিয়েছে ভিনগ্রহবাসীরা। অবশ্য একে স্বপ্ন বোধহয় বলা যায় না। একে বলে টেলিপ্যাথী। জানেন কাকে টেলিপ্যাথী বলে?'

ন্যাটা মিত্তির জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'না, তবে মনে হচ্ছে টেলিফোন বা টেলিভিসন জাতীয় কিছু হবে।'

আমি বললাম, 'মনে মনে অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলাকেই তো টেলিপ্যাথী বলে, তাই না ?'

খুব খুশি হয়ে ডঃ ত্রিভুবন বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছো সোমেশ্বর। মুখ দিয়ে শব্দ করে কথা বলতে হলে ভাষার দরকার হয়; কিন্তু একের মনের ভাব অন্যের মনে পৌঁছে দেওয়া এবং অন্যের মনের ভাব বুঝতে পারার জন্য কোন ভাষার বোধ হয় দরকার হয় না। যাহোক একদিন ল্যাবরেটরীতে কাজ করছি হঠাৎ মনে হল কে যেন আমাকে ডেকে বলছে আমরা ৩০ আলোকবর্ষ দূরের এক গ্রহ থেকে তোমাদের পৃথিবীতে এসেছি। প্রথমটা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পর ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল। আমিও মনে মনে জানতে চাইলাম, আপনারা আমাদের পৃথিবীতে এলেন কি করে? সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম; তোমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে ঘুরে বেড়াবার সময় একটা মহাকাশযান দেখতে পেয়ে ওটাকে পাকড়াও করলাম। ভেবেছিলাম ওতে জীবন্ত কোন প্রাণীকে দেখতে পাব; কিন্তু তা পেলাম না। দেখলাম মহাকাশযানটিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা রোবট। তখনই বুঝতে পারলাম তোমরা এখনো আমাদের মত সশরীরে তারায় তারায় ঘুরে বেড়াবার মত উন্নত হয়ে ওঠো নি। যাইহোক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমরা খুশিই হলাম। তোমাদের ওই মহাকাশযানের ভিতরে রাখা একটা ফলক থেকে তোমাদের অবস্থান ও চেহারা কেমন তা জানতে পারলাম। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমরা আগ্রহী। টেলিপ্যাথীর সাহায্যে আমরা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করছি; কিন্তু এভাবে তো সারা দেশের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয় তাই আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম হবে একটি যন্ত্র। এই যন্ত্র কিভাবে তৈরি করবে তার সব কিছু আমরা বলে দিচ্ছি লিখে নাও।' দম নেওয়ার জন্য ডঃ ত্রিভুবন একটু থামতেই ন্যাটা মিত্তির প্রশ্ন করলেন, 'কিরকম দেখতে ওদের ?'

'এক্ষুনি দেখতে পাবেন।' চটপট জবাব দিলেন ডঃ ত্রিভুবন। 'তা যন্ত্র তৈরির কলাকৌশল ওরা বলে দিল ?' ফাঁক পেয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, আমি ডায়েরী খুলে যন্ত্রের নকশা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় পরিষ্কারভাবে লিখে নিলাম। তারপর টেলিপ্যাথীক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমি

অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবলাম। বুঝলাম ব্যাপারটা সত্যি। এও বুঝতে পারলাম যে আমাদের বিজ্ঞানীরা এতদিন ধরে যে চেষ্টা চালিয়ে আসছেন এই যন্ত্রটা তৈরি করতে পারলেই তা সফল হবে। যন্ত্রের নকশা ও অন্যান্য সবকিছু ভালভাবে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে ওটার কর্মকুশলতা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। তবে ওদের নির্দেশ মত যন্ত্রটা আমি তৈরি করতে পারব, খুব একটা অসুবিধে হবে না। ভাবলাম দেখাই যাক না যন্ত্রটা তৈরি করে কি হয়। যন্ত্রটা তৈরি করতে কিছুদিন সময় লাগল। গতকাল ওটা শেষ হয়েছে।' থামলেন ডঃ ত্রিভুবন।

'টেস্ট করে দেখেছেন?' উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করলেন ন্যাটা মিত্তির। 'হ্যাঁ, কাল রাতে খুব অল্প সময়ের জন্য একবার টেস্ট করেছি।' জবাব দিলেন ডঃ ত্রিভুবন।

ভিনগ্রহবাসীদের দেখতে পেয়েছেন?' আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম উত্তেজনায়।

'হ্যাঁ, পেয়েছি,' থেমে থেমে জবাব দিলেন ডঃ ত্রিভুবন।

'কি রকম দেখতে ওদের?' জানতে চাইলেন ন্যাটা মিত্তির।

'নিশ্চয়ই বিদঘুটে রকম দেখতে।' যোগ করলাম আমি।

'না, হুবহু আমাদের মত দেখতে। পোশাক পরিচ্ছদও হাল ফ্যাশানের। মনে হয় ওটা ওদের আসল রূপ নয়। পাইওনীয়ারে পাঠানো আমাদের ছবি দেখে আমাদের চেহারা নকল করেছে।' জবাব দিলেন ডঃ ত্রিভুবন।

'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো' মন্তব্য করলেন ন্যাটা মিত্তির।

'কথাবার্তা কিছু হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'হ্যাঁ, সামান্যই। লোকটা খুব গম্ভীর।' বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'কি কথা হল?' জিজ্ঞাসা করলেন ন্যাটা মিত্তির।

'কি উদ্দেশ্যে ওরা এখানে এসেছে তাই জানতে চেয়েছিলাম, তা বলল, সময় হলে জানাবো। দেখা যাক আজ আর একবার চেষ্টা করে।'

'আমরাও দেখতে পাব?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'নিশ্চয়! শুধু দেখা নয়, কথাও শুনতে পাবে।' জানালেন ডঃ ত্রিভুবন

'আমার শরীরের মধ্যে কি রকম যেন হচ্ছে। বোধহয় রোমাঞ্চ।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারী করতে করতে বললেন ন্যাটা মিত্তির। কিন্তু ওঁর মুখের দিকে

তাকিয়েই আমি বুঝতে পারলাম ওটা রোমাঞ্চ নয়, উনি রীতিমত ভয় পেয়েছেন। জানিনা আমার মুখের প্রতিফলন ওঁর মুখে দেখেছিলাম কিনা। কেননা চোখের সামনে ভিনগ্রহবাসীকে দেখতে পাব এই কথাটা ভাবতেই সারা গাটা যেন শিরশির করে উঠল। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে ডঃ ত্রিভুবন আমাকে কাপুরুষ ভাববেন তাই হাঁটু দুটো ঠোকাঠুকি লাগালেও চুপচাপ চেয়ারটাতে বসে রইলাম ও মনে মনে ভয় তাড়াতে চেষ্টা করলাম। ডঃ ত্রিভুবন রয়েছেন, আমার বাড়িওলা ন্যাটা মিত্তির ভিন-গ্রহীদের দেখবেন বলে পায়চারী করছেন, তখন আমার নিশ্চয় ভয় পাওয়া উচিত নয় মনকে শক্ত করার চেষ্টা করলাম।

'কিছু হবে নাতো মশায় ?' প্রায় ফিসফিস করে বললেন ন্যাটা মিত্তির।

'না, না, কিছু হবে না। কোন ভয় নেই। আপনি চেয়ারে বসুন। আমি এবার যন্ত্রটা চালু করব।' আস্তে আস্তে একটু যেন অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলেন ডঃ ত্রিভুবন। আমার মনে হল উনিও যেন মনে মনে একটু ভয় পেয়েছেন।

ডঃ ত্রিভুবনের কথামত ন্যাটা মিত্তির ওঁর চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন। ডঃ ত্রিভুবন সেই বিদঘুটে স্বপ্নাদ্য যন্ত্রটার খুব কাছে গিয়ে পটাপট কয়েকটা সুইচ টিপে দিলেন। তারপর আমাদের পাশের একটা চেয়ারে এসে বসে পড়লেন। যন্ত্রটার গাে লাগানো পর্দাটা টিভি পর্দার মত আলোকিত হয়ে উঠল। ডঃ ত্রিভুবন ন্যাটা মিত্তিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মিত্তিরমশাই, আপনার মাথার উপরকার সুইচটা একটু হাত বাড়িয়ে অফ্ করে দিনতো।' ন্যাটা মিত্তির ডঃ ত্রিভুবনের নির্দেশ পালন করলেন। কট্ করে আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিউবলাইট দুটো নিবে গেল। ল্যাবরেটারী এখন অন্ধকার, শুধু সেই স্বপ্নাদ্য-যন্ত্রের টিভি পর্দাটা আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আমি আর ন্যাটা মিত্তির উদগ্র কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছি সেই পর্দার দিকে কখন সেখানে ভিনগ্রহবাসীর ছবি ফুটে ওঠে। হঠাৎ আলোকিত পর্দাটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এলো। সেই অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠল একটা আলোর বিন্দু। বিন্দুটা আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। তারপরই মনে হল ওই আলোর ভিতর থেকে একটা পূর্ণাবয়ব মানুষের মূর্তি ফুটে উঠছে। বয়স চব্বিশ, পঁচিশ। রোগা, ফরসা। ডঃ ত্রিভুবন যেমন বলেছিলেন, লোকটার গায়ে হাল ফ্যাশানের পোশাক। ডঃ ত্রিভুবন ফিসফিস করে বললেন, 'কি দেখতে পাচ্ছেন ?' আমি আর

ন্যাটা মিত্তির দু'জনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' সত্যিই খুবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম লোকটাকে। মনে হচ্ছিল যেন টিভি পর্দায় ছবি দেখছি না। লোকটা যেন পর্দা ভেদ করে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে—একেবারে জীবন্ত, যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। আমার হাঁটু দুটো যেন বড় বেশি ঠোকাঠুকি শুরু করল।

ডঃ ত্রিভুবন লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'নমস্কার! আশা করি বিরক্ত হন নি।

'না।' একটা গুরু গম্ভীর আওয়াজ যেন মগজে এসে ঘা মারল। কিন্তু লোকটার ঠোঁট দুটো এতটুকু নড়ল না। বুঝলাম জবাব আসছে টেলিপ্যাথীর মাধ্যমে।

লোকটা আমাদের দিকে তাকালো। অন্ধকারে দেখতে পেল কি না কে জানে? ডঃ ত্রিভুবন প্রশ্ন করলেন, 'আজ কি আপনাদের কথা কিছু বলবেন?'

মনে মনে জবাব পেতে শুরু করলাম: আমরা ছায়াপথের বুদ্ধিমান ও সভ্য জীবদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। বহু গ্রহে আমরা তাদের খোঁজ পেয়েছি। সেই সব সভ্যতার সঙ্গে আমরা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। তারা এখন বিশ্ব-সরকারের ভ্য। তোমাদের মহাকাশযানগুলো দেখে ভেবেছিলাম আমরা বুঝি আর একটা সভ্য গ্রহ খুঁজে পেলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমরা খুবই হতাশ হয়েছি। তোমরা এত অসভ্য ও নোংরা যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা হচ্ছে। ডঃ ত্রিভুবন প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'এ ধরনের কথা বলা আপনার মোটেও উচিত হচ্ছে না। আমরা যথেষ্ট সভ্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় আমরা যথেষ্ট উন্নতি করেছি। আমরা চাঁদে মানুষ নামিয়েছি। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য অনেক গ্রহে মানুষ-হীন রোবট চালিত মহাকাশযান পাঠিয়েছি। সৌরমণ্ডলের বাইরে পাঠানো মহাকাশযান 'পাইওনীয়র' ও 'ভয়েজার'কে তো আপনারা নিজেরাই দেখেছেন।'

তাই দেখেই তো আমাদের ধারণা হয়েছিল যে এখানেও একটি সুন্দর গ্রহ ও উন্নত বুদ্ধিমান জীবদের দেখতে পাব। কিন্তু তোমাদের দেখে আমাদের সে ভুল ভেঙে গেছে। তোমরা খাবারে ভেজাল দাও এমনকি শিশুদের খাবার বলেও বাছ-বিচার করো না। ওষুধে ভেজাল দাও। অকারণে মানুষ খুন করো, আর রাজনীতির নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তোমরা আবার নিজেদের

সভ্য বলো ? তোমাদের পৃথিবীকে কিছুতেই বিশ্ব-সরকারের সভ্য করা যাবে না। ফিরে গিয়ে আমাদের সরকারকে সেইরকম রিপোর্ট দিতে হবে।

ডঃ ত্রিভুবন উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আপনারা মিথ্যে রিপোর্ট দেবেন ? এ অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়। পৃথিবীর সব মানুষ নিশ্চয় খারাপ নয়। আপনাদের মিথ্যে রিপোর্ট আপনাদের সরকার বিশ্বাস করবে না।'

ভিনগ্রহবাসী লোকটা এতক্ষণে একটু হাসলো। আমরা শুনতে পেলাম : ডঃ ত্রিভুবন তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তোমাদের সম্বন্ধে এরকম উদ্ভট রিপোর্ট দিলে আমাদের সরকার হয়তো তা বিশ্বাস করত না। যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় এত উন্নতি করেছে তারা শিশু খাদ্যেও ভেজাল দেয় একথা কি বিশ্বাসযোগ্য ? তোমাদের মগজ বিশ্লেষণ করলেই একমাত্র জানা যাবে যে সত্যিই তোমরা ওইরকম উদ্ভট একটা জীব। তাই আমাদের রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মানে পৃথিবীবাসীদের জীবন্ত নমুনাও পাঠাবো। যাতে তোমাদের মগজ বিশ্লেষণ করে ওঁরা বুঝতে পারেন যে আমাদের রিপোর্ট ঠিক। আমাদের বিজ্ঞানীরা সঠিক ভাবে বলতে পারবেন কেন তোমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমন ভিন্নমুখী। হয়তো তাঁরা ভালো ওষুধপত্রও বাতলাতে পারেন, যা খেলে তোমরা আস্তে আস্তে সভ্য হয়ে উঠবে। তারপর তোমাদের বিশ্ব-সরকারের সভ্য করে নেওয়ার কথাটা আবার নতুন করে ভেবে দেখা যাবে।

আমার হাঁটু দুটো শব্দ করে ঠোকাঠুকি করতে লাগল। ন্যাটা মিত্তিরের অবস্থাটা কেমন তা দেখবার জন্য ঘাড় ঘোরাতেও পারলাম না। ঘাড়টা যেন শক্ত পাথর হয়ে গেছে।

ডঃ ত্রিভুবন বললেন, 'আপনাদের ইচ্ছেমত জীবন্ত মানুষ ধরে নিয়ে যাবেন, ব্যাপারটা বোধহয় অত সহজ নয়। আমাদের দেশেও সরকার আছে।'

ভিনগ্রহবাসীটা এবার বেশ জোরেই হাসল। সে কথা আমরাও জানি ডঃ ত্রিভুবন। তাই তোমাকে দিয়ে এমন একটি যন্ত্র তৈরী করিয়েছি যার সাহায্যে জীবন্ত নমুনা সরাসরি আমাদের গৃহে গিয়ে পৌঁছুবে।

'এসব কি বলছেন ?' ডঃ ত্রিভুবন চিৎকার করে উঠলেন। ঠিকই বলছি। এক্ষুনি সব বুঝতে পারবে। এবার উঠে এসে যন্ত্রটার ডানদিকের নবটা ঘোরাও। 'না না, কিছুতেই আপনি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাদের

গ্রহে পাঠাতে পারেন না।' এবার আমি চিৎকার করে উঠলাম। স্থির হয়ে চেয়ারে বসে থাকা অসম্ভব। চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। দেখলাম আমার আগেই ডঃ ত্রিভুবন চেয়ার ছেড়ে উঠে যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে। সর্বনাশ! একবার যদি উনি নবটা ঘুরিয়ে দেন তাহলে আমরা তিনজনে পৌঁছে যাব ৩০ আলোকবর্ষ দূরের এক অজানা গ্রহে। তারপর আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে তাতো একটু আগেই জেনেছি। ভিনগ্রহীরা কি সংঘাতিক নিষ্ঠুর। ওদের কাজ উদ্ধারের জন্যে ওরা ডঃ ত্রিভুবনকে দিয়ে ওই মরণফাঁদ তৈরী করিয়েছে। আর সেই ফাঁদে এখন আমাদের পুরতে চায়।···না আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না···মাথার মধ্যে শুধু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে : ঘোরাও··· নবটা ঘোরাও··· তবু শেষবারের মত আমি চিৎকার করে উঠলাম, ডঃ ত্রিভুবন কিছুতেই নবটা ঘোরাবেন না।' মাথার মধ্যে সেই শব্দহীন শব্দ বেড়েই চলেছে। মনে হচ্ছে মাথাটা বোধহয় ফেটে যাবে। হঠাৎ দেখলাম ডঃ ত্রিভুবন এগিয়ে গিয়ে যন্ত্রটার নবে হাত রাখলেন। পাশ থেকে ছুটে গেলেন ন্যাটা মিত্তির। আর রক্ষে নেই। সব শেষ। হঠাৎ ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল। মুছে গেল ভিনগ্রহবাসীর মূর্তি। মনে হল অসীম অন্ধকার মহাকাশের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা ৩০ আলোকবর্ষ দূরের সেই অজানা গ্রহের দিকে।

হঠাৎ ন্যাটা মিত্তিরের কণ্ঠস্বর কানে এলো, 'সোমবাবু একবার আলোটা জ্বালুন তো মনে হচ্ছে ডঃ ত্রিভুবন অজ্ঞান হয়ে গেছেন।'

কথাগুলো কানে ঢুকলেও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। তবু আন্দাজে মাথার উপরকার দেয়ালে হাত দিয়ে সুইচটা খুঁজে পেলাম। সুইচ টিপলাম, কিন্তু আলো জ্বলল না। তবে কি? আমি চিৎকার করে উঠলাম, আনন্দে, 'মিত্তির মশাই লোড-শেডিং।'

ভাগ্যিস সময়মত লোড-শেডিং হয়েছিল, তা নইলে এতক্ষণ নিশ্চয় আমরা সেই ৩০ আলোকবর্ষ দূরের অজানা গ্রহের দিকে ছুটে চলতাম। উঃ! কি শয়তানদের পাল্লায় না পড়েছিলাম।' আস্তে আস্তে ক্লান্তকণ্ঠে বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'মস্ত ফাঁড়া কাটল। ওসব স্বপ্নাদ্য যন্ত্রতন্ত্র যেন আর বানাতে যাবেন না মশাই।' বললেন ন্যাটা মিত্তির। 'আ—বা—র! বলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন ডঃ ত্রিভুবন।

বিজ্ঞান নির্ভর গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

নববর্ষের জন্য অনেকগুলি লেখার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোনটাতেই হাত দিতে পারছিলাম না। আজ অন্ততঃ একটা শেষ করবই। সকালে উঠেই তাই গ্যাঁট হয়ে বসলাম। গল্প লেখার অনুপানগুলো আগেই যোগাড় হয়ে গেছে—যেমন এক কাপ্ ধূমায়িত চা, চিবুবার জন্য গোটা দুই কলম, এক কৌটা কড়া নস্যি ইত্যাদি—ইত্যাদি।

কিন্তু, ও হরি সবে হেডিংটা লিখে শেষ করেছি অমনি দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ! কি আর করা, উঠতেই হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল আমার বিদেশী বন্ধু অ্যাচিসন্।

বিনা বাক্যব্যয়ে আমার টেবিলের ওপর একটা চামড়ার থলে উপুড় করে দিয়ে অ্যাচিসন্ বল্ল, "অপিসের কাজে রাঁচী যেতে হয়েছিল। লোহাডগার কাছে একটা মেলা হচ্ছে শুনে সেখানে গিয়েছিলাম। ভারী জবর মেলা! সেখান থেকেই এগুলো নিয়ে এলাম। চমৎকার!"

অ্যাচিসনের হালচাল আমার সব জানা ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় ও এদেশে প্রথম আসে। বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দিতে হয়েছিল ওকে দেশের হয়ে সৈন্যবিভাগে। কিন্তু যুদ্ধ করা ওর কোষ্ঠিতে লেখেনি। এখানে এসে আর পাঁচজন

বিদেশীর মত নাক উঁচু করে নিজেদের মধ্যে আড্ডা না দিয়ে ও এখানকার লোকদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে আর, ফলে, ভারতীয় সংস্কৃতির ভয়ানক রকম ভক্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধ থেমে যাবার পর ও একটা ভাল চাকরি জুটিয়ে এদেশেই ফিরে আসে এবং এদেশের ভাষা ভাল করে শিখতে শুরু করে। সেই থেকেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ এবং সে আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আপাততঃ ওর ঝোঁক চেপেছে এদিক্‌কার নানা অঞ্চলের 'কিউরিও' সংগ্রহ করা। মাটির পুতুল, বাঁশের লাঠি, বেতের সাজি, লক্ষ্মীর সরা, কড়ির বাক্স ইত্যাদিতে ওর ঘর ঠাসা হয়ে গেছে। তবু ওর ক্ষান্ত হবার নাম নেই। লোহাডগা চষে এবার আবার কি নিয়ে এল কে জানে!

গল্প লেখা চুলোয় গেল। অগত্যা আর এক কাপ চায়ের হুকুম দিয়ে ওর থলির দ্রব্য সম্ভারের দিকেই মনোযোগ দিতে হ'ল।

কয়েকটি মাটির পুতুল, একটায় কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন। সাধারণ পোড়ামাটির পুতুল। মুখাবয়বও এমন কিছু নিখুঁত নয়। কেষ্টনগরের পুতুলের তুলনায় নিকৃষ্টই বলতে হবে। কয়েকটা মাছ ধরার সরঞ্জাম—যা ওখানকার আদিবাসীরা ব্যবহার করে; একটা তামাক খাবার কলকে, তবে দেখতে একটু বিশেষত্ব আছে। আর একরাশ এটা-ওটা-সেটা। তার মধ্যে সবই নতুন এবং পরিচ্ছন্ন তা নয়, অনেক পুরোনো বাতিল জিনিসও আছে। মনে হয়, সাহেবের অদ্ভুত নেশার কথা ওরা আগেই টের পেয়েছিল, তাই যা খুশি পেরেছে গছিয়ে দিয়েছে এবং বেশ চড়া দামেই।

অ্যাচিসন্‌ কিন্তু ভারী খুশি,—"এই যে পুতুলটা দেখছো বোস, লর্ড কৃষেন উইথ্‌ এ ফ্লুট্‌—এ নাকি একেবারে দুষ্প্রাপ্য জিনিস। আমি কিন্তু খুব সস্তায় পেয়ে গেছি, আর-আর এইটে দেখ—" বলে সে সত্যিই একটা অদ্ভুত পুতুল এনে আমার সামনে তুলে ধরল।

সত্যি, অবাক্‌ হবার মত। ছোট্ট পুতুলটা। এক কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি। উঁচুতে ইঞ্চি চারেক, চওড়াও ২।৩ ইঞ্চির বেশি হবে না। কিন্তু অসম্ভব ভারী। পুতুলটা অনেক দিনের পুরোনো বলেই মনে হ'ল। গায়ে ছাই-ছাই মত কোন রং লাগানো ছিল, এখন জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে। এক এক জায়গায় রূপোর মত, কিন্তু তার চেয়ে ময়লা সাদা সাদা দাগ বেরিয়ে পড়েছে।

"হ্যাঁ। অদ্ভুতই বটে! আর বেশ ভারীও। কি দিয়ে তৈরী এটা?"

"কি জানি! মেলার একটা লোক বেশি দামের আশায় আমার কাছেই এগিয়ে এসে এটা দিয়ে গেল। বল্‌ল, এটা নাকি জিন্দা পুতুল—জ্যান্ত! তখন হাসি পেয়েছিল, কিন্তু পুতুলটার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে নিতে আপত্তি করিনি বরঞ্চ একটু বেশি দামই নিয়েছে। তারপর বাড়ি এসে দেখি তাজ্জব ব্যাপার? জিন্দা না হলেও সত্যি এ এক আজব পুতুল।...একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ বোস?"

"কি?"

"খানিকক্ষন হাত দিয়ে ধরে রাখ, মূর্তিটা কেমন গরম বলে মনে হবে?"

"সত্যি?" অ্যাচিসনের কথা মত পুতুলটাকে মুঠো করে ধরলাম। একটু পরেই মনে হ'ল হাতটা কেমন গরম গরম বোধ হচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপারই বটে!

অ্যাচিসন্ বল্‌ল, "কিসের মূর্তি এটা আগে দেখতে হবে। তাই তোমার কাছে এলাম, তুমি ইতিহাসের লোক, হয়তো একটা হদিস দিতে পারবে।"

"ইতিহাসের লোক হলেই তো সর্বজ্ঞ হয় না। তবে যতদূর মনে হয় এ কোন অনার্য দেবতার মূর্তি। হয় তো আদিবাসীদের মধ্যে এর পূজোর চলন ছিল। রাঁচীর কাছে লোহাডগার মেলায় পেয়েছ বলছ যখন তখন তাই মনে হয়। ও অঞ্চলে নানা জাতের খণ্ডজাতির বাস; তাদেরই কোন গোষ্ঠীর হয়তো একদা এই দেবতার পূজো হত। এখন বোধ হয় আর হয় না, কেন না তা হ'লে মূর্তিটা ওরা নিশ্চয়ই বিক্রি করত না। যাই হোক, আমি এ বিষয়ে আরও ভাল করে খোঁজ নেব।"

অ্যাচিসন্ চলে গেল, আর সেই যে গেল তিন মাস আর তার দেখা নেই। এমনটা বড় একটা হয় না। কলকাতায় সে বারো মাস থাকে না বটে কিন্তু মাসে অন্ততঃ ২।৩ বার আমার কাছে সে আসবেই। তবে অপিসের কাজে তাকে হরদম বাইরে যেতে হয়। এবার কি তাহলে বেশি দিনের জন্য কোথাও গেল?

আরও কয়েকদিন গেল। অ্যাচিসনের দেখা নাই। তবে কি বেচারা অসুখ-বিসুখে পড়ল? বিদেশ বিভূঁইএ একলা পড়ে আছে, একটু খোঁজ নেওয়া উচিত এই রকম ভেবে একদিন আমিই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি সত্যি তাই। অ্যাচিসন্ বিছানায় শুয়ে আছে। আমাকে দেখে আস্তে ডান হাতখানার দিকে ইশারা করল। দেখলাম কাধের

দিক্‌টায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, আর বাকী অংশটা কেমন শুকিয়ে সরু হয়ে গেছে,—পক্ষাঘাত হলে যেমনটা হয়, ও হাতখানায় যে সত্যি কোন জোর নেই, নাড়াচাড়া করবারও যে উপায় নেই এটা বুঝতে কষ্ট হ'ল না।

অ্যাচিসন্ ক্ষীণকণ্ঠে বল্‌ল, "বোস ঐ দেরাজটার দিকে তাকাও। মনে পড়ছে লোহাডগার মেলায় কেনা সেই কিউরিওগুলোর কথা? ও-ই বোধহয় আমার কাল হ'ল।"

তার কথামত ঘরের কোণে চোখ ফেরালাম। এক কোণে একটা দেরাজের ওপর সেই অদ্ভুত ভারী পুতুলটা বসানো রয়েছে।

কিছু বুঝতে না পেরে আবার অ্যাচিসনের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম।

ও বলল, "তোমাকে সব কথা বলা হয়নি। মূর্তিটা যখন কিনতে যাই তখন ওখানকার কোন কোন লোক আমাকে বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, সাহেব, কিনো নি ও পুতুল, ওটা একটা অভিশপ্ত মূর্তি। যার ঘরে থাকে তার কুষ্ঠ রোগ হয়, সারা অঙ্গ খসে খসে পড়ে। নেহাৎ কুসংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম তখন, কিন্তু এখন দেখছি তা সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি বোধ হয় মূর্তিটা অভিশপ্ত। ওটা ঘরে আনবার পর প্রায়ই আমি ওটার রহস্য বার করবার জন্য নেড়েচেড়ে দেখতাম। হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম, আমার হাতে কেমন ঘায়ের মত দেখা দিয়েছে। ওষুধ দিলাম, কিন্তু কিছু হল না। বেড়েই চল্‌ল ঘা, আর ধীরে ধীরে হাতটা ছেয়ে ফেলল, ডাক্তারেরা কিছু করতে পারলেন না। এখন নীচের দিকে ঘা তেমন চোখে পড়ে না, কিন্তু হাতটা একদম পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত শুকিয়ে গেছে, ডাক্তারেরা বলছেন, ভেতরের টিস্যুগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, ও আর সারবে না; চিরকাল পঙ্গু হয়েই থাকতে হবে।"

দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল, অ্যাচিসন্ ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে সম্ভবতঃ তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুকেও বিশ্বাস করে বসেছে! নইলে একটা মূর্তি শুধু ঘরে রাখার ফলে, ওর শরীর পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে এ রকম হাস্যকর কথা ও নিশ্চয়ই বলতে পারত না।

তবু ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অটল ওর বিশ্বাস, বল্‌ল, "এক কাজ করবে ভাই! তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে তো কত পণ্ডিত লোক আছেন,

এই মূর্তির সত্যিকার রহস্যটা কাউকে দিয়ে পরিষ্কার করে দেবে? আমার হাত গেছে, কিছু করবার নেই, কিন্তু ওর রহস্য আমাকে জানতেই হবে। কিন্তু ভাল কথা, মূর্তিটা কারো বাড়িতে রেখ না, তোমার কাছেও না। পারলে ইউনিভার্সিটির মিউজিয়ামে গচ্ছিত রেখ। ওর সঙ্গে যে অভিশাপ জড়িয়ে আছে তা যেন কাউকে স্পর্শ না করে।"

কি আর করি, অ্যাচিসনের কথা ঠেলতে পারলাম না। মূর্তিটা কাঁচের বাক্স সমেত নিয়ে এলাম।

ইউনিভার্সিটিতে সেদিন কি একটা উৎসব ছিল। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল আরও জোর, ফলে কলা এবং বিজ্ঞান দু' বিভাগের প্রায় সব অধ্যাপকরাই এসে জুটেছিলেন। তাঁদের কাছে কথাটা বললাম। শুনে কেউ হাসলেন, কেউ গম্ভীর হলেন, কেউ কেউ উদ্বিগ্নও হলেন।

খাওয়াদাওয়ার শেষে, যখন বেরিয়ে আসছি তখন কে যেন হঠাৎ আমার কাঁধে হাত দিয়ে একটু থামতে বল্‌ল, ফিরে দেখি রঘুপতি রায়! রঘুপতি বল্‌ল "আমায় একবার পুতুলটা দেখাবি?"

রঘুপতি আমার সঙ্গে হিন্দুস্কুলে পড়েছে, এখন সায়ান্স কলেজে পড়ায়। ছেলেবেলা থেকেই ওর নানা উদ্ভট বিষয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ। সে আগ্রহ এখনও কমেনি দেখে কৌতুহল হ'ল। বললাম "বেশ তো, এখনই দেখাচ্ছি।"

রঘুপতি মূর্তিটা নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে কী গভীর মন দিয়ে নিরীক্ষণ করেছিল সে দৃশ্য যেন আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে! অনেকক্ষণ দেখে, মুঠোর মধ্যে অনেকক্ষণ চেপে রেখে, সে মূর্তিটা আবার রেখে দিয়ে গেল।

পরদিনই কিন্তু আবার এসে হাজির। মূর্তিটা সে কয়েক দিনের জন্য চায়। অ্যাচিসনের অনুরোধের কথা ভেবে আমি আর আপত্তি করলাম না, দিয়ে দিলাম।

প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা। হঠাৎ দিন পনেরো পরে একখানা চিঠি এসে হাজির। লিখেছে রঘুপতি রাঁচী থেকে।

কোন ভণিতা না করে প্রথমেই জানিয়েছে যে মূর্তির রহস্য সে আবিষ্কার করেছে। ঠিক অভিশপ্ত না হলেও মূর্তিটির সঙ্গে যা জড়িয়ে আছে তা অভিশপ্তের

মতই ভয়ঙ্কর। সুতরাং সেটা ব্যক্তিগত ভাবে কারো কাছে না রেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে সটান কোন মিউজিয়ামে জমা দেবার প্রস্তাব করেছে সে।

এর পরেই লিখেছে কি করে সে মূর্তির রহস্য উদ্ধার করল তারই বিস্তারিত কাহিনী। সংক্ষেপে তা এই ঃ

লোহাডগার মেলা সপ্তাহে দু'বার বসে। লোহাডগা রাঁচীরই কাছে, মূর্তিটি নিয়ে সে তাই ঐ মেলায় হাজির হয়েছিল এবং অনুরূপ মূর্তি আর একটা পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ করছিল। কিন্তু অনেক খোঁজ করেও দ্বিতীয় একটি মূর্তি সে সংগ্রহ করতে পারে নি, তবে মূর্তিটির ইতিহাস সম্বন্ধে খানিকটা তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল।

এই মূর্তিটি নাকি ওখানকার এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেবতার মূর্তি। এই দেবতার নাম 'চণ্ডামুণ্ডি'। প্রায় দশ কুড়ি বছর আগে ওদেরই এক কারিগর কোথা থেকে এক গর্তের মধ্যে থেকে খানিকটা "আজব পাথরের" তাল কুড়িয়ে পায়। কালচে রংএর পাথর, কিন্তু খুব ভারী। কারিগরের শখ হয় সে ঐ পাথর কেটে দেবতার মূর্তি গড়বে। গড়েও সুন্দর একটি কালো পাথরের দেবমূর্তি। কিন্তু মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিনই ঘটে এক বিষম কাণ্ড। কারিগর রাত্রে স্বপ্ন দেখে—দেবতা এসে বলছেন, 'তুই কোন রকম খোঁজখবর না নিয়ে পথের কুড়িয়ে পাওয়া অজানা পাথর দিয়ে আমায় গড়েছিস সে জন্য আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোদের বংশের সবাইকার কুষ্ঠ হবে সবাই হয়ে যাবে বিকলাঙ্গ।'

দেবতার অভিশাপ মিথ্যে হয়নি। সেই থেকে ঐ চণ্ডামুণ্ডি মূর্তি কারিগরের বংশধররা পুরুষানুক্রমে ঘরে রেখে ভয়ে ভয়ে পূজো করে আসছে আর তাদের প্রত্যেকেরই দেহ বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। দেবতার ভয়ে কেউ মূর্তিটিকে ত্যাগ করতেও সাহস পায়নি, পাছে দেবতা নতুন করে আবার কোন অভিশাপ দিয়ে বসেন।

কিন্তু সময়ে অনেক কিছু বদলায়। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ও অঞ্চলের লোকেরাও বদলে গেছে। ঐ কারিগরের যে বর্তমান বংশধর সেও একটু লেখাপড়া শিখে,—বিশেষ করে খৃষ্টান মিশনারীদের পাল্লায় পড়ে, পূর্বপুরুষের সংস্কারগুলো সম্বন্ধেও সন্দিহান হয়ে পড়ে, বংশগত রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সে মূর্তিটাকে আর পূজো না করে ত্যাগ করাই ঠিক করে আর ঠিক এই সময়ে অ্যাচিসন্ গিয়ে

ওখানে হাজির হওয়ায় তাকেই মূর্তিটি গছিয়ে দিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগারও করে নেয়।

"এই পর্যন্ত খবর যোগাড় করবার পর", রঘুপতি লিখেছে—"আমার আর ওখানে থাকার কোন প্রয়োজন বোধ হ'ল না। মূর্তিটি যে সত্যি ঐ রকম কোন অভিশাপ-গ্রস্ত হতে পারে যা ঘরে রাখলে মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে এ কথা, এই বৈজ্ঞানিক যুগে মেনে নেওয়া স্বভাবতঃই অসম্ভব। আমার মনে হ'ল মূর্তিটার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যার ফলে ঐ রকম বিষক্রিয়া ঘটে মানুষকে বিকলাঙ্গ করে দিচ্ছে।

"এর পরে আমি রাঁচি চলে এলাম। বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে ওখানকার সরকারী গবেষণাগারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল; আমি ওখানে বসেই মূর্তিটা নিয়ে নানাভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সুরু করে দিলাম। আমার যা সন্দেহ হয়েছিল তার স্বপক্ষে ছিল দু'টি তথ্য। এক মূর্তিটির অস্বাভাবিক ওজন আর দুই—ওর গায়ে ইতস্ততঃ লাগানো ময়লা ময়লা রূপালি দাগ।

"পরীক্ষার ফল যা বেরোল তা অবিশ্বাস্য হলেও আমার অনুমানের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে গেল।"

"মূর্তিটা গড়া হয়েছে একটা উল্কাপিণ্ড থেকে। আকাশ থেকে খসে পড়া এই উল্কাপিণ্ড কবে কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে এসে পড়েছিল কেউ জানে না। প্রচণ্ড গতিতে ছিটকে এসে হয়তো মাটির নীচে অনেকখানি ঢুকে গিয়েছিল, তাই এতদিন কারো চোখে পড়েনি। "দশ কুড়ি বছর" অর্থাৎ শ' দুই বছর আগেকার সেই কারিগর একটা গর্তের মধ্যেই ওটা আবিষ্কার করে এবং এর চেহারার বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হয়ে তুলে নেয়।

"উল্কাপিণ্ডগুলোর বেশির ভাগই হয় লোহা দিয়ে গড়া। তাই স্বভাবতঃই খুব ভারী। লোহা ছাড়া নিকেল প্রভৃতি আরও কিছু কিছু ধাতুও থাকতে পারে। কিন্তু এই উল্কাপিণ্ডগুলিতে উপরন্তু এমন একটি ধাতু ছিল যার কথা অন্য কোন উল্কাপিণ্ডে কস্মিন্ কালে শোনা যায় নি, কি ধাতু? নাম ঠিক বলতে পারব না, কিন্তু সেটা একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ্ অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় ধাতু—যা নাকি রেডিয়ামেরই সমগোত্রীয়।

"এখন, এইসব তেজস্ক্রিয় ধাতুর কি স্বভাব তা নিশ্চয়ই জানিস? দিবারাত্র

এদের গা থেকে রশ্মি বিকিরণ হচ্ছে, ফলে সর্বদাই ওদের মধ্যে একটা রাসায়নিক পরিবর্তন চলছে—আসল ধাতু বদলে রূপান্তরিত হচ্ছে অন্য ধাতুতে। এর শেষ সমাপ্তি যে ধাতুতে সেটি হচ্ছে সীসে, মূর্তিটির গায়ে সীসের মত রূপালী ছাপের কারণও এই এবং ঐ দেখেই আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জেগেছিল। শুধু তাই নয়, রশ্মি বিকিরণ করবার সময়ে স্বভাবতঃই জিনিসটা গরম হয়ে ওঠে। এখানে এই তেজস্ক্রিয়া হয় তো লক্ষ লক্ষ বছর আগে শুরু হয়েছিল, তাই আসল ধাতুটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এখন এত ক্ষুদ্রকণায় এসে ঠেকেছে যে অণুবীক্ষণ ছাড়া তাকে খুঁজে বার করা কঠিন। তার তেজস্ক্রিয়াও তাই সেই অনুযায়ী কমে গেছে, যদিও একেবারে বন্ধ হয় নি, মুঠো করে ধরলে আজও তা গরম লাগে। তাই ওখানকার লোকের ধারণা মূর্তিটি জিন্দা—কিনা জ্যান্ত। সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে মূর্তিটি রেখে দিলে মূর্তির গা থেকে এখনও একটা ক্ষীণ আলো বেরিয়ে আসে।

"মানুষের শরীরের ওপর এই তেজস্ক্রিয়ার ফল যে কী মারাত্মক হতে পারে তা তো আমরা হিরোসিমার বর্ণনা থেকেই টের পেয়েছি। খুব অল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয়াও যদি দীর্ঘদিন শরীরের সংস্পর্শে আসে তবে শরীরের মধ্যে নানা পরিবর্তন আনতে পারে। বিষাক্ত ঘা তৈরি করতে পারে, শরীরের মাংসপেশী, টিস্যু বা তন্তু এবং কোষ বা সেল নষ্ট করে দিতে পারে। বিষাক্ত ঘাকে কুষ্ঠ বলে ভুল করা স্বাভাবিক এবং হাত-পা'র সেল বা টিস্যু নষ্ট হয়ে গেলে সেটা অবশ, পক্ষাঘাতগ্রস্তও হয়ে যেতে পারে। এ রকম অবস্থায় যে বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। কারিগরের বংশধরেরা মূর্তিটি হাতে নিয়ে নিত্য পূজা করার ফলে ক্রমাগত তার সংস্পর্শে ওদের শরীরে ঐ রকম ব্যাধি হয়েছিল—যেটাকে পুরুষানুক্রমিক অভিশাপ বলে ওরা ধরে নিয়েছিল, অ্যাচিসন্ বেচারাও না জেনে মূর্তিটি নিয়ে হাত দিয়ে অত্যাধিক নাড়াচাড়া করার ফলে তারও কতকটা ঐ অবস্থা হয়েছে। এছাড়া এ রহস্যের আর কোনও ব্যাখ্যা হয় না।"

পরক্ষণেই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই মূর্তিটা। একটা ছাই-ছাই রংএর কিম্ভূতকিমাকার পুতুল! কিন্তু—কিন্তু—এর পরেও কি সেটাকে অভিশপ্ত বলতে বাধা আছে?

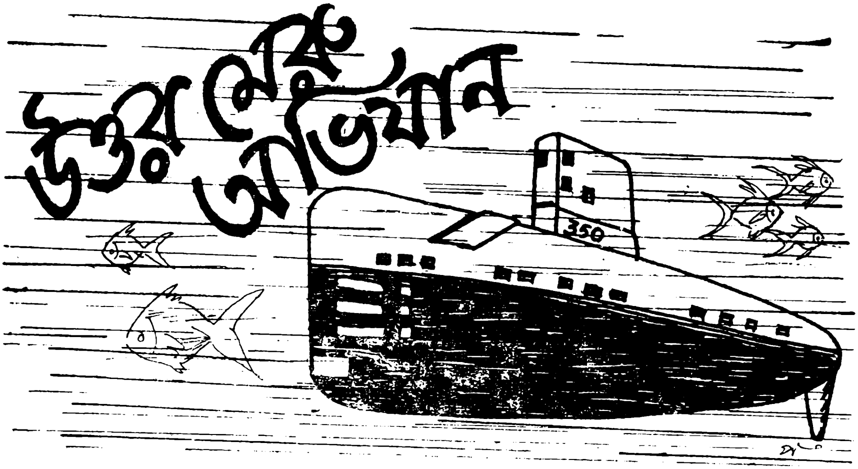

পৃথ্বীরাজ সেন

জুলে ভার্নের বিজ্ঞান সুবাসিত গল্পের অনুকরণে ডুবো জাহাজটির নাম দেওয়া হল নটিলাস। পরমাণু বিদ্যুৎচালিত ডুবোজাহাজ।

নটিলাসকে পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ আঠারোশ মাইল পথ খুব গোপনে। যেন পৃথিবীর কোন দেশ এই অভিযানের খবর জানতে না পারে।

নটিলাসের নায়ক কমাণ্ডার এ্যাণ্ডারসন তাই নিশ্চিন্ত নন। অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠেছে তাঁর লৌহ কঠিন মন।

রাশিয়ানদের নথিপত্র ঘেঁটে পাওয়া গেল কিছু সংবাদ, জানা গেল যে গ্রীনল্যাণ্ড আর কারজেনের মধ্যবর্তী গভীর সমুদ্রে পাড়ি জমাতে হবে।

বিখ্যাত অ্যাডমিরালরা ঘন ঘন বৈঠক ডাকলেন।

আবার নতুন উদ্যমে শুরু করেন তাঁর প্রচেষ্টা অনেক কষ্টে উত্তর মেরুর মানচিত্র সংগ্রহ করলেন। তারপর বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর লিঁয়কে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর এই দুঃসাহসী অভিযানে সঙ্গী হবার জন্য।

ডক্টর লিঁয় জলের গভীরতা মাপবার জন্য এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

তিনি এক কথায় কমাণ্ডারের নিমন্ত্রণে সাড়া দিলেন। নটিলাসের বুকে তিনি বসালেন পাঁচটি ইনভারটেড ফ্যার্দোমিটার।

দুরন্ত অভিযানের পাঁচ অভিযাত্রী হলেন এ্যাণ্ডারসন, ডক্টর লিঁয়, নটিলাসের দুই নেভিগেটর, বিল ল্যালর আর ম্যাক ওয়েনি এবং 'ট্রিগার' নামের সাবমেরিনের কমাণ্ডার লেসকলিং।

ঠিক হল, প্রথমে আকাশ থেকে চোখ রাখা হবে মেরু অঞ্চলে।

পাঁচ অভিযাত্রী সাধারণ পোশাকে পৌঁছে গেলেন গ্রীনল্যাণ্ডের বিমান-ঘাঁটিতে।

খুব নীচু দিয়ে বিমান নিয়ে উড়তে উড়তে কমাণ্ডার অসংখ্য ছবি নিলেন।

* * *

এবার শুরু হল নটিলাসকে নানা যন্ত্রে সাজানোর পালা।

কমাণ্ডার এ্যাণ্ডারসন নিজে অভিজ্ঞ সাবমেরিন চালক। তিনি এমন জাইরো কম্পাস লাগালেন যা মেরুবিন্দুর নিশানা দেখে নির্ভুল। এই কম্পাসের নাম মার্ক ১৯।

বরফতলে যদি পথ হারায় নটিলাস তাহলে কি হবে?

এই বিপদের কথা ভেবে কুড়িটি টর্পেডো নেওয়া হল। দরকার হলে টর্পেডো ছুঁড়ে বরফের স্তর ভেঙে ভেসে উঠবে নটিলাস।

প্রস্তুতির পালা সাঙ্গ হলে নিউ ইংলণ্ডের কোনটি-কাট বন্দর থেকে যাত্রা হল শুরু। প্রথমে আগুয়ান ট্রিগার; তারপর নটিলাস।

* * *

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭।

নটিলাস আর ট্রিগার এসে পৌঁছোলো গ্রীনল্যাণ্ড ও কার্জেনের কাছে।

এ্যাণ্ডারসন চলেছেন বরফের তলা দিয়ে সম্পূর্ণ অভিনব পরিকল্পনা!

নটিলাস এবার মুখ লুকোবে বরফ সাগরের গভীরে!

উৎকণ্ঠিত সকলের মন, হৃৎপিণ্ড যেন থরথর করে কাঁপছে।

নটিলাস চলেছে নিঃশব্দে।

হঠাৎ বেজে ওঠে ভয়ের সংকেত। সামনে দাঁড়িয়ে আছে পলিনিয়া।

পলিনিয়া! সবচেয়ে দুর্গম এই অঞ্চলটি।

এ্যাণ্ডারসন চোখ মেলে দিলেন পেরিস্কোপে। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি! সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত অন্ধকার এসে গ্রাস করলো নটিলাসকে।

ফ্লাড নেগেটিভ!

এ্যাণ্ডারসন চিৎকার করে বললেন।

বায়োয়েন্‌সি কণ্ট্রোলের ট্যাঙ্কগুলি মুহূর্তে জলে ভর্তি হয়ে ওঠে। নটিলাস ডুবতে থাকে আরও অতলে। কেননা পলিনিয়ায় ভাসন্ত হিমশৈলে ধাক্কা লেগে নষ্ট হয়েছে দুটি পেরিস্কোপ।

আহত নটিলাস কোন রকমে ফিরে এল বরফ স্তরের বাইরে।

তখন মেরুতে উঠেছে তুষার ঝড়। তার মাঝে ক্ষুব্ধ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে দুই দক্ষ কারিগর সরিয়ে ফেললেন পেরিস্কোপ দুটি।

হাতে সময় বেশি নেই। পাঁচ ছদিনের মধ্যেই পৌঁছোতে হবে ৬৬০ মাইল দূরের উত্তরমেরুতে।

···ঘণ্টায় পনেরো থেকে কুড়ি নট বেগে ছুটে চলেছে নটিলাস।

···৮৪ ডিগ্রী···৮৫ ডিগ্রী···৮৬ ডিগ্রী!

আর চার ডিগ্রী পার হতে পারলেই মেরু বিন্দু।

হঠাৎ খবর আসে কণ্ট্রোল রুম থেকে, দুটো জাইরো কম্পাস বিকল হয়ে গেছে।

কমাণ্ডার আদেশ দিলেন—চুম্বক কম্পাসে কাজ চলুক।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও জাইরো কম্পাস ঠিক হল না।

হতাশা দুর্ভাবনায় অভিযাত্রীরা মনমরা হয়ে পড়েন।

কম্পাসের কাঁটা ঘুরছে পাগলের মত। সে ঘূর্ণির গোলকধাঁধায় নটিলাস। মেরুবিন্দুর ১৮০ মাইলের মধ্যে থেকে ব্যর্থ হল নটিলাস!

* * *

আবার শুরু হল পরামর্শ। ঠিক হল যে এবার প্রশান্ত মহাসাগরের দিক থেকে নতুন অভিযান শুরু হবে।

নতুন যন্ত্র বসানো হল। বরফস্তর ফুঁড়ে বের হবার জন্য কমিং টাওয়ারের মাথায় বসানো হল পুরু ইস্পাতের বর্ম।

ইনারশিয়াল নেভিগেশন সিসটেম নামে এক যন্ত্র লাগানো হল। যার সাহায্যে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে নটিলাস ইচ্ছেমত চলতে পারবে।

২৫শে এপ্রিল ১৯৫৮। পানামার দিকে রওনা হল নটিলাস।

শুরুতেই এক অভাবনীয় বিপদ! স্টীম কনডেনসারে লিক দেখা দিয়েছে। আগুন নেবাতে গিয়ে কয়েকজন নাবিক অজ্ঞান হয়ে যায়। চার ঘণ্টার চেষ্টায় নিবলো আগুন। শুরু হল নটিলাসের যাত্রা।

আগুন যদি বা নিবলো, কনডেনসারের লিক বন্ধ হল না। অবশেষে সিয়েটেল বন্দর থেকে কেনা হল ৭০ ওয়াট রেডিয়েস্টারের তেল। ঢালা হল কনডেনসারে, লিক বন্ধ হল।

সিয়েটেল থেকে পাড়ি দিতে হবে আলাস্কা, তারপর বেরিং প্রণালী পার হয়ে উত্তরমেরু।

চারদিন পর নটিলাস পা দিল বেরিং সাগরে। এর এক পাশে আলাস্কা, অন্যপাশে সোভিয়েত সাইবেরিয়া। কাছেই রয়েছে সেণ্ট লরেন্স দ্বীপ।

জলের ওপর ভাসছে অসংখ্য বরফের খণ্ড। সূর্যের মুখ বুঝি ঢাকা পড়ে গেছে। নটিলাস বেরিং প্রণালী পার হয়ে চুকচি সাগরে ঢুকলো।

হঠাৎ কেবিন থেকে শোনা যায় নেভিগেটর বিল ল্যালরের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর—কমাণ্ডার, প্লীজ, একবার কণ্ট্রোল রুমে আসুন।

ছুটে এলেন কমাণ্ডার এ্যাণ্ডারসন। যন্ত্রের রেখালিপি দেখে চমকে উঠলেন তিনি। পাহাড়ের মত বিরাট বরফ স্তূপ ষাট ফুট নীচে নেমে এসেছে।

নটিলাসের মাথায় বসানো হল ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন। যাতে স্ক্রীনের ওপর বরফের ছবি ধরা পড়ে।

২৩শে জুলাই, ১৯৫৮।

নটিলাস আবার যাত্রা শুরু করলো।

সেণ্ট লরেন্স আর সাইবেরিয়ার মাঝখান দিয়ে ছুটে গেল নটিলাস। চুকচি সাগরে পড়তেই দৈত্যের মত ধেয়ে এল ভাসন্ত বরফ পাহাড়।

এই অবস্থায় হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো।

পেরিস্কোপে শেষবারের মত ফুটে ওঠে ওপরের পৃথিবী। নটিলাসের ঘড়িতে গ্রীনউইচ সময় রাতের প্রহর গুনছে।

১লা আগস্ট সকাল পাঁচটা বেজে বাহান্ন মিনিট। মেরুর বরফ সমুদ্রে ঢুকে পড়েছে নটিলাস। ৮৩ ডিগ্রী কুড়ি মিনিট অক্ষাংশ চিরস্থায়ী বরফ রাজ্যের কেন্দ্রভূমি।

৮৪ ডিগ্রী।

উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে এ্যাণ্ডারসনের দেহ। এই সেই জায়গা যেখানে কম্পাসের প্রলয় নাচন শুরু হয়।

হলও তাই, বিগড়ে গেল চুম্বক কম্পাস। মাস্টার জাইরো কম্পাসও উল্টো মুখে চলেছে।

কমাণ্ডার আদেশ দিলেন—ইনারসিয়াল নেভিগেটরের নির্দেশ নিয়ে এগিয়ে চল।

৮৭ ডিগ্রী।

উত্তরমেরু আর সিকি মাইল দূরে।

ডিসট্যান্স ইনডিকেটারে চোখ রেখে কাউন্ট ডাল্স শুরু হল।

মাইক্রোফোনে শোনা যায় কমাণ্ডারের কণ্ঠস্বর .....দশ......আট......ছয় চার......তিন......দুই......এক......শূন্য!

উত্তরমেরু! ৯০ ডিগ্রী!

৩রা আগস্ট।

এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো পৃথিবীর ইতিহাসে।

৪ঠা আগস্ট, সকাল সাতটা মেরু জয় করে ফিরছে নটিলাস।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যায় আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে। সমুদ্র এখানে বরফ মুক্ত। বরফ স্তরের ভাঙা টুকরোয় পরম অনায়াসে শুয়ে আছে এক শীল। নটিলাসকে দেখে এতটুকু ভয় পায় না সে।

চারদিন বাদে নটিলাস এল আটলান্টিকে।

রেডিওম্যান বেতার যোগাযোগের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, অবশেষে ধরা দিল জাপানের এক বেতারঘাঁটি।

ইথার তরঙ্গে ভাসলো সেই ঐতিহাসিক তিনটি শব্দ—নটিলাস নাইন্টি নর্থ।

সারা পৃথিবীর মানুষ জেনে গেল মেরু বিজয়ের অবিশ্বাস্য কাহিনী।

বঙ্কুবাবুর গল্প

বিমলেন্দু মিত্র

বঙ্কুবাবুকে বোধহয় তোমরা চেন না। আমাদের বাড়িতে বঙ্কুবাবু যে বিকেলে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে আসেন,—সাধারণ ভাষায় যার মানে হল স্রেফ আড্ডা দিতে আসেন,—তাও নিশ্চয় তোমরা জান না। তাঁর রোগা রোগা ফর্সা চেহারায় নিতান্ত বেমানান খোঁচা খোঁচা ঝোলা গোঁফ খোস গল্পের উত্তেজনায় মাঝে মাঝে শজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে কাঁপতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে সেই আড্ডার অন্যতম আড্ডাধারী আমার আটবছরের ভাইঝি বুড়ি মাঝে মাঝেই খিলখিল করে হেসে ওঠে।

স্বীকার করতেই হবে যে বঙ্কুবাবুর গল্পগুলো বিশ্বাস করা খুব শক্ত হয় মাঝে মাঝে। বঙ্কুবাবু বলেন, সেগুলো সবই তাঁর সত্যি অভিজ্ঞতার গল্প। পাশের বাড়ির তপেশ বঙ্কুবাবুকে গুলরাজ বলে ডাকে; আমি তা পছন্দ করি না কারণ তাঁর গল্পগুলো সত্যিই মিথ্যে কিনা তা ঠিক বুঝতে পারি না। বুড়ির জ্যেঠিমা রোজই বিকেলে কখনও বা আলুকাবলি, কখনও বা ছানার পুডিং; এইসব ভালো ভালো খাবার করে বাইরের ঘরের আড্ডায় পাঠিয়ে দেন। বঙ্কুবাবুর ডিশ চেটে পুটে সাফ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো শুরু হয়ে যায় মারাত্মক একটি গল্প!

সেদিন তখনও বঙ্কুবাবু আসেন নি। আসর জমিয়েছিল আমাদের বুড়ি। চোখ বড় বড় করে ও বলছিল, ওর নতুন অভিজ্ঞতার গল্প,—"জান জ্যেঠু, ইস্কুলের মাঠের ধারে ধারে ছোট্ট ছোট্ট একরকমের গাছ হয়েছে, কেমন যেন কাঁটা কাঁটা গা

আর তার ডালের গায়ে চিরুনির মতন সারি সারি সাজান পাতা। যেই না ছুঁয়েছি, সমস্ত পাতাগুলো কেমন যেন মুড়ে বন্ধ হয়ে গেল, তারপর ডালটাও ঝুপ্ করে নীচে ঝুঁকে পড়ল। আন্টি বললেন,—ওরা হল লজ্জাবতী লতা, ওদের ভারি লজ্জা, কেউ ছুঁলেই মুড়ে যায়।"

পেছন থেকে আওয়াজ এল,—"মাইমোসা পুডিকা!" বঙ্কুবাবু এসে বসলেন। বললেন,—"লজ্জাবতীর ল্যাটিন নাম।"

বুড়ি খিলখিল করে হেসে বললে,—"তাই বুঝি? শুনলে মাইমার পুডিংএর কথা মনে পড়ে যায়। জান জ্যেঠু, আমার মাইমা মাছেরও পুডিং করে।"

বঙ্কুবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—"তোর মনে পড়ে মাছের পুডিং, আমার মনে পড়ে গাছের 'শুটিং' মানে গাছের ডালের কথা। নেপাল তরাইএর গম্ভীর জঙ্গল, মাথার ওপরে অঝোর ঝরন বৃষ্টির ভ্রূকুটি নিয়ে কালো মেঘ, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাচায় বসে রাগ বাগেশ্রীর আলাপ করছি—অজগরের মত ঠাণ্ডা লতার বাঁধনে বন্দী হয়ে, প্রফেসার আদি মস্তানাওয়ালার সঙ্গে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি! সে রাতটার কথা ভাবলেও ভয় করে!" তপেশ জিভ দিয়ে তালুতে টকাস্ করে বললে,—"নাও শুরু করে ফেল, গুলবাহার দৃষ্টিতে দেরি কোরনা!' ইতিমধ্যে ভেতর থেকে এসে গেছে গাজরের হালুয়া। বুড়ির জ্যেঠিমার স্পেশাল রান্না। অব্যবহিত ভাবে বঙ্কুবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং যতক্ষণ না খাবার শেষ হল, তিনি একটিও কথা বললেন না। ডিশটা চেটে সাফ করে যেন দুঃখিত ভাবে নামিয়ে রেখে অবশেষে বললেন,—"আমার জীবনের সত্যি অভিজ্ঞতাগুলো সত্যিই ভারি অদ্ভুত! প্রফেসার আদি মস্তানাওয়ালা ছিলেন শোলাপুর ইউনিভার্সিটির বটানির প্রফেসার, আমায় খুব ভালবাসতেন, ডাকতেন 'ডিয়ার বাঙ্কু' বলে।

"হঠাৎ সেদিন বিকেলে ট্রাঙ্ক কল পেলুম,—'ডিয়ার বাঙ্কু, মস্তানাওয়ালা বলছি। রক্সৌল হয়ে বীরগঞ্জে এস। লোক থাকবে। সঙ্গে একটা ভাল তানপুরা এন।" ব্যস্, কট করে কেটে গেল কানেক্শান। বোঝ ব্যাপার। কোনরকম প্রিপারেশান নেই, হঠাৎ আমায় দৌড়তে হবে ধাপ্ধাড়া গোবিন্দপুরে,—না, মানে নেপালে, বীরগঞ্জে।

"তখন মজঃফরপুর হয়ে রক্সৌল গিয়ে তারপর নেপাল বর্ডার ক্রশ্ করে ন্যারো

গেজ লাইনের ট্রেন ধরে আমলেকগঞ্জ অবধি যাওয়া যেত। পথে পড়ে বীরগঞ্জ। সেই পথেই যেতে হল। তানপুরা নিয়েছিলুম। বীরগঞ্জে দেখা হল বীরচন্দ্র থাপার সঙ্গে। মস্তানাওয়ালা মোতায়েন রেখেছিলেন ওকে। শুরু হল আমাদের অভিযান।

"দুর্ভেদ্য তরাই ফরেস্ট। মাসটা অক্টোবর। তখনও মাঝে মাঝে কালো মেঘের দল ঝরিয়ে দিচ্ছে বৃষ্টি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল, সেগুন, বুনো জামগাছ, আমগাছ —সব যেন জট পাকিয়ে ঘোঁট করছে। বড় বড় অশ্বত্থ গাছ হা হা হাওয়ায় আফ্-শোস করছে। এই হাইটেও দুচারটে ইউক্যালিপটাস চোখে পড়ল। রয়েছে পলাশ আর মহুয়া—'মধুকা লঙ্গোফেলিয়া'। পায়ের নিচে ঘন গাঁজা গাছের জঙ্গল, 'ক্যাসানাস ইণ্ডিকা'।

তিনদিন তিনরাত চলে পৌঁছলুম ধরতিপুর গাঁয়ে। পথে পার হয়েছি বেশ কয়েকটা ছোটবড় পাহাড়ী নদী; জঙ্গলে শুনেছি আছে বাঘ, সাপ, গণ্ডার, হাতি, নীলগাই—কপাল ভাল ছিল তাদের কারো সঙ্গে মোলাকাত হয়নি। ধরতিপুর জঙ্গলঘেরা গণ্ডগ্রাম, ক'ঘর মাত্র গোর্খালীর বাস। থাকবার মধ্যে আছে একটা দোকান, আর—আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য—একটি ডাকঘর আর তারঘর। টেলিগ্রাফে বীরগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ।

না, মস্তানাওয়ালা অবশ্য সেখানেও নেই, তাঁকে পাওয়া গেল গভীরতর বনের ভেতর, আরও দুদিনের রাস্তার পরে। জঙ্গলের মধ্যে উঁচু উঁচু গুঁড়ির মাথায় ছবির মত বাংলো। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। কাঠের মই বেয়ে ওপরে উঠতেই দেখা হল পুরু কাচের চশমা পরা গোলচোখো প্রফেসার মস্তানাওয়ালার সঙ্গে—যাঁকে দেখলে প্রথমে গোমড়ামুখ বড়সড় ভুতুমপেঁচার কথা মনে হবেই। আদি মস্তানাওয়ালা বসে হুঁ হুঁ করে সুর ভাঁজছিলেন। আমায় দেখেই একটি গিট্‌কিরি ছেড়ে বললেন,— "এসে গেছ ডিয়ার বাঙ্কু? তানপুরা এনেছ? গুড্, গুড্! যাও, হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া কর,—ওই টেবিলে কাঁজি আছে, আর আছে লঙ্কার আচার।"

বীরচন্দ্র সেইদিনই ফিরে গেল। প্রফেসারকে ব্যাজার মুখে বললুম,—"এই বনবাদাড়ে টেনে আনবার যথেষ্ট কারণ না দেখাতে পারলে খবরের কাগজে চিঠি লিখে গালাগালি দেব!"

ভুতুম পেঁচা মিটি মিটি হেসে বললে,—"আচ্ছা, আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে।"

কারণ অবশ্য শুনলুম। প্রথমটা হল এই যে—মস্তানাওয়ালার সঙ্গে সঙ্গত করতে পারতুম একমাত্র আমিই। ও, আগে বলিনি বুঝি যে আদি মস্তানাওয়ালা পয়লা শ্রেণীর উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, আবার ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের নামকরা ওস্তাদ! দুনম্বর কারণ হল—না, তার কথা পরে হবে। এরপর শুধু যা যা ঘটল, তাই বলে যাচ্ছি।

পরের দিন প্রফেসার বললেন,—"ডিয়ার বাঙ্কু, চল, আমার ল্যাবরেটরিতে যাই।"

বললুম,—"জঙ্গলে!"

মস্তানাওয়ালা বললেন,—"আলবৎ!"

ঘন আম আর সেগুন গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে যে জায়গাটায় এসে পড়লুম, সেটা দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে গেল। বিঘে খানেক পরিষ্কার জমি,—সেই জমিতে, মনে হল, যেন ফুটখানেক উঁচু সবুজ কার্পেট পাতা। আসলে ঘন আগাছার মত লতাগাছ পরিপাটি হয়ে বিছিয়ে রয়েছে। জমিটার মাঝখানে দেড়হাত উঁচু, ছফুট বাই দশফুট মাচা। ব্যস্, আর কিচ্ছু নেই। বললুম,—"বুঝিয়ে দিন।"

প্রফেসার বললেন,—"পায়ের তলায় ওগুলো কি ধরনের প্ল্যাণ্ট, তা লক্ষ্য করেছ?"

করেছি। ঘন কার্পেট তৈরি হয়েছে অজস্র লজ্জাবতী লতা দিয়ে। তারই ফাঁকে ফাঁকে অগুনতি অন্য ধরনের গাছ, সরু সরু ডালে ইঞ্চিদেড়েক করে লম্বা পাতা। একেকটা ডালে পাতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। জিজ্ঞাসা করলুম,—"হোয়াট প্ল্যাণ্টস্ আর দিজ্?" প্রফেসার বললেন,—"চেন না? এর ল্যাটিন নাম হল 'ডেস্‌মোডিয়াম জাইরান্‌স্', বাংলা দেশে এদের বলে বনচাঁড়াল!"

বললুম,—"এখানে এরা কেন?"

—"এদের চাষ করছি। এদের ওপরেই রিসার্চ করছি। এরা হচ্ছে সেনসিটিভ প্ল্যাণ্টস্, স্পর্শকাতর উদ্ভিদ, বেশ চনমনে গাছ। লজ্জাবতীকে ছুঁয়ে দেখ, তক্ষুনি ওদের পাতা বুজে যাবে।"

বললুম,—"রিসার্চ কিসের ?"

বললেন,—"পাতা কেন বুজে যায় তা জান ?"

মাথা নেড়ে বললুম,—"বয়ে গেছে জানতে !"

উনি বললেন,—"কেন বুজে যায় সেটা একটা রহস্য। সেই মান্ধাতার আমলে স্যার জগদীশ বোস এদের নিয়ে রিসার্চ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, গাছকে আঘাত করলেই সে বৈদ্যুতিক সাড়া দেয়,—হ্যাঁ সব গাছই কমবেশি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। আবার এই স্পর্শকাতর উদ্ভিদ আহত হলে শরীরকে নাড়িয়েও সাড়া দেয়। —হ্যাঁ সব গাছই কমবেশি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। লজ্জাবতীকে ছুঁলে প্রথমে তার ডালের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎস্রোত যায়, পত্রমূলের নিচের দিকে উদ্ভিদপেশী কুঁকড়ে যায়,—লজ্জাবতী যেন পাতা নাড়িয়ে সাড়া দেয়। মানুষ যেমন হাত নেড়ে সাড়া জানায়।" বললুম, "—হয়েছে হয়েছে ! সব যদি জানাই আছে, তাহলে রিসার্চ্‌টা কিসের ?"

প্রফেসার বললেন,—"আমি প্রমাণ করব গাছের ব্রেন না থাকলেও অন্যান্য সমস্ত অনুভূতিই আছে। গাছ মানুষের কথা বুঝতে পারে, তাদের মনের কথাও বুঝতে পারে। গাছ গান ভালবাসে, বাজনা ভালবাসে, ক্ল্যাসিকাল গান বেশি ভালবাসে ! গান শুনলেই চড় চড় করে বেড়ে ওঠে !" বললুম,—"গাঁজা !"

ভুতুম পেঁচা হাহা করে হেসে বললেন,—"ঠিক ধরেছ। সেজন্যেই এখানে এসে ল্যাবরেটরি করেছি।"

গম্ভীর হয়ে বললুম,—"সেটাও তো রহস্য। শোলাপুরে নিজের বাগানে লজ্জাবতীর চাষ করলেই তো সুবিধে হত।" উনি বললেন, —"কিন্তু তুমি কি অন্য গাছগুলি লক্ষ্য করনি ?"

হ্যাঁ, তাও করেছি। লজ্জাবতীর ফাঁকে ফাঁকে 'ক্যাসানাস ইণ্ডিকা, অর্থাৎ গাঁজার গাছ প্রচুর। জানতুম নেপালে যত্রতত্র গাঁজা গাছ জন্মায়।

প্রফেসার বললেন,—"এখানকার মাইমোসা প্ল্যাণ্ট্‌গুলো একটু অন্য ধরনের। মানুষের মতই এরা নেশা করে। গাঁজার নেশা !"

বেশ কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললুম—"প্ল্যাণ্ট্‌ নয়, মানুষ।"

প্রফেসার মস্তানাওয়ালা ব্যাকুল হয়ে বললেন,—"ডিয়ার বাঙ্কু, তুমি বিশ্বাস

কর, গাছের ওপর জগদীশ বোস পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন, দু এক ফোঁটা অ্যালকোহল দিলে ওদের বৈদ্যুতিক সাড়া দেবার ক্ষমতা বেড়ে যায়। ওরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে বেশিমাত্রায়। এখানকার এই লজ্জাবতীরা ক্যাসানাসের গায়ে জড়িয়ে থেকে গাঁজার নেশা করতে শিখেছে। এদের ধরন-ধারন হয়ে গেছে একটু অন্য রকম।"

বললুম,—"কি প্রকার ?"

—"লজ্জাবতী লতা এমনিতে খুব লজ্জাশীলা, গায়ে হাত দিলেই লজ্জায় গুটিয়ে যায়। কিন্তু এখানে নেশা করতে শিখে ওদের লজ্জাটজ্জা কমে গেছে। আমার স্পেশাল রিসার্চ ছিল, গানবাজনার ফলে গাছ বাড়ে কিনা তাই দেখা। এখানের গাঁজাখোর সেনসিটিভ প্ল্যান্টস মাইমোসাগুলো গানবাজনার তালে তালে নাচে! একেবারে ভরতনট্যম, কখনও বা কুচিপুড়ি।"

নাঃ, আর কোনও আশা নেই। ভুলিয়ে ভালিয়ে একদম রাঁচিতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে।

ভুতুম পেঁচা চকচকে চশমার ঝলকে আমায় বিদ্ধ করে বললেন,—"ভাবছ পাগল হয়ে গেছি ? আচ্ছা, আজ রাত্তিরেই এক্স্‌পেরিমেণ্ট হবে।"

বললুম,—"এখনই হোক না !"

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন,—"দিনের বেলায় ওরা রান্না খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আরে না, না—পাগলামী নয় মানে দিনের বেলা (ফটোসিন্থেসিস্) সালোকসংশ্লেষ হতে থাকে। ওটাই গাছের খাবার তৈরির প্রক্রিয়া। সবুজ ক্লোরোফিল আলোর কণা থেকে এনার্জি নিয়ে তৈরি করে গাছের কার্বোহাইড্রেট। রাতে অবশ্য ওদের ঘুমোবার সময়। কিন্তু আমরা যেমন সারারাত জেগে জলসা করি, ওরাও তা করতে ভালবাসে। সঙ্গতীয়ার অভাবে জলসা এতদিন জমছিল না, আজ রাতে জমবে !"

সে রাতটা ছিল ঘোরতর অন্ধকার। আকাশে জলভরা মেঘ আবহাওয়া রীতিমত থমথমে করে রেখেছে। বাইরে ঘন ঝোপে ঝোপে লক্ষ লক্ষ জোনাকী জ্বলছে আর নিবছে। অদৃশ্য ঝিঁঝিঁ পোকার একঘেয়ে চড়া সুরে যেন সানাইয়ের সবচেয়ে চড়া সুরের রেশটুকু ধরে রেখে দিয়েছে।

প্রফেসার মস্তানাওয়ালা বললেন,—"ডিয়ার বাঙ্কু, তানপুরা নাও, মঞ্চে চল।"

মাথা নেড়ে বললুম,—"কখনো নয়। বাঘে তুলে নিয়ে ফলার করে ফেলবে।"

উনি বললেন,—"বাঘের পরিসংখ্যান রিপোর্টে বলছে, তিনমাইলের মধ্যে চিতাও নেই। বিজ্ঞানের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে ভয় কি ডিয়ার বাঙ্কু?"

মনে মনে বললুম,—"হুঁঃ, আমি অতটা অজ্ঞান নই!"

বৃষ্টি-বৃষ্টি শিরশিরিনির মধ্যেই দুজনে মঞ্চে চড়লুম, আর চড়ল একটি হ্যাজাক বাতি। লক্ষ লক্ষ লজ্জাবতী উদ্‌গ্রীব অডিয়েন্সের মত চুপ করে যেন অপেক্ষা করছে। মস্তানাওয়ালা ধরলেন দরবারী কানাড়া। তানপুরাতে বোল ছেড়েছি,—গোঁয়াও, গোঁয়াও! লক্ষ্য করছি, অডিয়েন্সের সামনের দিকের গাছগুলোর পাতা পুরো খোলা —তারপর চোখ খুলে ভাল করে দেখলুম,—তানপুরার তালের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাবতী পাতাসমেত ডালগুলো ঠিক তালে তালে উঠছে আর পড়ছে, সমস্ত গাছগুলোই যেন কোমর বেঁকিয়ে সত্যিই নাচ শুরু করে দিয়েছে!

দৃশ্যটা এতই অবিশ্বাস্য যে ইতিমধ্যে সমূহ বিপদ পেছন থেকে সর্ সর্ করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তা বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ মনে হল, কোমরটা যেন কে জড়িয়ে ধরেছে, আর চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলুম কাঁটা কাঁটা লকলকে কি যেন হাতটাও আস্তে আস্তে পেঁচিয়ে বন্দী করবার চেষ্টা করছে! সাপ মনে করে আঁৎকে উঠে লাফাতে যেতেই বুঝতে পারলুম, আমার নড়বার ক্ষমতা নেই। ততক্ষণে বুক, কাঁধ ঘিরে পেঁচিয়ে উঠেছে কাছির মত মোটা—না, অজগর সাপ নয়, হ্যাজাকের আলোতেই চোখে পড়ল, লজ্জাবতীর একাধিক ডালপালা! হ্যাঁ, অজগরের বেষ্টনের মতই নিবিড় ভাবে ওরা আমায় ততক্ষণে জড়িয়ে ধরেছে,—আরও বাড়ছে লক্‌লক্ করে, আরও প্যাঁচাচ্ছে! চেয়ে দেখি, মস্তানাওয়ালার অবস্থাও তথৈবচ, ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, গান গেছে থেমে। বুড়ি, যা তোর জ্যেঠিমাকে বলে আয়, আর এককাপ চা পাঠিয়ে দেবে। গলাটা শুকিয়ে গেছে!"

উপায় নেই। চা এল, তারিয়ে তারিয়ে তা শেষ করবার সময় দিতে হল। কাপটা নামিয়ে রেখে বঙ্কুবাবু আবার শুরু করলেন,—"গান বাজনা থামতেই আসে-পাশের কাঁটাওয়ালা প্যাঁচানো ডালের পাতাগুলো ঝপ্ ঝপ্ বন্ধ হতে আর খুলতে লাগল। কয়েকটা ডাল ঠিক চাবুকের মতই সপাৎ করে মুখে আছড়ে পড়ল"। মরা ভয়ে বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল। প্রফেসার কষ্টে বললেন,—"ডিয়ার বাঙ্কু,

ওরা বলছে গানবাজনা চালিয়ে যেতে।" অসহায়ের মত বললুম,—"হাত চলছে না" আশ্চর্য, বাঁ হাতের বাঁধন তক্ষুনি আলগা হয়ে গেল। প্রফেসার ধরলেন,—রাগ

বাগেশ্রী। বন্দী হয়ে বসে থেকেই তানপুরায় ঝঙ্কার দেওয়া ছাড়া কিছু করবার রইল না। আচ্ছা, আজ চলিরে, অনেক রাত্তির হয়ে গেল।"

বঙ্কুবাবু উঠে পড়লেন। আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম,—"একি, একি, তারপর?" তপেশ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হাত ধরে টেনে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে বললে,—"ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব বঙ্কুদা, শেষটা বল।"

বঙ্কুবাবু বসলেন। বললেন,—"হ্যাঁ, আমাদের দুজনের সেখানেই শেষ সমাধি হত, কারণ আগামী একমাসের মধ্যে সেই বনালয়ে দ্বিতীয় কোন মানুষের পদার্পণের কোন কথা ছিল না। ব্যাপারটা কি হয়েছিল, তা প্রফেসার পরে বলেছিলেন। গাঁজাখোরদের মাথায় একটা জিনিস চেপে বসলে সে আর চট্ করে যায় না। গান-বাজনা এনজয় করতে করতে ঐ গাঁজাখোর লজ্জাবতীদের খেয়াল চেপেছিল, আমাদের জড়িয়ে ধরে ঐখানেই বসিয়ে রাখবার। কে আর উদ্ধার করত আমাদের? ভাগ্যিস ঐ ডেস্‌মোডিয়াম জাইরান্‌স্‌রা ছিল! ওরাই খবর দিল ধরতিপুরের টেলিগ্রাফ অফিসে। সেখানে তখনও বীরচন্দ্র ছিল, দুদিনের পথ ঘোড়ায় চড়ে চার ঘণ্টায় এসে দুপুরবেলায় আমাদের সেই সাংঘাতিক আলিঙ্গন থেকে উদ্ধার করল।

বঙ্কুবাবু আবার চুপ করলেন। বুড়ি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বলল,—"সবটা বল জ্যেঠু, সবটা বল!"

বিশু বললে,—"ডেস্‌মোডিয়াম জাইরানস্‌? বনচাঁড়াল? কি করে খবর দিলে?"

বঙ্কুবাবু বললেন,—"ডেস্‌মোডিয়ামের সাধারণ ইংরেজি নাম হল 'টেলিগ্রাফ প্ল্যাণ্ট'। ওদের ডালের শেষের পাশাপাশি পাতাগুলির প্রান্ত আপনা হতেই ওঠানামা করে,—প্রাণীর হার্টের স্পন্দনের সঙ্গে ওদের তুলনা করেছিলেন স্যার জগদীশ বোস। ঐ বনে এখানে সেখানে ছিল টেলিগ্রাফ প্ল্যাণ্টের জঙ্গল। ওখান থেকে ধরতিপুরের পোস্টাফিস পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটুকুতেই ছিল ওরা। আমাদের দুর্দশা দেখে বনচাঁড়ালরা 'মর্স্‌'-কোডে খবর দেয় ধরতিপুরে। বীরচন্দ্র মস্তানাওয়ালার শিষ্য, ব্যাপারটা চট্ করে ও ধরে ফেলে। ব্যস্‌, তারপর আবার কি?"

তপেশ জিজ্ঞাসা করলে,—"ডেস্‌মোডিয়ামরা 'মর্স্‌'-কোড শিখল কি করে?"

—"তার ঘরের আশেপাশের বনচাঁড়ালরা সব প্রথমে শিখে ফেলে, তাদের কাছ থেকে শেখে সেই বনের সমস্ত ডেস্‌মোডিয়াম।"

বিশু হাঁ করে থেকে বললে,—"তা বনচাঁড়ালরা গাঁজার নেশা ধরেনি কেন?"

বঙ্কুবাবু বললেন,—"ওদের কর্তব্যজ্ঞান প্রবল, ওরা যে 'টেলিগ্রাফ-প্ল্যাণ্ট'!"

ফটোগ্রাফির ক্রমবিকাশের ইতিহাস

অজিতকুমার চৌধুরী

ফটোগ্রাফির উন্নতিকে মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। এমনি ক্যামেরায় আমরা সাধারণত যে ফটো তুলি তা হল সাদা কালো ফটো। দ্বিতীয় স্তর হল রঙিন ফটো। এই ফটোতে বস্তুর যে রঙ আমরা চোখে দেখি ঠিক সেই রঙ থাকবে। ফটোগ্রাফির উন্নতি হয়ে এখন যে অবস্থায় এসেছে তাতে বস্তুর ত্রিমাত্রিক ফটো তোলাও সম্ভব।

আমরা জানি সাদা-কালো ফটোর ফিল্ম সিলভার হ্যালাইড ইমালশন দিয়ে তৈরী হয়। স্যুলজ ১৭২৭ সালে প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমান করেন যে সিলভার নাইট্রেট যৌগে আলো পড়লে তা কালো হয়ে যায়। পরে দেখা গেল শুধু সিলভার নাইট্রেট নয় সিলভার ক্লোরাইড, সিলভার ব্রোমাইড এবং সিলভার আইওডাইড ও আলোর সংস্পর্শে এসে কালো হয়ে যায়। সিলভার ক্লোরাইড, ব্রোমাইড এবং আইওডাইড যৌগগুলিকে সংক্ষেপে এক কথায় বলা হয় সিলভার হ্যালাইড। টমাস এজওড ১৮০২ সালে সিলভার নাইট্রেটের প্রলেপ লাগান কাগজের উপর প্রথম গাছের পাতার ছবি তোলেন। কিন্তু একটু অসুবিধায় পড়েছিলেন তিনি। কারণ এই আলোক-সুবেদী কাগজের যেখানে যেখানে আলো পড়েছিল সেই জায়গাগুলো কালো হয়ে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু বাকি অংশের রঙের কোন পরিবর্তন হয়নি। এই সাদা কালোর ভিতর পাতার ছাপ পড়েছিল। এখন এই কালো ছবি

দেখতে হলে তাকে তো আলোতে আনতে হবে কিন্তু মুশকিল হল আলোর সংস্পর্শে এলে পুরো কাগজটাই কালো হয়ে যাবে। কাজেই অন্ধকার ঘরে লেন্সের সাহায্যে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব আলোক-সুবেদী কাগজের উপর ফেললেই হবে না, যে অংশে ছবি পড়েনি সেই অংশ থেকে সিলভার হ্যালাইডকে অন্ধকারে কোন পদ্ধতিতে সরিয়ে দিতে হবে। তবেই শুধু বস্তুটির কালো ছবি আলোতে কাগজের উপর দেখা যাবে।

সিলভার হ্যালাইড যৌগ আলোর সংস্পর্শে এলে ভেঙে যায়। সিলভার পরমাণু পড়ে থাকে আর হ্যালোজেন পরমাণু উড়ে যায়। সিলভার হ্যালাইড অণুর কতগুলো ভাঙবে সেটা নির্ভর করবে যৌগটি কতক্ষণ আলোর সংস্পর্শে আছে, তাছাড়া আলোর দীপনমাত্রার উপরও এটা নির্ভর করবে। ক্যামেরার ভিতরে ফিল্মে যখন কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে তখন ফিল্মের উপরের সিলভার হ্যালাইড অণুগুলো ভাঙতে শুরু করে। প্রতিবিম্বের সব জায়গায় আলোর দীপনমাত্রার সমান হয় না। আলোর দীপনমাত্রার তারতম্যের জন্যই বস্তুর প্রতিবিম্বটি পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠে। অর্থাৎ সূর্যের অথবা অন্য কোন উৎস থেকে আলো যখন আমাদের উপর এসে পড়ে তখন সেই আলো বিচ্ছুরিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে যে আলো আসছে তাদের দীপনমাত্রা কিন্তু সমান নয়। যেমন মাথার চুল থেকে প্রতিফলিত আলোর দীপনমাত্রা অত্যন্ত কম। কারণ আমরা জানি কালো জিনিস থেকে আলোর প্রতিফলন খুব কম। আদর্শ কালো বস্তু থেকে কোন প্রতিফলন হয় না। আমাদের শরীর আয়নার মতো সমতল এবং মসৃণ নয়। তাই সবজায়গায় সমান আলো পড়ছে না এবং সমান প্রতিফলনও হচ্ছে না। এই প্রতিফলিত আলোর দীপনমাত্রার তারতম্যের জন্যই ফটোতে আমাদের চেহারার স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। ক্যামেরায় যখন খুব অল্প সময়ের জন্য এক্সপোজার দেওয়া হয় তখন কোন বস্তু, দৃশ্য বা মানুষের ছবি গিয়ে ফিল্মের উপর পড়ে। এই ছবিতে দীপনমাত্রার তারতম্য হওয়ার জন্য বিভিন্ন সংখ্যক সিলভার হ্যালাইড অণু ভেঙে সিলভার পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। সিলভার পরমাণুগুলো আলোর দীপনমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন ঘনত্বে ফিল্মের উপর ছড়িয়ে থাকে এবং তাতে বস্তুটির একটি সুপ্ত প্রতিবিম্বের

ছাপ ফিল্মের উপর পড়ে। এখন এই ছবি আলোতে এনে দেখতে হলে ফিল্মের অবশিষ্ট সিলভার হ্যালাইড অণুগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে।

১৮১৯ সালে স্যার জন হারশেল দেখেন যে হাইপো:সালফাইট রাসায়নিক যৌগে সিলভার ক্লোরাইড গলে যায়। সোডিয়াম হাইপোসালফাইট সহজেই জলে গলে যায়। এই দ্রবণে সিলভার ক্লোরাইড যেমন জলে নূন গলে যায় ঠিক তেমনি ভাবে গলে যায়। এই যৌগটিকে সংক্ষেপে বলা হয় হাইপো। হারশেলই প্রথম ফটোগ্রাফি কথাটি ব্যবহার করেন। এটি গ্রীক শব্দ। ফটো মানে আলো এবং গ্রাফ মানে আঁকা। আলোর সাহায্যে যে ছবি হয় তাকে বলা ফটোগ্রাফ।

ফিল্মের উপর আলো পড়ার পর যে সিলভার পরমাণুগুলো তৈরি হয় তাদের সংখ্যা কিন্তু খুব কম হয়। এখন সরাসরি হাইপোতে দিয়ে যদি সিলভার হ্যালাইডকে সরিয়ে দেই তবে যে সামান্য পরিমাণ সিলভার ফিল্মে থাকবে তাতে ভাল ফটো পাওয়া যাবে না। তাই আলোর সংস্পর্শে এসে যে সিলভার পরমাণু তৈরি হয়েছে তাকে বহুগুণ বাড়ান দরকার। ফিল্মের যে যে জায়গায় আলোর সংস্পর্শে সিলভার পরমাণু তৈরি হয়েছে সেই জায়গাগুলোতে কোন প্রকারে সমানুপাতে সিলভার পরমাণুর সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে তারপর হাইপোতে দিলে ফিল্মের উপর স্পষ্ট নেগেটিভ ছবি ভেসে উঠবে। যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে সিলভার পরমাণুর সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া হয় তাকে বলা হয় ডেভেলপার যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ডেভেলপার হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা হল হাইড্রোকুইনোন, অ্যামিনোফেনল, পাইরোগেলল, গেলিক অ্যাসিড ইত্যাদি। এর ভিতর হাইড্রোকুইনোন যৌগই ডেভেলপার হিসাবে সাধারণত ব্যবহার করা হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি ক্যামেরার ভিতরে ফিল্মের উপর কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়লে তার একটা সুপ্ত ছবি ফিল্মের উপর থেকে যায়। ডেভেলপার দিয়ে সেই সুপ্ত ছবি স্পষ্ট করা হয়। তারপর তা ফিক্সারে চোবানো হয়। হাইপোকে বলা হয় ফিক্সার। ফিক্সেশনের পর ফিল্মটি ভাল করে জলে ধুয়ে নিতে হবে যাতে হাইপো না লেগে থাকে। তারপর শুকিয়ে নিলেই আমরা ফটোর নেগেটিভটি পাব।

কিন্তু সিলভার হ্যালাইড ফিল্মের মুশকিল হল এই ফিল্ম নীল এবং অতিবেগুনী

আলোতে শুধু সুবেদী। তাই যদি কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে যে আলো ক্যামেরায় ঢুকছে তাতে যদি নীল আলো না থাকে তবে ফটো উঠবে না। সোজা কথায় এই ফিল্মে কোন লাল রঙের বস্তুর ফটো তোলা যাবে না। কাজেই ভাল ফটো পেতে হলে ফিল্মকে লাল এবং সবুজ আলোতেও সুবেদী হওয়া দরকার। ১৮৭৩ সালে ভোগেল দেখান যে সিলভার হ্যালাইড ইমালশনের সঙ্গে বিভিন্ন জৈব রঙ মিশিয়ে সিলভার হ্যালাইডকে হলুদ, লাল, সবুজ আলোতেও সুবেদী করা যায়। পরে দেখা যায় সাইয়ানাইন গোষ্ঠীর বিভিন্ন যৌগ মিলে আরও ভাল কাজ পাওয়া যায়। আজকাল নানা রকম জৈব রঙ বেরিয়েছে যা দিয়ে ফিল্মকে বিভিন্ন রঙের আলোতে সুবেদী করা যায়। এই ফিল্মকে বলা হয় প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম। এই ইমালশনের প্রলেপ কাগজের উপর লাগিয়ে সুবেদী কাগজ তৈরি করা হয়। এই কাগজের উপরই পজেটিভ প্রিণ্ট করা হয়।

নেগেটিভ থেকে যখন পজেটিভ প্রিণ্ট করা হয় তখন পজেটিভ পেপারের উপর নেগেটিভটি রাখা হয়। এখন নেগেটিভটির পেছনে একটি বাল্ব জ্বালালে নেগেটিভের ভিতর দিয়ে যে আলো যাবে তার দীপনমাত্রা নেগেটিভের বিভিন্ন জায়গার সিলভার পরমাণুর ঘনত্বের উপর নির্ভর করবে। তাই যে চেহারার ছবিটি নেগেটিভে লুকিয়েছিল সেটি আবার ফুটে উঠবে। তবে পজেটিভে ছবির সাদা কালো অংশ নেগেটিভের ঠিক উল্টো হবে। কারণটাতো সহজেই বুঝা যাচ্ছে। পজেটিভ কাগজে যে ছবি পাব তা কিন্তু দ্বিমাত্রিক। ছবির কোন বেধ থাকবে না। শুধু তাই নয় বস্তুর আসল রঙও এই ছবি থেকে বোঝা যাবে না।

বস্তুর আসল রঙ কেমন করে ফটোতে ফুটিয়ে তোলা যায় তাই নিয়ে গবেষণা শুরু হল। বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সুয়াল ১৮৬১ সালে রঙিন ছবি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা শুরু করেন। আমরা যখন খালি চোখে কোন জিনিস দেখি তখনতো বস্তুটির আসল রঙই দেখি। কিন্তু কেমন করে দেখি তার নানা মতবাদ আছে। একটি মতবাদ হল আমাদের চোখের পেছনের পর্দায় নানা রকম নার্ভ আছে। বিভিন্ন নার্ভ বিভিন্ন রঙে সুবেদী। বিভিন্ন নার্ভে বিভিন্ন রঙের জন্য অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তারপর সেগুলো সেন্ট্রাল নার্ভে গিয়ে মিলিত হয়ে বস্তুটির আসল রঙ ফুটিয়ে তোলে এবং আমরা বস্তুটির রঙ দেখতে পাই। প্রায় দুশ বছর আগে বৈজ্ঞানিক ইয়ং এবং হেলমোজ

দেখান যে আমরা যে বিভিন্ন রঙ দেখতে পাই তা মূলত তিনটি রঙের বিভিন্ন রকম সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। এই তিনটি মূল রঙ হল লাল, সবুজ এবং নীল এই রঙ তিনটি বিভিন্ন ভাবে মিশিয়ে আরও নানা রকম রঙ সৃষ্টি করা সম্ভব। যেমন—

লাল + নীল —→ মেজেণ্টা।

নীল + সবুজ —→ সাইয়ান = নীলকান্তমণির সবুজ নীলচে রঙ।

লাল + সবুজ —→ হলুদ।

লাল + নীল + সবুজ —→ সাদা।

বিভিন্ন রকম রঙ চোখে দেখতে পাওয়ার আর একটি কারণ হল রেটিনায় আলোয় সুবেদী যে কোষ আছে সেই কোষগুলোতে কিছু রঙিন পদার্থ থাকে। এই রঙিন পদার্থগুলো শুধু লাল, নীল এবং সবুজ আলো শোষণ করতে পারে। এই শোষণের ফলে রেটিনার নার্ভে অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তাই বিভিন্ন রঙ দেখতে পাই। বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সুয়ালের পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি সহজ পরীক্ষার দ্বারা পরে দেখান হয় যে এই মূল তিন রঙের তত্ত্বটি মোটামুটি ঠিক। পরীক্ষাটি হল এই রকম। একই বস্তুর লাল, নীল এবং সবুজ আলোতে তিনটি নেগেটিভ তৈরি করা হল। তাদের পেছনে যে রঙের আলোর নেগেটিভ সেই রঙের উৎস রাখা হল। তিনটি নেগেটিভ থেকে তিনটি তিন রকম রঙের ছবি একটি পর্দার উপর এসে পড়বে। এমন ব্যবস্থা করা হল যাতে তিনটি ছবি একটির উপর আর একটি পড়ে। অর্থাৎ পর্দার একই জায়গায় তিনটি ছবি পড়ে। তাতে পর্দার উপর যে ছবিটি ফুটে উঠবে দেখা যাবে তার রঙ আসল বস্তুর রঙের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। এখন প্রশ্ন হল এই রঙিন ছবি কেমন করে ফিল্মে ধরে রাখা যাবে?

আমরা জানি সাদা আলোতে সব রকম রঙ আছে। অথবা বলতে পারি সাদা আলো মোট তিনটি রঙ লাল, সবুজ এবং নীলের ঠিক অনুপাত মেশানোর ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এখন সাদা আলো থেকে যদি কোন পদ্ধতিতে সবুজ রঙের আলো সরিয়ে নিতে পারি তবে সাদা আলো আর সাদা থাকবে না। তার রঙ হয়ে যাবে লাল আর নীলের সমন্বয়ে লালচে নীল বা মেজেণ্টা রঙ। মেজেণ্টা রঙ জলে গুলে একটি কাচের পাত্রে নেওয়া হল। এই পাত্রের ভিতর দিয়ে যদি দিনের আলো দেখি তবে সব লালচে নীল দেখতে পাব। মেজেণ্টা রঙের কাচের

ভিতর দিয়ে তাকালেও সব কিছু সেই রঙের মনে হবে। যে রঙের কাচের ভিতর দিয়ে তাকান যায় মোটামুটি সব কিছু সেই রঙেরই দেখায়। তাই মেজেণ্টা রঙের কাচের ভিতর দিয়ে সবুজ রঙের কোন জিনিস দেখলে তা কালো দেখাবে। কারণ সবুজ রঙের আলো এই কাচের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে না। কাচ শুষে নেবে। এবার যদি একটি হলুদ রঙের কাচ নিয়ে তার ভিতর দিয়ে তাকাই তাহলে অবশ্যই সবকিছু হলদে দেখাবে। আগেই বলেছি হলুদ রঙ লাল আর সবুজের মিশ্রণে তৈরি। তাই এর ভিতর দিয়ে লাল আর সবুজ সহজেই চলে যাবে কিন্তু নীল আলো যেতে পারবে না। এই কাচ নীল আলো শোষণ করে নেবে। অর্থাৎ হলুদ কাচের ভিতর দিয়ে নীল জিনিস কালো দেখাবে। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে হলুদ রঙের ভিতরও আবার তারতম্য আছে। যেমন হালকা হলুদ, গাঢ় হলুদ ইত্যাদি। যদি কাচের রঙ হালকা হলুদ হয় তবে তার ভিতর দিয়ে বেশ খানিকটা নীল আলো চলে আসবে। হলুদ রঙের তীব্রতা যত বাড়তে থাকবে নীল আলো তত কম কাচের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে। খুব গাঢ় রঙ হলে মোটেই যাবে না। তখন নীল রঙের বস্তুটিকে কালো দেখাবে। তাই বলতে পারি সাদা আলো থেকে নীল আলোকে সরিয়ে নিলে বা শোষণ করে নিলে আলোর রঙ হবে হলুদ। এবার যদি সাইয়ান রঙের একটি কাচ নিয়ে তার ভিতর দিয়ে তাকাই তবে চারদিকটা কেমন দেখাবে? আমরা জানি সাইয়ান রঙ হল নীল আর সবুজের সমন্বয়ে গঠিত। তাই স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এই কাচের ভিতর দিয়ে লাল আলো যাবে না। কিন্তু কাচের রঙের তীব্রতার তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় লাল রঙ কাচের ভিতর দিয়ে যাবে। রঙ গাঢ় হলে লাল আলো একদম যাবে না। এই রঙিন কাচকে বলা হয় ফিল্টার। দেখা যাচ্ছে মেজেণ্টা, হলুদ এবং সাইয়ান রঙের ফিল্টার ব্যবহার করে মূল রঙের যে কোন একটি রঙকে আমরা দিনের আলো থেকে পুরাপুরি অথবা আংশিক ভাবে সরিয়ে দিতে পারি। তার ফলে ফিল্টারের ভিতর দিয়ে যে আলো যাবে তার রঙ ফিল্টারের রঙের তীব্রতার উপর নির্ভর করবে। এই বাদ দেওয়ার পদ্ধতিতে যে নানা রকম রঙের আলো সৃষ্টি করা যায় এটাই হলো আধুনিক রঙিন ছবির মূল কথা।

যদি সাদা আলো থেকে নীল আলো সরাতে চাই তবে হলুদ ফিল্টার ব্যবহার

করব। আবার যদি হলুদ আলোকে সরাতে চাই তবে নীল ফিল্টার ব্যবহার করব। এই ফিল্টারের কাজের জন্য ফিল্মে বিভিন্ন রকম জৈব রঙ ব্যবহার করা হয়। রঙিন ছবির ফিল্মের গঠন নিয়ে এবার একটু আলোচনা করা যাক।

রঙিন ফটোর ফিল্ম অনেকগুলি হ্যালাইডের আস্তরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। সেলুলয়েড ফিল্মে প্রলেপ দেওয়ার আগে সিলভার হ্যালাইডের সঙ্গে জিলাটিন মিশিয়ে একটি ইমালশন তৈরি করা হয়। এই ইমালশনের সঙ্গে একরকম জৈব পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া হয় যাদের বলা হয় কাপলার। বিভিন্ন রঙের নেগেটিভ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন জৈব পদার্থের কাপলার ব্যবহার করা হয়। এমনিতে সিলভার হ্যালাইড শুধু নীল আলোতে সুবেদী। তাকে সবুজ ও লাল আলোতে সুবেদী করার জন্য ইমালশনে জৈব রঙ মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই রঙগুলি আলোতে সুবেদী।

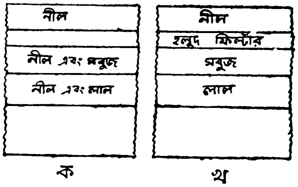

চিত্র নং ১

জৈব রঙ থাকার জন্যই সিলভার হ্যালাইড সবুজ এবং লাল আলোতেও সাড়া দেয়। চিত্র নং ১ (ক) অনুযায়ী ফিল্মটি তৈরি করা হয়। ফিল্মের উপরের স্তরটি হল সাধারণ সিলভার হ্যালাইডের। যখন কোন বস্তুর ছবি ফিল্মের এই স্তরের উপর পড়ে তখন বস্তুটিকে নীল ফিল্টারের ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন দেখাবে সেই রকম একটি ছবির সুপ্ত ছাপ এই স্তরের উপর পড়বে। অর্থাৎ বস্তুটি থেকে আসা আলো ক্যামেরার ভিতরে গিয়ে যখন ফিল্মের উপর পড়বে তখন সেই আলোর নীল অংশটুকু উপরের স্তরটি শুষে নিয়ে বস্তুটির একটি ছবির ছাপ রাখবে। তার তলার স্তর হল একটি হলুদ জৈব রঙের আস্তরণ। এই স্তরটি ফিল্টারের কাজ করে। এই ফিল্টারের ভিতর দিয়ে শুধু হলুদ আলো যাবে। অর্থাৎ লাল আর সবুজ আলো যেতে পারবে। প্রথম স্তর থেকে যদি কোন প্রকারে সামান্য নীল আলো ভিতরে এসে যায় তবে হলুদ স্তর তা শুষে নেবে। সবচেয়ে নিচের স্তরটি হল লাল এবং নীল আলোতে সুবেদী। কিন্তু নীল আলো হলুদ ফিল্টার থাকাতে আসতে পারছে না তাই এই স্তরে যে ছবির ছাপ পড়বে তা শুধু লাল আলোর জন্য। লাল ফিল্টারের ভিতর দিয়ে বস্তুটিকে দেখলে যেমন দেখাবে সেই রকম ছবির ছাপ পড়বে। আর মাঝের স্তরে পড়বে সবুজ আলোর জন্য ছবির

ছাপ। এখন আমরা তিনটি মূল রঙের আলোর জন্য তিনটি নেগেটিভ ছবি পেয়ে গেলাম (চিত্র নং ১ খ)। যদি ডেভেলপ করে নেগেটিভ তৈরি করি তবে তা হবে একই ফিল্মে তিনটি রঙের জন্য তিনটি নেগেটিভ। তিনটিই সিলভার পরমাণুর তৈরি। কিন্তু আমরা চাই নেগেটিভে কাল সিলভারের পরিবর্তে তিনটি তিন রঙের নেগেটিভ। এখন দেখা যাক কেমন করে ফিল্মে রঙিন নেগেটিভ তৈরি করা হয়।

ফিল্মের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রঙের নেগেটিভ কেমন করে তৈরি করা হয় চিত্র নং ২ থেকে তা বোঝা যাবে। এখানে এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে ছবিতে কণাগুলোকে

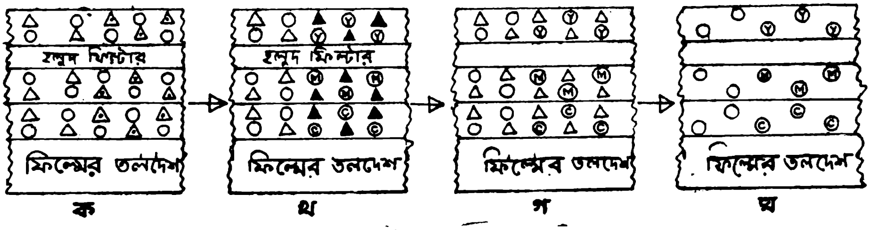

চিত্র নং ২

△ = সিলভার হ্যালাইডের ছোট কেলাস বা কণা।

◬ = আলোর সংস্পর্শে আসা সিলভার হ্যালাইড কণা।

▲ = সিলভার কণা।

○ = কাপলার পদার্থের কণা।

Ⓨ = হলুদ রঙের পদার্থের কণা।

Ⓜ = মেজেন্টা রঙের পদার্থের কণা।

Ⓒ = সাইয়ান রঙের পদার্থের কণা।

খুব বড় করে দেখান হয়েছে। আসলে কিন্তু ছবিতে দেখান কোন কণাকেই খালি চোখে দেখা যায় না। ফিল্মে হ্যালাইডের বিভিন্ন স্তরের মোট বেধ 10^{-4} সেমি অর্থাৎ প্রায় এক মাইক্রন। এখন ধরা যাক আলো শুধু ফিল্মের ডানদিকে পড়েছে, বাঁ দিকে কোন আলো পড়েনি (চিত্র নং ২)। সব স্তরেই বিভিন্ন ধরনের কাপলার মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ফিল্মের যেখানে আলো পড়বে সেখানে সিলভার হ্যালাইডের পরিবর্তন হবে এবং সিলভারে রূপান্তরিত হবে। এই ফিল্ম বিশেষ ডেভেলপারে ডোবালে কাপলারের সাহায্যে সিলভার কণার চারপাশে রঙের সৃষ্টি হয়। যেমন,

সিলভার + ডেভেলপার + কাপলার = সিলভার + রঙ

কি রঙের সৃষ্টি হবে সেটা নির্ভর করবে কি জৈব পদার্থ কাপলার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর। সিলভার হ্যালাইডকে বিভিন্ন রঙের আলোতে সুবেদী করার জন্য যে সব জৈব রঙ ব্যবহার করা হয়েছিল ডেভেলপের পর সে সব রঙ আর থাকবে না। এমন ভাবে কাপলার মেশান হয় যাতে উপরের প্রথম স্তরে সিলভার কণার চারপাশে হলুদ রঙের সৃষ্টি হয়। পরের স্তরে মেজেন্টা এবং সবার নিচের স্তরে সাইয়ান রঙের সৃষ্টি হবে (চিত্র-২ খ)। এবার সিলভার কণাকে আবার সিলভার হ্যালাইডে রূপান্তরিত করা হয়। ডেভেলপের সঙ্গেই এমন রাসায়নিক পদার্থ মেশান থাকে যাতে একই সময়ে সিলভারও সিলভার হ্যালাইডে রূপান্তরিত হয়ে যায় (চিত্র-২ গ)। এবার যদি ফিল্মটিকে হাইপোতে রাখা যায় তবে সমস্ত সিলভার হ্যালাইড গলে যাবে (চিত্র-২ ঘ)। এখন যে নেগেটিভটি তৈরি হবে তা হবে রঙিন ছবির নেগেটিভ। উপরের স্তরের নেগেটিভটি হলুদ রঙের আর পরের দুটি যথাক্রমে মেজেন্টা এবং সাইয়ান রঙের। সুতরাং সবশেষে ফিল্মের ডানদিকে রঙিন ছবির ছাপ থাকে আর বাঁ দিকটায় থাকে রঙহীন জৈব কাপলার। এই কাপলার হল বিভিন্ন জৈব যৌগ যারা সিলভার কণার চারপাশে বিভিন্ন রঙ সৃষ্টি করে। যেখানে সিলভার কণা নেই সেখানে কোন রঙের সৃষ্টি হবে না। সিলভার হ্যালাইডকে বিভিন্ন রঙের আলোতে সুবেদী করার জন্য যে রঙ মেশান হয়েছিল তা কিন্তু ডেভেলপমেন্টের সময় পরিবর্তন হয়ে যাবে। চিত্র নং ২ থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে। এখন প্রজেক্টারের সাহায্যে এই নেগেটিভের রঙিন ছবি পর্দায় ফেলা সম্ভব।

রঙিন পজেটিভ কেমন করে তৈরি করা হয় তা এখন দেখা যাক কাগজের উপর একই রকম রঙিন প্রলেপ দিয়ে (চিত্র নং ২) আলোক সুবেদী কাগজ তৈরি করা হয়। নেগেটিভের ভেতর দিয়ে সাদা আলো পাঠিয়ে কাগজের ফিল্মের উপর যদি ছবি ফেলা যায় তবে তাতে যে ছবি হবে তাকে একই পদ্ধতিতে ডেভেলপ করলে বস্তুর রঙিন পজেটিভ প্রিন্ট ফুটে উঠবে। আজকাল ক্যামেরার ভিতর ফটো তুলে তা বের করে এক মিনিটের ভিতর পজেটিভ প্রিন্ট পাওয়া যাবে। এক ধরনের ফিল্ম আছে তাতে আবার ডেভেলপমেন্টেরও দরকার হয় না। ক্যামেরায় এক্সপোজার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পজেটিভ প্রিন্ট হয়ে যায়।

রোমাঞ্চকর কথাচিত্র ধীরেন বল

স্পষ্ট শুনছ দুর গ্রহের বুদ্ধিমান জীব আমাদের কী যেন বলছে ?
২
আপেক্ষিকতাবাদ বলে, ৩৫ আলোকবর্ষ পথ যেতে-আসতে লাগবে ৭০ নয়, মাত্র ৩০ বৎসর।
সব ঝুঁকি নিয়েই আমি যেতে চাই স্যর, আপনি অনুমতি দিন!
সময়টা কিন্তু রকেটের, পৃথিবীর নয়।
সুযোগ্য বিজ্ঞানী মোহন গ্রহান্তরে যাবেন, আমরা এই অভিযান খুশীমনে অনুমোদন করি।
পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
মোহন গ্রহান্তরে যাচ্ছে, মোহন আমাদের দেশের গৌরব!
ঘরে ঘরে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে ···
মাবাবার কাছে বিদায় নিতে আজ দেশে যাচ্ছি স্যর!
এসো! আমার সঙ্গেও তোমার জীবনের এই শেষ দেখা!

এর জন্যেই কি আমরা এতদিন তোর মুখ চেয়ে ছিলাম ?
হ্যাঁ মা, সেই দিন আজ এলো
দাদা, আবার এসো
৩
বিদায় জন্মভূমি, বেঁচে ফিরলে আবার দেখা হবে!
মোহন শুধু দেশের নয়, মোহন পৃথিবীর গৌরব!
বিজ্ঞানী মোহন — জিন্দাবাদ!
রকেট উৎক্ষেপন
১৫ই আগস্ট, ২০০০ সাল

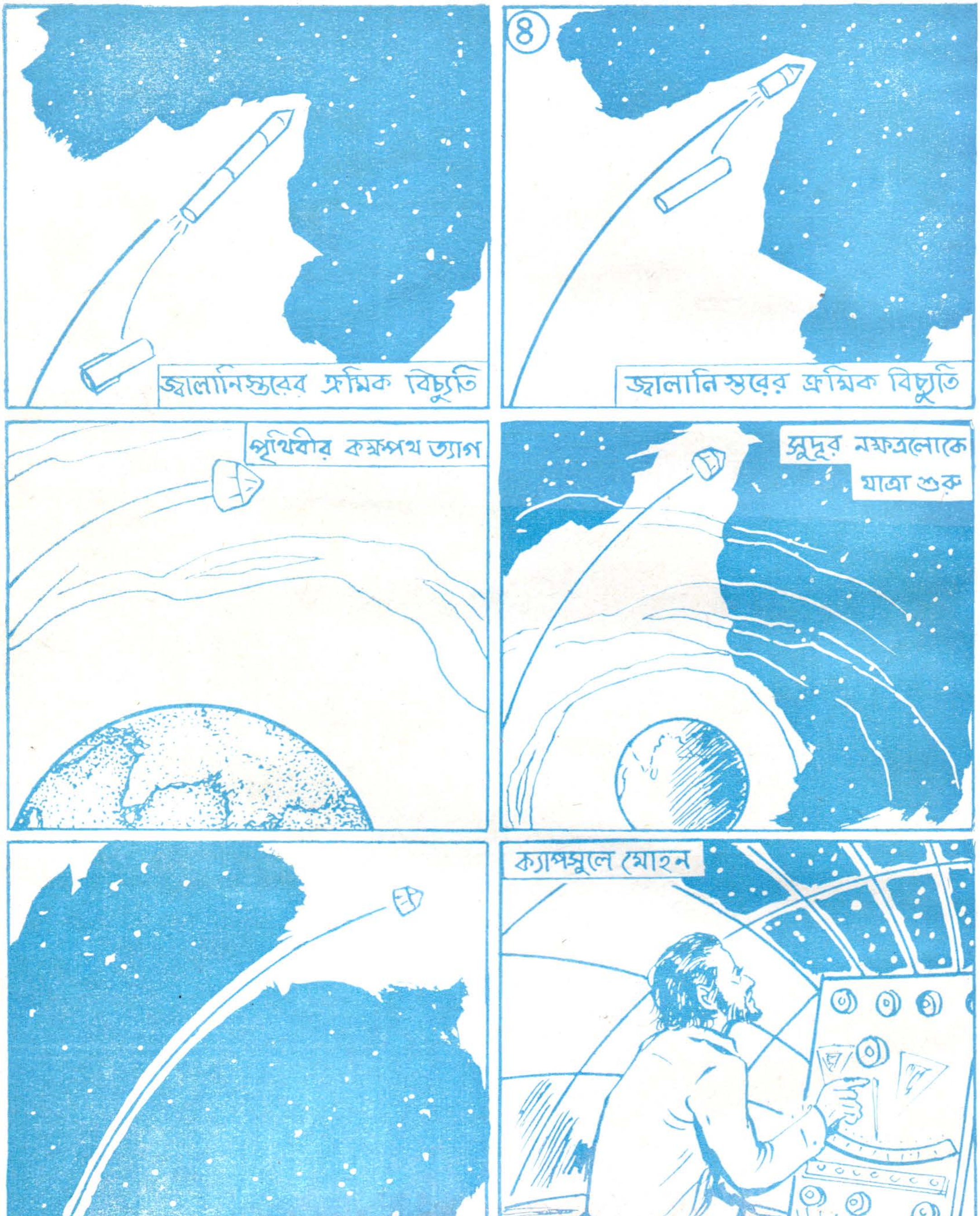
জ্বালানিস্তরের ক্রমিক বিচ্যুতি
৪
জ্বালানিস্তরের ক্রমিক বিচ্যুতি
পৃথিবীর কক্ষপথ ত্যাগ
সুদূর নক্ষত্রলোকে যাত্রা শুরু
দূর নক্ষত্র-লোকে
ক্যাপসুলে মোহন

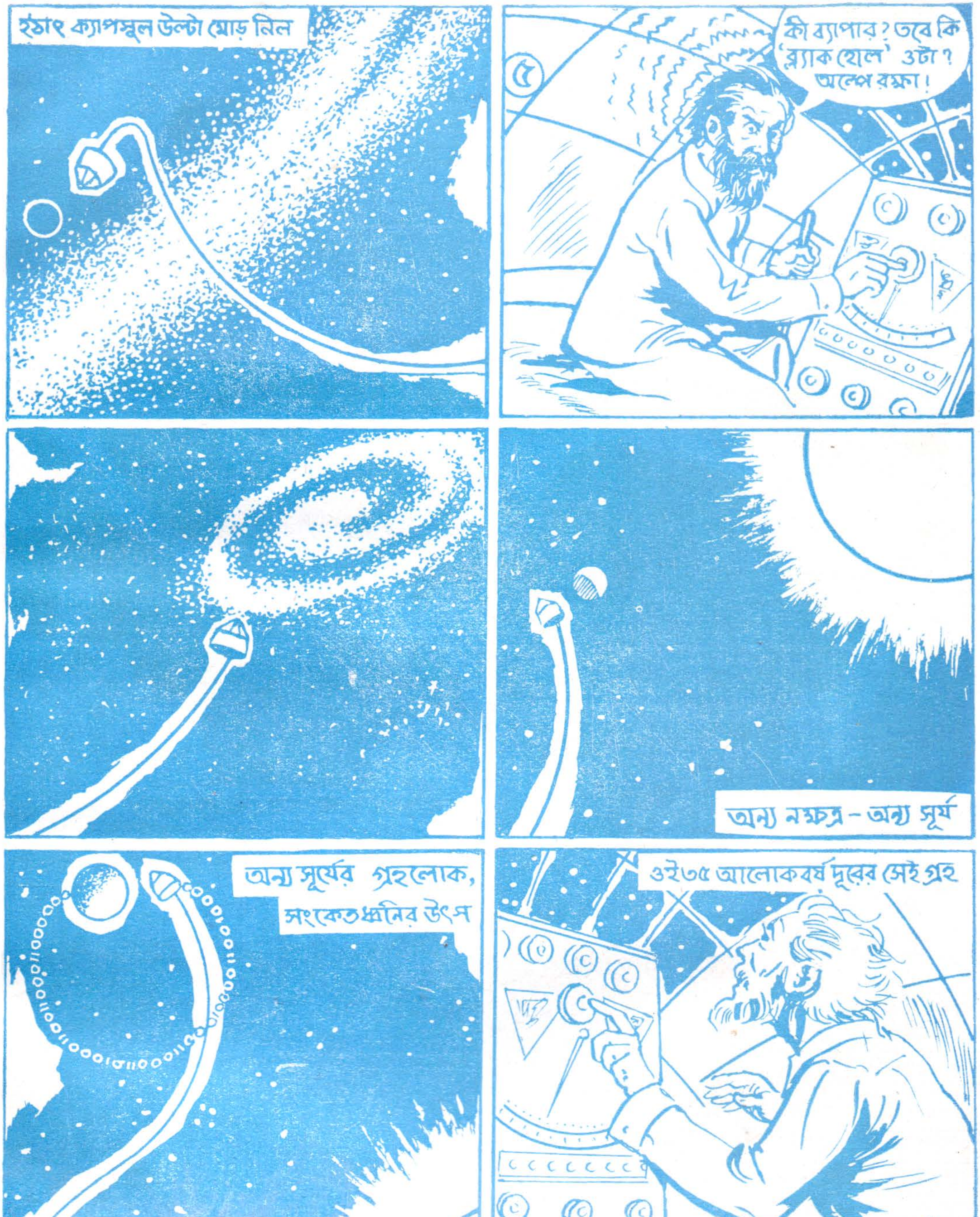
হঠাৎ ক্যাপস্যুল উল্টো মোড় নিল
কী ব্যাপার? তবে কি 'ব্ল্যাক হোল' ওটা? অল্পে রক্ষা!
অন্য নক্ষত্র - অন্য সূর্য
অন্য সূর্যের গ্রহলোক, সংকেতধ্বনির উৎস
ওই ৩৫ আলোকবর্ষ দূরের সেই গ্রহ

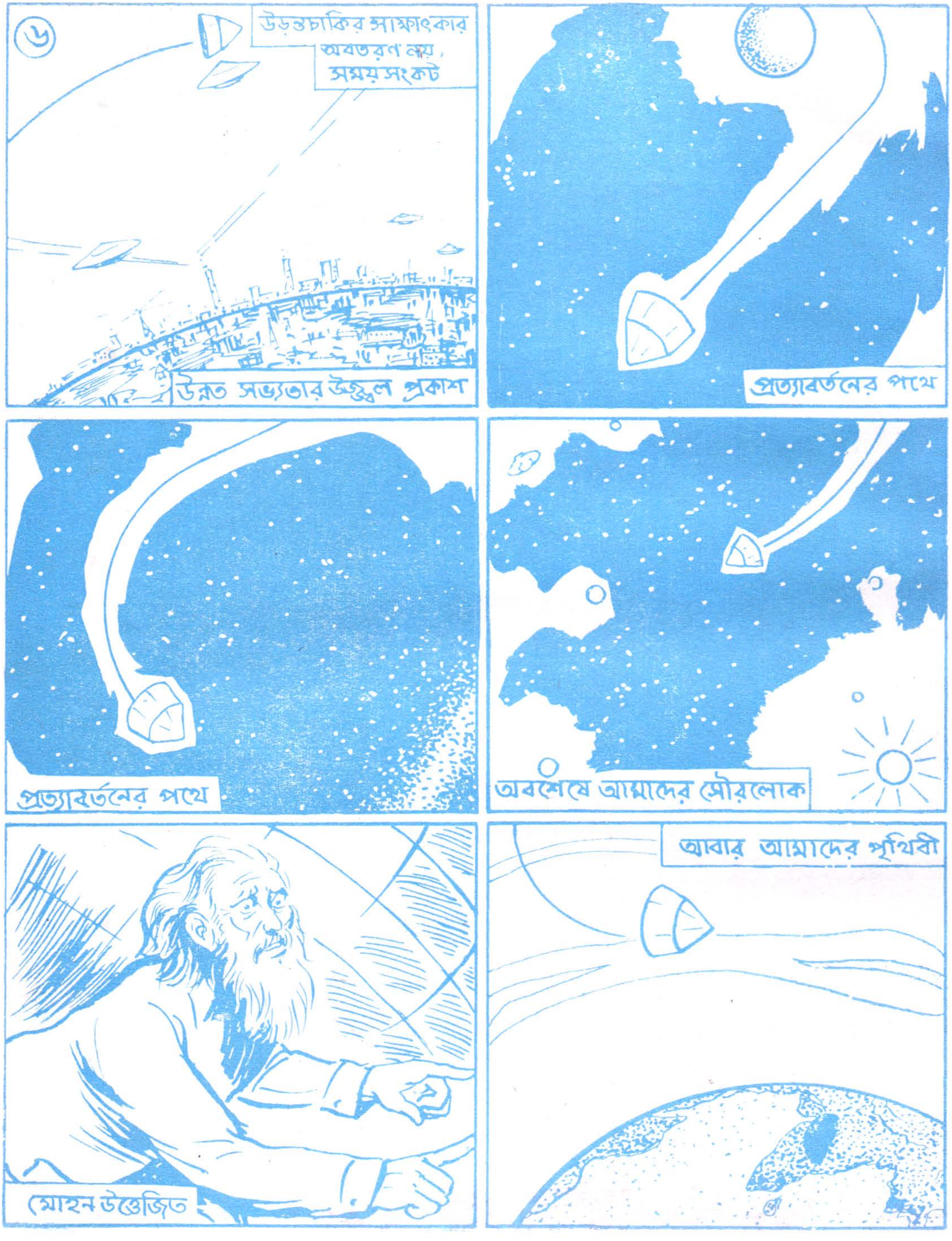
৬
উড়ন্তচাকির সাক্ষাৎকার
অবতরণ নয়, সময় সংকট
উন্নত সভ্যতার উজ্জ্বল প্রকাশ
প্রত্যাবর্তনের পথে
প্রত্যাবর্তনের পথে
অবশেষে আমাদের সৌরলোক
মোহন উত্তেজিত
আবার আমাদের পৃথিবী

প্যারাসুটে পৃথিবীপৃষ্ঠে অবতরণ
৭
ওই রে, কে নামলো দেখ দেখ!
আপনি কে? কোথা থেকে এলেন?
কাগজের অফিসে আসুন
আমি মানুষ। গ্রহান্তর থেকে ফিরছি।
২০০০ সালে আমি গ্রহান্তরে যাত্রা করে-ছিলাম। আজ ফিরছি
বলেন কি! এটা তো ২১২০ সাল। সে তো ১২০ বছর আগের ঘটনা।
কাগজের অফিস
আমিই মোহন, বল কি, ১২০ বৎসর পর ফিরছি!
এই তো, রেকর্ডে আছে বিজ্ঞানী মোহন ২০০০ সালে রকেটে ৩৫ আলোকবর্ষ দূরে গ্রহান্তরে যাত্রা করেছেন!
পরদিন সারাপৃথিবীতে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো
১২০ বৎসর পরে বিজ্ঞানী মোহনের স্বগ্রহে প্রত্যাবর্তন

গ্রহান্তরেরবাসিন্দাদের এই ছবি, এই তাদের কথাবার্তার টেপ-রেকর্ড। আমি তাদের নিমন্ত্রণ করেছি এখানে আসতে
সাংবাদিক বৈঠক
৮
আমার গ্রাম! আমার জন্মভূমি
দ্বারিক মিত্তির, তার ছেলে মোহন-চরণকে জানো তোমরা?
তারা আমার ঊর্ধ্বতন চারপুরুষ। সেবংশের বয়োজ্যেষ্ঠ এখন আমি, চরণের বংশধর। মোহন গেছে গ্রহান্তরে। ফেরেনি আর...
তোমায় কিবলে ডাকব?
আমিই চরণের দাদা মোহন। ১২০ বছর পর কাল ফিরেছি গ্রহান্তর থেকে।
হর্ষ, বিষাদ এবং হঠাৎ পরিবেশ পরিবর্তন — এই ব্যাধির কারণ।
ব্যাধির কবলে মোহন
কাগজের খবর
মোহন নেই
দারুণ খবর

কল্প-বিজ্ঞান গল্প

একটি আষাঢ়ে গল্প

লীলা মজুমদার

আজকাল নাকি স্থানাভাবে কলকাতায় বার-চোদ্দতলা বাড়ি উঠছে। একদিন যখন সব হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে, তখন ঠেলাখানা বোঝা যাবে। বাস্তবিকই যদি জায়গা-জমির অত অভাব হত, তাহলে নকুড়বাবুদের বাড়ির পাশেই, দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দেড়শো বছরের পুরনো বাড়িটাকে, তার চার বিঘে বনজঙ্গল ভরা বাগান নিয়ে, আজ তিন পুরুষ ধরে লোকচক্ষুর অগোচরে অমন করে পড়ে থাকতে হত না।

এককালে যে অনেক খরচ করে ও-বাড়ি তৈরি হয়েছিল, তার প্রমাণস্বরূপ এতকালের অব্যবহারেও দরজা-জানলা এঁটে বন্ধ, কোথাও কিছু খসে-ধ্বসে পড়েনি। সদর-রাস্তার ওপরে দশ ফুট উঁচু ফটকের প্রকাণ্ড লোহার কড়ায়, কোন কালের কোন হাকিমের হুকুমে যে বিরাট তালা লাগানো হয়েছিল, তাতে মরচে ধরলেও, ভাঙেনি।

পাড়ার লোকে বলত ভূতের বাড়ি; ভুলেও কেউ ভেতরে যাবার চেষ্টা করত না। নকুড়বাবু তার এটর্নি শ্বশুরের কাছে শুনেছিলেন, তিন পুরুষ ধরে বাড়ি নিয়ে মামলা চলে, অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে থেমে আছে; আসল ওয়ারিশরা নিখোঁজ। সন্ধ্যামণির মামার বাড়ির সঙ্গে ওদের নিকট সম্পর্ক ছিল। এমন কি সন্ধ্যামণির

মায়ের দিদিমার বিয়ে হয়েছিল ঐ বাড়িতেই। তখন বর্ষাকাল, গাঁয়ের বাড়ির চারধারে জল, নৌকা চেপে যাওয়া-আসা করতে হত। সেই বিয়ের'পর আর কেউ বড় একটা ঐ বাড়িতে বাস করছে বলে শোনা যায়নি। এদিকের এ-বাড়ির তিনতলার এই ঘরটিকে নকুড়বাবুর পড়ার ঘর, কাজের ঘর, গোঁসা ঘর, ও বিপদে আশ্রয় ঘরও বলা চলে।

এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে সন্ধ্যামণি বড় একটা ওপরে উঠতে চায় না। চারদিকে জানলা, ফুরফুর করে হাওয়া দেয়, পাখার অভাব বিশেষ টের পাওয়া যায় না। জানলাগুলোর মাঝে মাঝে প্রায় ছাদ অবধি উঁচু কালো কাঁঠাল কাঠের আলমারি, কানায় কানায় নথিপত্র, ফাইল। আইনের বই ইত্যাদি দিয়ে ঠাসা। তাকালেও দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু ঘরটি নিরিবিলি; সোজা একতলার হল্‌ঘর থেকে উঠে আসা যায়। মক্কেলরা আসেও তাই। মুশ্‌কিল হল, দোতলার বড় ঘরে সিঁড়ির দিকে মুখ করে, সন্ধ্যামণির চররা দিনরাত বসে থাকে আর কে ওপরে গেল না গেল রিপোর্ট করে। বন্ধুবান্ধবদের এখানে আনা যায় না।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, পাশের বাড়ির দোতলার বন্ধ খড়খড়ির ফাঁকে আলো দেখতে পেয়ে নকুড়বাবু একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলেন না। মনে পড়ল, ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় মাঝে-মাঝে বলত বটে, পাশের বাড়িতে ভুতেরা আলো জ্বালে। তবে ওদের কথায় কেউ বড় একটা কান দিত না। সন্ধ্যামণি ও-সব কুসংস্কার পছন্দ করে না। আজ দেখা গেল শুধু আলোই নয়, মাঝে-মাঝে একটা ছায়াও নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। আলোটা কমছে বাড়ছে কাঁপছে।

ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নকুড়বাবু ভাবলেন, রোমাঞ্চ হয়তো এইখানেই হাতের গোড়াতেই রয়েছে। অথচ তাকে এখানে খোঁজা দূরের কথা, হলুদ মলাটের রোমাঞ্চ সিরিজের বইগুলোকে পর্যন্ত নথিপত্রের মধ্যে চাপা দিয়ে লুকিয়ে বাড়িতে এনে, খবরের কাগজের মলাট দিয়ে ঢেকে, তিনতলার এই পড়ার ঘরের শক্ত কাঠের চেয়ারে বসে, গভীর রাতে দুরুদুরু বক্ষে পড়তে হয়!

কিন্তু একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই সামান্য ভয় পাওয়াটার মধ্যে যেটুকু রোমাঞ্চের আস্বাদ আছে, নকুড়বাবু তারও শেষ কণাটুকু উপভোগ করেন। রোমাঞ্চ বলতে তিনি অজ্ঞান! অবিশ্যি এর বিন্দু-বিসর্গও যদি সন্ধ্যামণি জানতে পারে, তাহলে যে নকুড়বাবুর তিনতলার এই নিঃসঙ্গ স্বর্গবাস ঘুচে যাবে, সে

বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উঠতি এটর্নিদের যে এ-সব বড়মানুষি থাকতে নেই, সন্ধ্যামণির মুখে সে-কথা নকুড়বাবু কম করে লক্ষবার শুনেছেন।

উঠতি এটর্নি হলেও, নকুড় ঢোলের বয়সটা নিতান্ত কম নয়। তবে সন্ধ্যামণি বলে আটচল্লিশ নাকি এটর্নিদের পক্ষে উঠতি বয়স। তার আগে পসার জমলেও, সেটা অস্বাভাবিক এবং অস্থায়ী। এসব বিষয়ে সন্ধ্যামণি খুব ওয়াকিবহাল, কারণ শুধু যে পসারটি গোড়াতে তার বাবার তৈরি এবং নকুড়বাবু বিলম্বিত যৌতুক হিসাবে পেয়েছেন তাই নয়—উপরন্তু সন্ধ্যামণি প্রাইভেটে বি-এ পাস্ করেছে একথা ভোলা যায়-ও না, সন্ধ্যামণি ভুলতে দেয়-ও না। সুতরাং এ-বাড়িতে সব কিছু তার হুকুমে চলে। বলা বাহুল্য, বাড়িটিও সন্ধ্যামণির বাবার কাছ থেকেই পাওয়া।

কে যেন ফুঁ দিয়ে পাশের বাড়ির আলোটা নিবিয়ে দিল। তবু নকুড়বাবু রুদ্ধশ্বাসে সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। ক্যাচ্ করে পাশের বাড়ির একতলার পেছন দিককার একটা দরজা সন্তর্পণে খুলে, একটা ছায়ামূর্তি খুব সাবধানে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিল। তারপর বাগানের বুনোগাছের ছায়ায় ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে, মনে হল যেন বাড়ির সামনের দিকে চলে গেল।

নিশ্চয় কোনো আইনভঙ্গকারী; হয়তো ওর নামে বডি ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে; প্রকাশ্যভাবে লোক সমাজে বেরুলেই ওকে ধরে নেবে। দেয়াল-আলমারিতে রাখা সারি সারি আইনের বইয়ের পুরনো কেসের ফাইলের আর রোমাঞ্চ সিরিজের ছাত্রের কাছে, এদের সম্বন্ধে কিছু জানতে বাকি নেই। রোমাঞ্চ সিরিজের কাছে নকুড়বাবুর ঋণ কোনো দিনও শোধ করা যাবে না, এ-কথা নকুড়বাবু একশোবার স্বীকার করবেন।

সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ শুনেই জানলা থেকে চোখ সরিয়ে, নকুড়বাবু টেবিলে স্তূপাকার করা দলিলগুলোর ওপর চোখ রাখলেন। দলিলের তলায় রোমাঞ্চ সিরিজ অদৃশ্য হয়ে রইল। সন্ধ্যামণি ঘরে ঢুকে, খালি তক্তপোষে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল আর ঘরময় কড়া জরদার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। নকুড়বাবু ভয়ে ভয়ে একবার চোখ তুলতেই সে বলল, 'অবিনাশবাবুর দোকান থেকে দুটো ছিপ এসেছিল, ফিরিয়ে দিয়েছি।'

নকুড়বাবু দলিলে মন দিলেন। কপালের দু পাশে দুটো শিরা প্রচণ্ড ভাবে দপদপ করতে লাগল। সন্ধ্যামণি বলল, অন্য ছিপটা কার জন্যে?

নকুড়বাবু মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। সন্ধ্যামণির কাছে বিষ্টুদার নাম পর্যন্ত

করা যায় না। কিছুই বলতে হল না। সন্ধ্যামণি নিজেই বলে চলল, 'কার জন্যে তা-ও আমার জানা আছে। ঐ নিষ্কর্মার ধাড়ি, বিষ্টু বাঁড়ুজ্জে ছাড়া আবার কার জন্যে। তাকেও ভাগিয়েছি। শনিবারের বিষয়ে কি যেন বলতে এসেছিল—দিয়েছি হাঁকিয়ে। চুল আঁচড়ায় না, দাড়ি কামায় না, কাপড় কাচায় না। ছিঃ!'

নকুড়বাবু এমনি চমকে উঠলেন যে তিনখানি দলিল একসঙ্গে পিছলে টেবিল থেকে নিচে পড়ে গেল এবং মলাটের ওপর লাল হরফে লেখা 'রক্তের নিশানা' রোমাঞ্চ সিরিজ (১৬) সন্ধ্যামণির চোখের সামনে প্রকট হল। সন্ধ্যামণি অতটা দেখতে পেল না।

নকুড়বাবুও সেটা লক্ষ্য না করেই বললেন—'ইয়ে মানে তাকে কোনো কটু কথা বল নি তো? ওর মনটা বড্ড নরম কিনা—'আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যামণি বাধা দিয়ে বলল, 'কটু কথা বলব কেন? তাকে বলে দিয়েছি শনিবার দুপুরে তোমার অন্য কাজ আছে।' নকুড়বাবুর একটু রাগ হল। ছুটির দিনেও মাছ ধরব না তো ধরব কখন?

'মাছ ধরতে হবে না। আমার বাবার নাম ভেঙে যে করে খাচ্ছ। তিনি কবে মাছ ধরেছেন শুনি? যারা টাকাকড়ি রোজগার করে, তারা কখনো মাছ ধরে? টাকা ফেললেই তাদের ঘরে পাঁচ দশ কিলো কাটা পোনা এসে উপস্থিত হয়।'

নকুড়বাবু তবু ছাড়তে চান না, 'কিন্তু তাকে যে কথা দিয়েছিলাম—'

কথা বন্ধ হয়ে গেল, হঠাৎ চোখ পড়ল পায়ের কাছে মাটির ওপরে ছোট্ট একটা সোনালি চাবি চকচক করছে। বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল, পা দিয়ে চাবিটাকে চেপে রাখলেন। এদিকে সন্ধ্যামণি তখনো থামেনি, 'রাখো তোমার কথা দেওয়া! আমি তাকে এমনি কড়া কথা শুনিয়েছি যে আমি থাকতে সে আর কখনো এমুখো হবে বলে মনে হয় না। কাল ছুটির পর তুমি আমাকে বোনের বাড়ি নিয়ে যাবে।'

এই বলে সন্ধ্যামণি দুমদুম করে নিচে চলে গেলে, চোখ বন্ধ করে নকুড়বাবু মনে মনে বলতে লাগলেন, 'হে ভগবান' ও যদি সত্যি সত্যি না থাকত কি ভালোটাই যে হত!' তারপর নিজের চিন্তাতে নিজেই আঁৎকে উঠে, জিব কেটে বললেন, 'তাই বলে বলছি না যে ও মরে যাক। তার অনেক ঝামেলা, ভগবান, তুমি তো সব-ই জান। কিন্তু ধর যদি না-ই জন্মাত, তাহলে আমি কি সুখীই না হতাম!'

চোখের সামনে ভেসে উঠল বিষ্টুদার ঠাকুরদার আমলের পুরনো পুকুরের পাড়ে,

প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছের ছায়াতে, ঘাটের ভাঙা সিঁড়ির ওপর পাশাপাশি বসে বিষ্টুদ আর উনি। কেউ কোনো কথা বলছেন না। পাশে বিস্কুটের টিনের মধ্যে কেঁচো কিলবিল করছে, পিঁপড়ের ডিম গাদা হয়ে আছে, মুখবন্ধ কৌটোতে মাছ ধরার মশলা। ভাবতে ভাবতে তার একটুখানি গন্ধ যেন নকুড়বাবুর নাকে এল! নাঃ, এর একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে আবার জানলা দিয়ে, পাশের বাড়ির বাগানের ওপর চোখ পড়ল। ছায়ামূর্তিটা এ-গাছের নিচে, ও-গাছের নিচে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা, সন্ধ্যামণি যদি না-ই জন্মাত, কি এমন ক্ষতিটা হত? —আচ্ছা, সেই অদ্ভুত চাবিটা কোথায় গেল! মাটি থেকে সেটিকে অন্যমনস্ক ভাবে নকুড়বাবু পকেটে ভরলেন।

সে শনিবারটা সত্যিই মাঠে মারা গেল। বোনের বাড়ি গিয়ে সন্ধ্যামণি মহা হৈ-চৈ করে এল। বোনের মেয়ে মিনু একজন পাঁচশো টাকা মাইনের ডাক্তারকে বিয়ে করতে চায়। তাই সন্ধ্যামণির পরামর্শে সেই বেচারা ডাক্তারকে ডাকিয়ে এনে যা-নয়-তাই বলে অপমান করা হল। মিনু কেঁদে কেঁদে সারা। একবার তাকে একা পেয়ে নকুড়বাবু বললেন, 'ওদের কথা শুনিস্‌নে, এখন চুপ করে থাক্, আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করব দেখিস্।' কি ব্যবস্থা করবেন অবিশ্যি নিজেই জানেন না।

এই নিয়ে পরদিন অর্থাৎ রবিবার, সন্ধ্যামণি মহা রাগমাগ করে, চাকর দিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়ে মাসির বাড়ি চলে গেল! সন্ধ্যামণি বাড়ি ছাড়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যে নকুড়বাবু বিষ্টুদার বাড়ি গিয়ে তাঁকে টেনে বের করে এনে, নিউ স্পোর্টসের মালিক অবিনাশের কাছ থেকে সেই ছিপ দুটি উদ্ধার করে, কালী কেবিন থেকে ঝুড়ি বোঝাই পরটা, সামি কাবাব, বিরিয়ানি আর মটন কোর্মা কিনে, মুটের মাথায় চাপিয়ে নিজে প্রকাণ্ড ওয়াটার বট্‌ল্ কাঁধে ঝুলিয়ে, বিষ্টুদার ঠাকুরদার পুকুরের ধারে সারা দিন কাটিয়ে দিলেন। বাড়ির লোকে জানল উনি চুঁচড়োয় বড় মক্কেলের বাড়ি গিয়েছেন। বাড়ির লোক বলতে সন্ধ্যামণির বুড়ি পিসি, তাঁর বিধবা পুত্রবধূ, সন্ধ্যামণির সই আর তার বেকার স্বামী এবং তিনটি বংশধর। নকুড়বাবুর নিজের মেয়ের কোন-কালে খুব ভালো বিয়ে হয়ে গেছে; ছেলে খড়্গাপুরে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। বলা বাহুল্য এরা এবং ঠাকুর চাকর ঝি ঝাড়ুদার সবাই সন্ধ্যামণির স্পাই।

সন্ধ্যাবেলায় জলের বোতল, খাবারের প্রায় খালি ঝুড়ি, মাছ ধরার সরঞ্জাম

বিষ্টুদার বাড়িতে জমা দিয়ে, মনের খুশিতে তিন-তিনটে রোমাঞ্চ সিরিজ কিনে দোকানদারকে দিয়ে নিয়ম মাফিক খবরের কাগজের মলাট লাগিয়ে, বাড়ির পথ ধরলেন। মোড়ের মাথায় পৌঁছে নিজেদের আধা-অন্ধকার গলিতে ঢুকতে যাচ্ছেন, এমন সময় লক্ষ্য করলেন, দশ মিটার সামনে আপাদমস্তক কালো কাপড়-চোপড় পরা একটা মূর্তি হনহনিয়ে চলেছে। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলেও, প্রথমটা নকুড়বাবু ঠাওর করতে পারেননি লোকটা কে। কিন্তু যেই সে পাশের বাড়ির বিশাল তালা লাগানো দশ ফুট উঁচু ফটকের সামনে কৃষ্ণচুড়ো গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, পকেট থেকে লম্বা একটা চাবি বের করে ফটকের গায়ে বসানো ছোট কাটা দরজাটি খুলে ফেলল, তখন আর তাকে চিনতে বাকি রইল না।

ঠিক তারপরেই যা ঘটল তা এমনি আকস্মিক ও অ-প্রত্যাশিত যে নকুড়বাবুর যেন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল। হঠাৎ ফোঁশ করে ফটকের নিচেকার আগাছার মধ্যে থেকে যেই না একটা সাপ ফণা তুলেছে, অমনি এক রকম নিজেরই অজ্ঞান্তে নকুড়বাবু তাঁর লোহা বাঁধানো লাঠির এক বাড়িতে তার মাথা ভেঙে দিয়েছেন। লোকটার হাতে একটা ছোট্ট দু-সেলের টর্চ। তারি আলোয় দেখা গেল মরা সাপের শরীর তখনো পাকে পাকে ঢেউ খেলছে। তাই দেখে লোকটা শিউরে উঠল।

তার হাত দুটো থর থর করে কাঁপছিল, টর্চের আলো লগ্‌বগ্‌ করছিল, অন্ধকারে তার মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। ঠাণ্ডা একটা হাত দিয়ে নকুড়বাবুর হাত চেপে ধরে ভাঙা খন্‌খনে গলায় সে বলল আসুন, ভেতরে আসুন। আজ আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

এ রকম একটা চেহারার লোকের মুখে এমন স্তব্ধ ভাষা শুনে নকুড়বাবু বেশি অবাক হলেন না, কারণ রোমাঞ্চ সিরিজে এর চেয়েও অনেক বেশি অপ্রত্যাশিত ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে।

আনন্দে, উত্তেজনায় অধীর হয়ে লোকটার পেছন পেছন কাটা দরজা দিয়ে তিনি ভুতের বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। লোকটি খুব সাবধানে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে বলল, 'চাবিটা নিজেই করে নিয়েছি। আমার নাম অর্ধেন্দু পাকড়াশী। আসুন।'

[দুই]

আঃ, কি আনন্দ! এতদিনের কৌতূহল এবার চরিতার্থ হতে চলেছে। তিন পুরুষ বাদে ভূতের বাড়িতে আবার এই প্রথম মানুষের পা পড়ল—অবিশ্যি কালো পোশাক পরা লোকটাকে বাদ দিলে—বাগান তো নয়, যেন সোঁদরবন। এককালে বাড়ির চারদিকে পাথর দিয়ে বাঁধানো দশ ফুট চওড়া রাস্তা ছিল; এখন তার ফাটলে ফাটলে ঘাস, আগাছা, বাড়ন্ত অশ্বত্থগাছ। বাড়ির পেছন দিকের দরজাটি নিঃশব্দে খুলে অর্ধেন্দু বলল, 'আমার সুখ শান্তি নিরাপত্তা, এমনকি প্রাণটা পর্যন্ত আপনার হাতে তুলে দিলাম। উপকারীকে আমি নমস্য দেবতা বলে মনে করি।' এই বলে হঠাৎ ঢিপ করে নকুড়বাবুর ময়লা পামসুতে কপাল ঠেকিয়ে, দরজা ঠেলে অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তারপর ক্ষীণ টর্চ জ্বেলে বলল, 'নির্ভয়ে চলে আসুন, এ সবই আমার বহুকালের জানা, কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই।' আসবাবে বোঝাই ধুলোয় ধূসর হলঘরটিকে সাবধানে পেরিয়ে ওর পেছন পেছন নকুড়বাবু শ্বেতপাথরের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন। সিঁড়ির মাথায় একটা খালি সিগারেটের টিনে মোমবাতি গোঁজা। পকেট থেকে দেশলাই বের করে সেটি জ্বেলে, পথ দেখিয়ে নকুড়বাবুকে একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ঘরে নিয়ে গিয়ে মহা খাতির করে অর্ধেন্দু তাঁকে একটা ন্যাড়া তক্তাপোষে বসতে দিল।

তারপর তাঁর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?' নকুড়বাবু এমনি আঁৎকে উঠলেন যে জিব কামড়ে গেল। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'না—মানে, নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করি না।'

লোকটি হাসল। সে যে কি বিশ্রী খট্‌খটে হাসি, না শুনলে কল্পনা করা যায় না। নকুড়বাবু জিব দিয়ে একবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। লোকটি তাই দেখে নরম গলায় বলল, 'না, না, লজ্জা পাবার কিছু নেই; আমি তিন কাল ঘুরে দেখেছি ভূতফুত কিচ্ছু নেই। হ্যাঁ, তবে সেকালের লোক, যাঁরা কোনকালে পঞ্চত্ব পেয়েছেন, তাঁদের যে মাঝেমাঝে এখানে ওখানে দেখা যায় না, এ-কথা বলছি না।

নকুড়বাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, থুতনি দেড় ইঞ্চি ঝুলে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে লোকটার কাছ থেকে একটু সরে বসতেই, সে-ও আবার কাছে ঘেঁসে বসে বলল, 'কোনো ভয় নেই। বলছি তো ভূতফুত কিচ্ছু নেই। মল তো

একেবারে পঞ্চত্ব পেল আর তার দেখা দেবার উপায় থাকে না। যা কিছু করবার বেঁচে থাকতেই করতে হয়। নকুড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে যে এইমাত্র বললেন পঞ্চত্ব পাওয়াদেরও মাঝে মাঝে দেখা যায়?

লোকটি উঠে দাঁড়াল, 'কি মুশকিল! জ্যান্ত অবস্থাতেই অনেক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভবিষ্যত ঘুরে আসতে পারেন তো, তখন ভবিষ্যতের লোকরা তাঁদের দেখতে পেলে, ভূত ভাববে না তো কি ভাববে? কিন্তু আসলে তাঁদের নিজেদের সময় তাঁরা তখনো বেঁচেই আছেন—'

এই অবধি শুনে নকুড়বাবুকে মাথা চুলকোতে দেখে অর্ধেন্দু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি? বিশ্বাস হল না বুঝি? দেখুন, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আমার নমস্য দেবতার মতো আপনি, কিন্তু আপনার বুদ্ধিটাকে খুব প্রখর মনে হচ্ছে না। —তবে এই দেখুন!' এই বলে লোকটা তার গলাবন্ধ কোটের আস্তিন একটু গুটিয়ে নিল। নকুড়বাবু দেখলেন তার হাতের কব্জিতে একটা অদ্ভুত হাতঘড়ি, এক গোছা সরু সরু তারের ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা। অবাক হয়ে বললেন, 'কি এটা?'

'দেখুন না। অত ভয় কিসের? খুলে ভালো করেই দেখুন না।' অদ্ভুত বটে ঘড়িটা। মুখটা অনেকটা টেলিফোনের ডায়েলের মতো; ঐ রকম ০ থেকে ৯ সংখ্যা গোল করে সাজানো, ঐ রকম একটা কাঁটা লাগানো, ডায়েলটাকে ঐ রকম করেই ঘোরানো যায়।

অর্ধেন্দুর দিকে নকুড়বাবু এবার ভালো করে তাকালেন। ভারি নিরীহ চেহারা, বছর ৩০ বয়স হবে; সামনে পেছনে ছোট করে কাঁচাপাকা চুল ছাঁটা, মুখময় সাতদিনের গোঁফ-দাড়ি, কানটা একটু লম্বা, লতিটা গালের সঙ্গে জোড়া। সেদিকে চোখ পড়তেই লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আমাদের বংশের সব ছেলেমেয়েদের-ই এই রকম কানের লতি জোড়া আর পায়ের আঙুলের ফাঁকে হাঁসের পায়ের মতো পাতলা চামড়া লাগানো। এই বলে বকলস লাগানো ময়লা জুতোর মধ্যে থেকে একটা পা বার করে, আঙুল ফাঁক করে দেখাল।

নকুড়বাবু ঘড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ডায়েলের ধার দিয়ে আরো দুটি খুদে কাঁটা এবং বারো মাসের নাম আর ১ থেকে ৩১ সংখ্যাও লেখা রয়েছে লক্ষ্য করলেন। অর্ধেন্দু বলল, 'নিশ্চয় এতক্ষণে টের পেয়েছেন যে আমি একজন

…দরের বৈজ্ঞানিক। এইচ্ জি ওয়েল্সের টাইম মেশিন নিয়ে আপনারা এত …লেন, ছবি করলেন, অথচ সেটা একটা বেধড়কা বড়, অতি আনাড়ি ব্যাপার। কোথাও নিয়ে গেলে, নিরাপদ জায়গায় রাখাই এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। অমনি ভিড় দাঁড়িয়ে যাবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হয়রাণ হতে হবে। জটিল সব যন্ত্রপাতির একটা কলকব্জা বিগড়োলেই তো হয়ে গেল। থাকুন পড়ে পঞ্চাশ-শো সালে। এই অনেকটা আমার যেমন হয়েছে, যদিও এ ঘড়িটার ব্যাপার অনেক সাদাসিধা। দুঃখের বিষয় চাবিটা কোথায় পড়ে গেছে।'

নিশ্বাস বন্ধ করে নকুড়বাবু ওর কথা শুনছিলেন, দারুণ উত্তেজনায় ফোঁশ ফোঁশ করে নিশ্বাস পড়ছিল। চাপা গলায় বললেন 'চাবির ব্যবস্থা হলে তবে কি এই ঘড়িটার সাহায্যে অতীত কিম্বা ভবিষ্যতে যেখানে খুশি যাওয়া যাবে?'

অর্ধেন্দু বিরক্ত হয়ে উঠল, 'যেখানে খুশি আবার কি? এটা কি একটা বাইসিক্ল্ যে যেখানে খুশি যাবেন? যখন খুশি বলুন। ঐ ১ থেকে ৯ অবধি যতগুলি সংখ্যা আছে আর তার সঙ্গে ০ জুড়লে, কোন রাশিটা না হয় বলুন? অর্থাৎ কোন সময়ে না যাওয়া যায় বলুন? দেখতে পারেন বৃত্তের ধারে এ-ডি আর বি-সি দুই-ই চিহ্ন করা আছে। ঐ ছোট্ট কাঁটাটি যেখানে দরকার সরিয়ে নেবেন। তারপর ব্যস্! মাস তারিখ ঠিক করে নিয়ে, ডায়েল ঘোরাবেন! এখন ঐ চাবিটা নিয়েই যত ভাবনা। ওটি দিয়ো দম না দিলে কালের কল এক সেকেণ্ড-ও চলবে না।'

নকুড়বাবুর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। কাষ্ঠ হেসে বললেন—'চাবিটা যদি খুঁজে দিই, আমাকে ঘড়িটা একবার পরতে দেবেন?'

তিন হাত লাফিয়ে উঠল অর্ধেন্দু। 'না, না, তাতে কাজ নেই। শেষটা কি হতে কি হয়ে যাবে। আপনি বরং এবার বাড়ি যান, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ঘড়ির কথা ভুলে যান।'

নকুড়বাবু তখনি উঠে পড়ে বললেন, 'থাক তবে চাবিটা।' অর্ধেন্দুর চেহারাই বদলে গেল। এক গাল হেসে নকুড়বাবুর হাত চেপে ধরে বলল, 'না' না, তাই বললাম নাকি? মিছিমিছি বিরক্ত হচ্ছেন। এর অনেক বিপদ, অনেক ঝামেলা। তার থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যেই—শেষটা না জেনেশুনে—'

নকুড়বাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'না জেনেশুনে আবার কি? জানেন আমি ল'

পরীক্ষায় জলপানি পেয়েছিলাম —না জেনেশুনে কেউ পায় ? তারপর সাড়ে তিনশোর বেশি রোমাঞ্চ সিরিজ পড়েছি ।'

অর্ধেন্দু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'চাবিটার জন্যে আমি সব দিতে পারি। এই দেখুন আরেকটা ঘড়ির সব তৈরি, কিন্তু ঐ চাবিটার ছাপ না পেলে আরেকটা চাবি হবে না ।'

এই বলে গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে এক মুঠো ছোট্ট ছোট্ট কলকব্জা। স্ফটিকের টুকরো ইত্যাদি বের করে দেখাল । তারপর আবার বলল, 'সব দিতে পারি, বুঝলেন, আমার যা আছে, সব । কই চাবিটা ?'

নকুড়বাবু পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলেন । তার সব চেয়ে ছোট খোপ থেকে চাবিটাকে বের করে অর্ধেন্দুর হাতে দিয়ে বললেন—'নিন্ আপনার চাবি, বড় পয়মন্ত জিনিস । পেতে না পেতে যে সুযোগ কেউ পায় না, তাও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে । এবার বলুন কবে ঘড়ি পরতে দেবেন ? কাল রাতের মধ্যে না হলেই নয় । তারপর আর আমার সেরকম সুবিধা হবে না বোধ হয় ।

অর্ধেন্দু অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'বেশ, তাই দেব । আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনাকে অদেয় আমার কিছু নেই ।'

নকুড়বাবু উঠে বললেন, 'তাছাড়া চাবিও খুঁজে দিয়েছি ।' 'হ্যাঁ, কোথায় পেলেন ওটাকে ?'

'পাশের বাড়ির তিনতলায় আমার ঘরে । এটাই আমার আশ্চর্য লাগছে ।'

'আশ্চর্যের কিছুই নেই । কালান্তরে যেতে হলে, ছোট্ট একটা জিনিস একটু ইদিক-ওদিক ছিটকে খুবই পড়তে পারে । সে যাকগে, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান । আমি আজ রাতেই নতুন চাবিটা করে ফেলব । কালকেই ঘড়ি পরতে পারবেন । আচ্ছা নমস্কার । আমার টর্চটা নিয়ে পথ দেখে যাবেন । কাল ফিরিয়ে দিলেই হবে । অনেক পাপ করে এটি জোগাড় করতে হয়েছে ।

অর্ধেন্দু পাকড়াশী যেন তাঁকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে । নকুড়বাবু সহজে নড়েন না । এতকাল বাদে অন্ধকারের মধ্যে একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখেছেন আর অমনি অমনি চলে গেলেই হল কিনা ।

অর্ধেন্দু দরজা অবধি এগিয়ে বলল, 'কই, উঠুন ।'

নকুড়বাবু বললেন, 'মানে—ইয়ে—ঘড়ির সাহায্যে যে-কোনো কালে গিয়ে কি শুধু ছায়ার মতো দেখা দেব, নাকি কথা বলতে, কাজ করতে পারব ?'

অর্ধেন্দু হাসল, 'বিলক্ষণ পারবেন। কেন পারবেন না ? সুস্থ জ্যান্ত মানুষ আপনি। খুব আদিম কালে না গেলে ভাষা-টাষারও কোনো অসুবিধে হবে না। তবে একটি কথা সর্বদা মনে রাখবেন। কালের ফলে অন্য কালেই শুধু যাওয়া যায়, অন্য জায়গায় না। যেখানে দাঁড়িয়ে কল ঘোরাবেন, ঠিক সেখানেই থেকে যাবেন, খালি সময়টা পেছিয়ে বা এগিয়ে যাবে, যেমন চাইবেন। যদি অন্য জায়গায় যেতে চান, সেকালের যানবাহনের ওপর নির্ভর না করে, ট্রেনে কিম্বা মোটরে, কিম্বা উড়োজাহাজে সেখানে পৌঁছে, তবে ডায়েল করাই ভালো।' নকুড়বাবু অধীর হয়ে বললেন, 'না, না, অন্য কোথাও আমি যেতে চাই না। এতেই আমার হবে।'

অর্ধেন্দু একটু হাসল। 'এখানেও যে বড্ড নিরাপদ তা ভাববেন না। বাপ্‌স্! একদিন অন্যমনস্ক হয়ে বড্ড বেশি আগে চলে গেছিলাম, তারপর এক বিরাট শুঁয়োপোকার তাড়া খেয়ে পালিয়ে যেতে পথ পাইনে। এ জায়গাটাও সেকালে খুব নির্ভয় ছিল না!' নকুড়বাবু সংক্ষেপে বললেন, 'অত আগে যাব না।'

বাড়ি ফেরার পথে কথাটা ভেবে হাসি পেল। অত আগে যাবার দরকারটা কি ? সন্ধ্যামণি যাতে না জন্মায়, তার ব্যবস্থা করে ফেললেই হল। অর্থাৎ তার মা-বাবার বিয়েটি ঘটতে না দিলেই তো কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল। কিন্তু মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল। বড্ড কানের কাছ দিয়ে ঘেঁসে যাওয়া হচ্ছে না কি ? তাছাড়া ওঁদের বিয়ে হয়েছিল বোম্বাই শহরে, সেখানে এখন যাবার সময়-ও নেই। অবিশ্যি সন্ধ্যামণির দিদিমার বিয়েতে বাগড়া দিলেও চলে। তাহলে সন্ধ্যামণি দূরের কথা। ভারি সরদারি করত বুড়ি। কিন্তু তাঁদের বিয়ে হয়েছিল নাকি লছমনঝোলায়, গুরুদেবের আশ্রমে। এ সবের চেয়ে সন্ধ্যামণির মায়ের দিদিমার বিয়েটি পণ্ড করে দিলেই তো আপদ চোকে। কোথাও যেতে হবে না ; এই পাশের বাড়িতেই বিয়ে হয়েছিল ; কোনো অসুবিধে নেই।

এত কাল ধরে এত কেস্ দেখলেন, শুনলেন, পড়লেন, ঘাঁটলেন নকুড়বাবু আর এই সামান্য কাজটুকু করতে পারবেন না ? কোনো অসুবিধাই নেই। ওঁদের বংশপরিচয় আছে সন্ধ্যামণির দেরাজে ; তাতে বুড়োবুড়ির বিয়ের সন তারিখ দেওয়া

আছে। রাতে শুয়ে শুয়ে প্ল্যান্‌টাকে আরো পাকিয়ে নেওয়া গেল। বিয়ে ঠিক করার চেয়ে যে বিয়ে ভাঙা অনেক সহজ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বিশেষ করে সেকালের বিয়ে। মেয়ের বিষয়ে দুচারটে মনগড়া নিন্দা বরপক্ষের কানে তুলে দিলেই হল। শুধু ঐ মেয়ে কেন, ওর বোনেদের-ও বিয়ে দেওয়া দায় হয়ে উঠবে। তবে মেয়েদের অনিষ্ট করতে নকুড়বাবুর বিবেকে বাধে। অবিশ্যি সন্ধ্যামণিকে নেই করে দেওয়া তো আর ওর অনিষ্ট করা নয়। বরং উপকার করা। কারণ সে তো অষ্টপ্রহর বলে নকুড়বাবুর স্ত্রী হওয়ার চেয়ে না জন্মানোও শতগুণে ভালো। সে যাই হক্‌ গে, মোটকথা সন্ধ্যামণির মায়ের দিদিমার বিয়ের বরটিকে যে করে হক ভাগাতে হবে। দরকার হলে পিটিয়ে কিম্বা ভয় দেখিয়ে।

ঘুম থেকে উঠে নকুড়বাবু অবাক হয়ে টের পেলেন যে ঘুমের মধ্যেই সমস্ত পরিকল্পনাটি দিব্যি তৈরি হয়ে গেছে। কি করে যে সারা দিনটি কেটেছিল, সে কথা আজ-ও নকুড়বাবু ভেবে পান না। সোমবার এমনিতেই এত কাজের চাপ থাকে যে সময় কাটল কি কাটল না, তা ভাববারও সময় থাকে না। সে যাই হোক, একসময় সত্যি করে সন্ধ্যে হল। নকুড়বাবু নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে পাশের বাড়ির দোতলার সেই ঘরখানিতে অর্ধেন্দুর কাছে হাজির হলেন। নিচের দরজাগুলো খোলাই ছিল।

অর্ধেন্দু ভারি নার্ভাস। 'দিচ্ছি তো ঘড়িটা আপনাকে বিশ্বাস করে। শেষটা একটা যাচ্ছেতাই ফ্যাসাদ পাকাবেন না তো? আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, তাই আমি এবং আমার চোদ্দ পুরুষ আপনার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব, এই কি যথেষ্ট হত না।'

নকুড়বাবু কর্কশ গলায় বললেন, 'না, হত না। কথা দিয়ে কথার খেলাপ করতে চান নাকি, অর্ধেন্দুবাবু?'

অর্ধেন্দু বলল, 'আমার আসল নাম অর্ধেন্দু নয়। নিন্? ধরুন ঘড়িটা। আমার সততা সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবে, এ আমার অসহ্য। তবু আপনার ভালোর জন্যেই জিজ্ঞাসা করি কোন সালে যেতে চান? তার জন্যে ভালো করে প্রস্তুত হয়েছেন কি? শেষটা যদি বিপদে পড়েন, নিজেকে অপরাধী মনে হবে। আপনি হলেন প্রাণদাতা।'

বাঁ হাতের কব্জিতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে নকুড়বাবু বললেন, 'আমার পরিকল্পনা তৈরি। আমার জন্যে অত ভাববেন না। তাছাড়া বেশি আগেও যাব না। মাত্র

একশো বছর আগের, অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখ হলেই আমার চলে যাবে। ঐ তারিখে এই বাড়ির একটা বিয়ে পণ্ড করতে হবে। ব্যস, আর কিছু নয়।'

অর্ধেন্দু অর্থাৎ অর্ধেন্দু নামে যে লোকটা নিজেকে চালাচ্ছিল, সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, দাঁতে দাঁতকপাটি লাগতে শুরু করল। নকুড়বাবু ডায়েল করতে যাবেন, তাঁর হাত সে চেপে ধরল। এক ঝাঁকানি দিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলে, নকুড়বাবু বললেন, 'সরে দাঁড়ান। আপনার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল উপভোগ করবার আমার, ন্যায্য অধিকার নেই বলতে চান? চাবি খুঁজে দিইনি?'

অর্ধেন্দু মরিয়া হয়ে বলল, 'আছে, আছে, সত্যি দিয়েছেন। কিন্তু ও-সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলেই কি ভালো হত না? তাছাড়া আরেকটু ব্যবস্থা না করেই গেলে যে আপনি সেকালে পৌঁছবেন একেবারে উদোম হয়ে।'

শুনে নকুড়বাবু থ'। 'তাহলে? তাহলে কি হবে?'

অর্ধেন্দু আবার সেই শুকনো খটখটে হাসি হাসল। আমি বৈজ্ঞানিক। সে ব্যবস্থা কি আর করিনি? কেন, আমার গায়ে কি কাপড়চোপড় নেই বলতে চান?'

এই বলে পকেট থেকে দুটি চুলের মতো সরু পিন্ বের করে, নকুড়বাবুর জুতোর তলায় আটকে দিল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যান এবার। কি আছে কপালে কে জানে। দুগ্গা দুগ্গা মধুসূদন!' তার কথার সঙ্গে সঙ্গে নকুড়বাবু ডায়েল ঘোরাতে লাগলেন। আগে তারিখ, মাস ঠিক করে, তারপর সাল ঠিক করলেন। ডায়েল ঘোরাচ্ছেন আর অর্ধেন্দুর কথাগুলো যেন ক্রমে কি রকম অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ঘরের মোমবাতি থেকেও যেন আরো বেশি ধোঁয়া বেরুচ্ছে। শেষ একবার মনে হল অর্ধেন্দু ওঁর জুতো পরা পায়ে মাথা ঠেকাচ্ছে। তারপর চট্ করে চোখে একটু অন্ধকার দেখলেন, মনে হল পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সেবার পচা চিংড়ি খেয়ে যেমন হয়েছিল, কান বোঁ-বোঁ করতে লাগল, হাতে-পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরল।

এক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে আবার সামলেও নিলেন। দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল, হাত-পা স্থির হল। কান বোঁ-বোঁর বদলে মনে হল সানাইয়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। ঘরের কোণে মোমবাতির বদলে যে কারবাইড গ্যাস জ্বলছে, সেটা প্রথমে

খেয়াল হয়নি। গা হাত পা ঝেড়েঝুড়ে দেখে নিলেন, নাঃ, সব ঠিক-ই আছে—হাতে ঘড়ি, জুতোর তলায় কাঁটা।—'কি, হচ্ছেটা কি? তুই কেরে অলপ্পেয়ে? মিষ্টির ঘরে কেন সেঁদিয়েছিস্? মৎলবটা কি তোর?'

কানের কাছে কর্কশ গলার স্বর শুনে এমনি চমকে উঠলেন নকুড়বাবু যে প্রথমটা মুখ দিয়ে কথাই সরল না। তাছাড়া এ রকম বিরাট সাইজের মহিলাও তিনি কখনো দেখেননি। পরনে একখানা চওড়া লাল পাড় গরদ, ব্যস্! স্রেফ্ আর কিচ্ছু নয়। কিন্তু গলার বিছে, কোমরের চন্দ্রহার, হাতের অনন্ত তাগা চুড়ি বালা নিয়ে কিলো দুইয়ের কম হবে না।

মাথার কাপড় খসে গেছে, চওড়া সিঁথিতে মোটা সিঁদূরের দাগ, কপালে এই বড় সিঁদূরের ফোঁটা, মুখে পান, পায়ে আলতা, বয়স বছর পঞ্চান্ন।

হাঁ করে নকুড়বাবু তাকিয়ে রইলেন, কি বলবেন ভেবে পেলেন না। মহিলা হাঁকডাক জুড়ে দিলেন—'কে তুই? কি চাস্? আমি বলে খেয়ে না খেয়ে মিষ্টির ঘর আগলাচ্ছি, এমন সময় মতিরানী এসে বলে কি না জোড়াসাঁকোর দেবেন ঠাকুর এয়েছে। একটু গেছি দেখে আসতে আর অমনি ঘরে চোর ঢুকেছে! কি নাম তোর?'

ততক্ষণে হট্টগোল শুনে সোনার তাগা, গলায় সোনার চেন, গেঞ্জি আর ফিনফিনে ধুতি পরা, টেরি কাটা, কানের পেছনে আতরের টিপ গোঁজা, জনা দু-চার ফুল-বাবু এসে জুটেছেন। সব চাইতে পেছনের বাবুটি কাকে যেন বললেন, 'আমার গুপ্তিটা আন্ দেখি।'

বেগতিক দেখে নকুড়বাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'ইয়ে—দেখুন—আমি চোর নই, আমার নাম নকুড়চন্দ্র ঢোল, কিছু একটা ভুল—'

'কি নাম বললেন—ঢোল? ছি ছি ছি, বড়বৌদি, কাকে কি বলছ? উনি তাহলে বরের মামার বাড়ির কেউ হবেন। দেখুন জোড় হাতে মাপ চাইছি, আমাদের অপরাধ হয়ে গেছে—মেয়েদের যদি কোনো বুদ্ধি থাকে, চোর কখনো আদ্দির পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম পরে আসে—ছি ছি ছি। কিছু মনে করবেন না, মশাই।'

দেখতে দেখতে হাওয়া বদলে গেল, আদর যত্নের তুলনা হয় না। স্নানের জল, বড় তোয়ালে, শান্তিপুরে ধুতি, আদ্দির পিরান, কোঁচানো উড়ুনি, সব এসে গেল।

আবার চানের ঘর থেকে বেরুলে একটা রোগাপানা অতি চালাক চাকর ওঁর কানের পেছনে আতরের টিপ গুঁজে দিল।

তাহলে এই রকম ঘটা করে সন্ধ্যামণির মায়ের দিদিমার বিয়ে হয়েছিল। সানাই মিলিটারি ব্যাণ্ড, বাই নাচ, যাত্রা, শখের থিয়েটার, কিচ্ছু বাদ নেই।

নকুড়বাবুর জুতো ওপর থেকেপালিশ করতে করতে চাকরটা বলে যেতে লাগল। 'এ জুতোটা ফেলে দিন, বাবু, এ কি বিয়ে-বাড়ির জুতো হল? এমন অদ্ভুত পচাটাং ও কখনো দেখিনি। নতুন এক জোড়া নিয়ে আসি, ঠিক এই মাপে?'

আ সব্বনাশ! জুতো ছাড়বেন কি! জুতোর তলাকার কাঁটাটি খুলে পড়ে গেলেই তো হয়ে গেল! বাড়ি ফিরতে হবে উদোম গায়ে। হাত-ঘড়িটিও এদের নজর বাঁচিয়ে অনেক কষ্টে রাখতে হয়েছে। জুতো ছাড়াতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত লোকটা নকুড়বাবুকে ছেড়ে দিল। দোর-গোড়ায় জোড়-হাতে যে ফরসা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি কনের বাবা। এই হেনস্তার কথা যেন বর-কর্তার কানে না ওঠে, এই তাঁর মিনতি।

নকুড়বাবু হেসে ফেললেন, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ বিষয়ে কেউ বিন্দু বিসর্গও জানতে পারবে না।'

হঠাৎ পাশের বাড়ির দিকে চোখ পড়ল। এখন যেখানে তাঁদের নিজেদের তিনতলা বাড়ি শোভা পায়, সেখানে নানা রকম ঘোড়ার গাড়ির ভিড়। বরযাত্রীরা সভায় বসেছে; গান-বাজনা হচ্ছে; বিয়ের লগ্নের একটু দেরি আছে। নকুড়বাবু বুঝতে পারলেন বড্ড কাঁচা কাজ হয়ে গেছে। এক দিন হাতে রাখা উচিত ছিল। এখন বিয়ের লগ্ন এল বলে কি করতে যে কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কন্যা-কর্তা তাঁকে নিয়ে, বরের কাকা বর-কর্তার পাশে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি ভাবছিলেন নকুড়বাবু বরপক্ষের কোনো শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয়। আর বরের কাকা ভাবছিলেন, উনি কনেপক্ষের একজন গুরুস্থানীয় কেউ। সুবিধা এই যে এই সুযোগে বর-কর্তার কানটি পাওয়া গেল।

কিন্তু বাঘের মতো চেহারা ভদ্রলোকের, ঝুলো গোঁফ. বাবরি চুল, ঘোর কালো গায়ের রং এবং অসুরের মতো বল, কানে এই বড় বড় লোম। একটু দমে গেলেও, নকুড়বাবু বুঝলেন শেষ মুহূর্তে কাপুরুষের মতো পেছপাও হলে, এমন সুযোগ আর

পাওয়া যাবে না। তবে বরের কাকার কাছে এগুলো তাঁর কর্ম নয়। বরের কাছে গেলে বরং কিছু হতে পারে বলে মনে হল। একজন পাকা এটর্নির পক্ষে একটা ছোকরা সাক্ষী ভাঙানো খুব শক্ত কাজ নয়। গুটি গুটি গেলেন তার কাছে।

দেখলে মায়া হয়। বয়স কুড়িও নয়। রোগা; কাকা যেমন কালো, এ তেমনি ফরসা। কপালের ওপর গোছা গোছা কোঁকড়া চুল, পরনে জরির বর্ডার দেওয়া রেশমি পাঞ্জাবী, তার একপাশ দিয়ে চুনী বসানো বোতাম, গলায় সোনার হার। নকুড়বাবুকে হঠাৎ এত কাছে এসে বসতে দেখে একটু ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। এই বেচারির ওপর রোমাঞ্চ সিরিজের পুরনো একটা পাট লাগাতে নকুড়বাবুর লজ্জাও করছিল, কিন্তু এমন অবস্থায় ও-সব বড়মানুষি করলে চলবে না। তাই ছোকরা বরের কানের কাছে মুখ নিয়ে, দাঁতে দাঁতে ঘসে, চাপা গলায়, নকুড়বাবু বললেন, 'কেটে পড় এখান থেকে যদি ভালো চাও।'

ছেলেটা যেন কাঠ হয়ে গেল। নকুড়বাবু আরো বললেন, 'চ্যাঁচামেচি করেছ কি মরা মানুষ হয়ে গেছ।' ঠিক এই কথাই রোমাঞ্চ সিরিজের ৫৫ কি ৫৬ নংএর নায়ক বলেছিল। নকুড়বাবু ফিসফিস করে বললেন, 'আস্তে আস্তে হাওয়া হয়ে যাও। সাত দিনের মধ্যে যদি এ-মুখো হও তো আর দেখতে হবে না। এ মেয়ে তোমার জন্যে নয়। যাও কর্পূর হও। নইলে তোমাকে আশী বছর জেল খাটানো আমার পক্ষে কিছু নয়। এতে তোমার লাভ-ই হবে। মেয়ে বড় বদ্‌রাগী। ফলটাও রোমাঞ্চ সিরিজের মতোই হল। বাস্তবিক খাসা লেখে ওরা, তা ইংরিজি থেকে চুরিই হক আর যা-ই হক। ছেলেটা আস্তে আস্তে খসে পড়ল। কখন যে গেল শুধু অন্য লোকে কেন নকুড়বাবু নিজেও টের পেলেন না। তাঁর একটু নার্ভাস লাগছিল; কোনো মতে লগ্ন পার করা চাই। ঐ বরের সঙ্গে ঐ লগ্নে বিয়ে না হলে, অন্য যে-কোনো বরের সঙ্গে হতেই হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালোমানুষের মতো এইখানে বসে থাকা চাই। অবিশ্যি মেয়েটার জন্যে অন্য একটা ভালো পাত্র ঠিক করে দিতে হবে। সে বেচারি তো কোনো দোষ করেনি! হয়তো বদ্‌রাগী নয়।

এখন পাত্র কোথায় পাওয়া যায়? ভিড়ের মধ্যে নকুড়বাবু পাত্র খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। ঐ থামটার পাশে কৌচে বসে, ঐ লোকটাকে অর্ধেন্দুর মতো লাগছে না? তাই তো অর্ধেন্দুই তো বটে! দিব্যি

ধুতি পাঞ্জাবী উড়ুনি গায়ে দিয়ে এসেছে। কি মতলব ওর? শেষটা সব পণ্ড করে দেবে না তো? বুকটা টিপটিপ করতে লাগল। কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করতে আসেনি তো? ওর কাছে নিজের উদ্দেশ্যটা খুলে বলা বোধ হয় ভুল হয়েছিল। যা ভয় করেছিলেন ঠিক তাই হল। অর্ধেন্দু হঠাৎ কৌচ ছেড়ে উঠে গিয়ে, কন্যাকর্তার কানে কানে কি যেন বলল।

সঙ্গে সঙ্গে বর কই! বর কোথায় গেল! খোঁজ খোঁজ রব উঠল। ততক্ষণে লগ্নও এসে গেছিল। দেখতে দেখতে চার দিকে হুলস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

দশ মিনিট বাদে কন্যাকর্তা পাইক এনে নকুড়বাবুকে ঘেরাও করে ফেললেন। 'সব বুঝেছি। ভালো করে বললাম, তবু কানে তুললেন না। এইভাবে অপমানের শোধ তুললেন? আচ্ছা আমিও কম যাই না। এই বিয়ে, এই লগ্নেই আমি দেব। এবং আপনি যেমন পাত্র ভাগিয়েছেন, আপনাকেই তার জায়গা নিতে হবে।' পাইকরাও গোল হয়ে নকুড়বাবুকে ঘিরে দাঁড়াল।

মরিয়া হয়ে নকুড়বাবু চারদিকে তাকালেন। কি সাংঘাতিক নিজের শাশুড়ির দিদিমার সঙ্গে বিয়ে! হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে অর্ধেন্দুকে দেখা গেল। ততক্ষণে বরপক্ষীয়রা থানায় খবর দেবে বলে শাসাতে শাসাতে সভা ছেড়ে চলে গেছিল। অর্ধেন্দুর মুখে সে কি বিশ্রী হাসি। নকুড়বাবুর বিপদ দেখে তার হাসি পাচ্ছে! হঠাৎ নকুড়বাবুর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল চিৎকার করে বললেন—'ঐ, ঐ, ঐ যে ঐ বর! ঐ দেখুন ছদ্মবেশ ধরে এসেছে।'

এক মুহূর্তে জন্য সকলের চোখ যেই না সেই দিকে ফিরেছে, অমনি নকুড়বাবুও ১৯৮০ সালে ডায়েল ঘুরিয়ে দিলেন। চাবি দিয়ে, মাস তারিখ আগেই ঠিক করে রেখে ছিলেন; খালি সালটি বাকি ছিল। ঐ এক মুহূর্তের জন্য মনে হল অর্ধেন্দু সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকাল। তার পরেই সব ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেল, কান বোঁ-বোঁ করতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল, পায়ের নিচের মাটি সরতে লাগল, বিয়ে বাড়ির কোলাহল ক্রমে ক্ষীণ শোনাতে লাগল। তারি মধ্যে কেমন যেন অস্পষ্টভাবে মনে হল অর্ধেন্দুর মুখের ভাবটা পাল্টে গিয়ে, গাল দুটি হাসিতে ভরে গেছে!

তারপরেই নকুড়বাবু আঁৎকে উঠলেন। ই কি কাণ্ড! হুড়মুড় করে এ যে কোথাকার এক এঁদো পুকুরে এসে পড়েছেন! এখন প্রাণটা বুঝি যায়!

বেশি দূরে নয়, আসলে পাশের বাড়ির বন-জঙ্গলে ঢাকা ঘাট-বাঁধানো পুকুরেই পড়েছিলেন। এ পুকুরটি তাহলে আগে ছিল না ; এই জায়গাতেই তো মস্ত চাঁদোয়া খাটিয়ে বিয়ের সভা বসেছিল। কি আশ্চর্য! একশো বছর আগেকার সেই সভা নকুড়বাবু এইমাত্র ছেড়ে এসেছেন! বাঁ হাতের কব্জির দিকে চোখ পড়ল। কি সর্বনাশ! ঘড়িটা কোথায় খুলে পড়ে গেছে, শুধু খানিকটা ছেঁড়া তার হাতে জড়ানো! থাক গে, ঘড়ি দিয়ে আর কি হবে? কার্যসিদ্ধি তো হয়েই গেছে। বাকি তার-গুলোকেও খুলে পুকুরে ফেলে দিতে গিয়ে নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়ল। কি সর্বনাশ! তাঁর যে পরনে কিছু নেই। এতক্ষণে মনে পড়ল যে বিয়ের সভায় পিন্ আঁটা জুতো খুলে রেখে, ফরাসে বসে মখমলের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরাম করছিলেন! জুতোজোড়া সেখানেই রয়ে গেছে!

একটু হাসলেন নকুড়বাবু। তারপর নিঃশব্দে বুগানভিলিয়া গাছ বেয়ে তিন তলার ছোট ছাদে গিয়ে উঠলেন। তখন শেষ রাত, কেউ কোথাও নেই। এবার ভাঙা কাচের মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে, ছিটকিনি নামিয়ে, ঘরে ঢোকা কিছুই শক্ত নয়। বলা বাহুল্য, এ পথে আসা-যাওয়া এই তাঁর প্রথম নয়।

স্নানের ঘরে ঢুকে গায়ে মাথায় খুব খানিকটা জল ঢেলে, শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, ফরসা কাপড় পরে, নকুড়বাবু যখন শয্যা নিলেন, তখন কালান্তরে যাত্রার সমস্ত গ্লানি কেটে গেছে। খিদের পেট চোঁ-চোঁ করছিল। বিয়ে-বাড়ির পেল্লায় ভোজ ছেড়ে আসতে হল বলে একটু দুঃখও যে না হচ্ছিল, তাও নয়। যাই হোক, নিজের কালে, নিজের দেশে, নিজের ঘরে, বড় এক ঘড়া ঠাণ্ডা জল-ই বা মন্দ কি! পাশের বাড়িতে এক ঘণ্টা আগেও এত হৈ-চৈ হট্টগোল হচ্ছিল, এখন সব অন্ধকার, নিঝুম। মধ্যিখানে একশো বছরের ব্যবধান। কি কলই করেছে অর্ধেন্দু! বালিশে মাথা রাখা মাত্র ঘুম।

সে ঘুম ভাঙল—অনেক বেলায়, সন্ধ্যামণির ব্যাকুল ডাকাডাকি আর দরজায় ধাক্কাতে। সন্ধ্যামণি? তার তো জন্মাবার কথা নয়? তবে কি শেষ পর্যন্ত ঐ কচি বরটাকেই ধরে এনেছিল? ইশ্, এত করেও কিছু হল না? আসলে যথেষ্টই হয়েছিল! ঘরে ঢুকেই সন্ধ্যামণি নকুড়বাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল। আর সে কক্ষনো রাগমাগ করবে না। তার কানের দিকে তাকিয়ে নকুড়বাবু লক্ষ্য করলেন কান দুটো বেশ বড় আর লতিটা গাল জোড়া। তাছাড়া পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে হাঁসের পায়ের মতো খানিকটা আলগা চামড়া। অর্ধেন্দু বলেছিল ওদের বংশের সবার এই রকম থাকে। মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। নাঃ, অর্ধেন্দু বড় ভালো। তবে সাক্ষাৎ বুড়ো-দাদাশ্বশুর হয়ে বারবার নকুড়বাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করাটা ঠিক হয়নি।

নকুড়বাবু হাসিমুখে সন্ধ্যামণিকে বললেন, 'ছি, ছি, ও কি করছ, আমি একটুও রাগ করিনি। আজ একটু ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর দিকিনি। কাল আমার একটা কেস বড় ভালোভাবে শেষ করতে পেরেছি।'

কলকাতায় প্রথম শবব্যবচ্ছেদ

ডাঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী

মানবদেহ আশ্চর্য যন্ত্রের সমষ্টি। জন্মের পর থেকে যন্ত্রগুলি তাদের নির্দিষ্ট কাজ যথানিয়মে করে যায়, মৃত্যু পর্যন্ত সে কাজের বিরাম নেই। চর্মদ্বারা আবৃত থাকায় অনেকগুলি যন্ত্রই বাইরে থেকে দেখা যায় না। করোটিতে সুরক্ষিত আছে মস্তিষ্ক, বক্ষগহ্বরের মধ্যে রয়েছে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ; উদরগহ্বরে রয়েছে পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্ক, শ্রেণীগহ্বরে রয়েছে মূত্রথলি, প্রজননতন্ত্রের যন্ত্র ইত্যাদি। দেহের কাঠামোটা তৈরি হাড় দিয়ে, তার সঙ্গে লেগে আছে পেশী। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক,এই ইন্দ্রিয়গুলি মানুষের অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি যন্ত্রের যেমন নির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষমতা আছে, তেমনি একটি কাজের জন্য কয়েকটি যন্ত্রের একযোগে কাজ করার প্রয়োজন হয়। এই রকম বিভিন্ন যন্ত্রের সমষ্টিকে নিয়ে তৈরি হয় একটি তন্ত্র। মানবদেহ নানা তন্ত্র দিয়ে গঠিত। এই তন্ত্রগুলি হল, পেশী ও অস্থিতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র, রেটিকুলো এণ্ডোথিলিয়াল ও লসিকাতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, পৌষ্টিকতন্ত্র, রেচন-তন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, অন্তর্নিস্রাবী গ্রন্থি তন্ত্র, প্রজনন তন্ত্র। কোন একটি তন্ত্র বা যন্ত্র বিকল হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তখন ডাক পড়ে চিকিৎসকের, একে মেরামত করার

জন্য। বিকল যন্ত্র সারাবার জন্য চিকিৎসকদের জানতে হয় শরীরে যন্ত্র সম্বন্ধে সব রকমের তথ্য। বই পড়ে শরীরস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু মৃতদেহ কেটে প্রতিটি যন্ত্র চাক্ষুষ দেখে যে জ্ঞান হয়, তার সঙ্গে বইপড়া জ্ঞানের তুলনাই হয় না। তাই মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের শবব্যবচ্ছেদ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রাচীনকালে ভারতে ও মিশরে চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার্থীদের শবব্যবচ্ছেদ করতে হত। বিখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সুশ্রুত শবব্যবচ্ছেদের প্রণালী বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করেছেন। সুশ্রুত সংহিতায় বিষ-দূষিত মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের অনুপযুক্ত। দীর্ঘকাল রোগে ভুগে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তেমন ব্যক্তির মৃতদেহও ব্যবচ্ছেদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। অতি বৃদ্ধ ব্যক্তির শব ব্যবচ্ছেদ করা অনুচিত। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া স্কুল চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। সেখানে শারীরস্থান বিষয়ে শ্রেষ্ঠপণ্ডিত ছিলেন হেরোফিলাস এবং এরাসিস্‌ট্রেটাস সম্ভবতঃ তাঁরা দুজনেই জন্মেছিলেন খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ তে।

ইউরোপে শবব্যবচ্ছেদ শুরু হয় অনেক পরে। অ্যারিস্টটল (খ্রীঃপূঃ ৩৮৪-৩২২) শারীর স্থানের বর্ণনা দেন। রোমের চিকিৎসক গ্যালেন (খ্রীঃ ১৩০-২০০) মানব-দেহের বিভিন্ন তন্ত্রের বর্ণনা দেন। কিন্তু তাঁরা মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করেন নি। জন্তুর বা বানরের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মানুষের শারীরস্থান সম্বন্ধে ধারণা করেছিলেন। গ্যালেন তাঁর ছাত্রদের বলতেন, যদি শারীর-স্থান শিখতে চাও, তবে আলেকজান্দ্রিয়াতে যাও। ইউরোপে মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা শুরু হয় ইতালির বলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। অস্বাভাবিকভাবে যাদের মৃত্যু হত, তাদের মৃতদেহই শুধু ব্যবচ্ছেদ করা হত। বলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর স্থানবিদ মাণ্ডিনাস অ্যানাটমির উপর একটি গ্রন্থও লেখেন। যদিও গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ, তবে তা অ্যানাটমির উপর প্রথম পুস্তক। শরীর বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হয় রেনেসাঁর যুগে। এই যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম ইতালির লিওনার্দো দ্য ভিন্‌চি (১৪৫২-১৫১৯), বেলজিয়ামের এণ্ড্রিয়াস ডেসেলিয়াম (১৫১৪-৬৪) এবং ইংলণ্ডের উইলিয়ম হার্ভে (১৫৭৪-১৬৫৪)।

শিল্পী লিওনার্দো শিল্পীর মন নিয়ে মানবদেহের গঠন জানতে আগ্রহী হন। তিনি নিজের হাতে শবব্যবচ্ছেদ করেছেন এবং মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের চিত্র অঙ্কন

করেছেন। একদিকে তিনি যেমন সৃষ্টি করেছেন 'মোনালিসা', 'লাস্ট সাপার' প্রভৃতি অপূর্ব চিত্র, অন্যদিকে এঁকেছেন মানুষের হৃৎপিণ্ড, মাতৃগর্ভে শিশু প্রভৃতি অসামান্য চিত্র। হৃৎপিণ্ডের চিত্রটিতে কপাটিকাগুলি পর্যন্ত অতি স্পষ্ট। মানুষের হৃৎপিণ্ডে চারটি প্রকোষ্ঠ। উপরের দিকের দুটি প্রকোষ্ঠ বাম ও দক্ষিণ অলিন্দ একটি তন্তুর মত প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা, নীচের দিকের দুটি প্রকোষ্ঠ বাম ও দক্ষিণ নিলয় তন্তুর মত প্রাচীর দ্বারা আলাদা করা। বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝখানে রয়েছে একটি ছিদ্র। এই ছিদ্রটি আবদ্ধ থাকে দ্বিমুখ কপাটিকা দ্বারা। দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয়ের মাঝখানেও আছে একটি ছিদ্র, তা আবদ্ধ থাকে ত্রিমুখ কপাটিকা দ্বারা এই কপাটিকাগুলি রক্তকে অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে।

এণ্ড্রেসেলিয়াসের জন্ম ব্রাসেল্‌সে, পড়াশুনা করেন প্যারিসে। তারপর আসেন ইতালির পাদুয়াতে। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সেখানে অ্যানাটমির অধ্যাপক হন। তিনি শারীরস্থানের অনেক নূতন তথ্য উন্মোচন করেন। তিনি অ্যানাটমির উপর একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন।

উইলিয়ম হার্ভের জন্ম কেন্টে। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য আসেন পাদুয়ায়। লণ্ডনে ফিরে যোগ দেন কলেজ অব ফিজিশিয়ান্‌স্ এ। হার্ভে রক্তসংবহন সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বহু জায়গায় অ্যানাটমির স্কুল স্থাপিত হয়। এই সময়েই লণ্ডনে ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শারীর স্থানাবিদ জন হান্টার (১৭২৮-৯৩)। কিন্তু ব্যবচ্ছেদের জন্য মৃতদেহ সহজলভ্য ছিলনা। একদল লোক ছিল, তাদের ব্যবসাই ছিল অ্যানাটমির স্কুলগুলিতে মৃতদেহ সরবরাহ করা। তারা লুকিয়ে কবর থেকে মৃতদেহ তুলে এনে বিক্রী করত। এক বীভৎস ঘটনা ঘটল এডিনবরায়। বার্ক ও হেয়ার নামে দুই ব্যক্তি মৃতদেহ সংগ্রহ করার এক অদ্ভুত উপায় বার করল। এক ব্যক্তি হেয়ারের কাছ থেকে চার পাউণ্ড ধার নেয়। কিন্তু ঋণ শোধ করার আগেই সেই লোকটি হঠাৎ মারা যায়। হেয়ার তার বন্ধু বার্কের সহায়তায় গোপনে শবাধার থেকে মৃতদেহটি সরিয়ে ফেলে এবং সার্জন্‌স্ স্কোয়ারে ৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং এ বিক্রী করে। দুই বন্ধু এই আশাতীত লাভে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু কে কবে মরবে, তার জন্য অপেক্ষা না করে তারা যে বাড়িতে

থাকত সে জায়গাটা একটু নির্জন। রাস্তা দিয়ে কোন বৃদ্ধ বা পঙ্গু ব্যক্তিকে যেতে দেখলেই তারা তাকে ডেকে বাড়িতে নিয়ে আসত এবং প্রচুর মদ্যপান করাত। সে যখন প্রায় বেহুঁশ, তখন তারা তাকে হত্যা করত এবং মৃতদেহ বিক্রী করত কোন শারীর-স্থানবিদের কাছে। ১৮২৭ সালের নভেম্বর মাসে তারা এই হীন কাজ শুরু করেছিল। এক বৎসর ধরে ব্যবসা ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু একটু ভুলের জন্যে তারা ধরা পড়ে গেল। এক বৃদ্ধার মৃতদেহ বাড়ির এক কোণে খড় দিয়ে ঢাকা ছিল, তা বাড়িওয়ালার নজরে পড়ে এবং সন্দিহান হয়ে সে পুলিসকে খবর দেয়। ইতিমধ্যে মৃতদেহটি বিক্রী করা হয়েছে, ডাঃ রবার্ট নকেসর কাছে। পুলিস অনুসন্ধান চালাল এবং নকেসর শবব্যবচ্ছেদ কক্ষে মৃতদেহটি উদ্ধার করল। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে আতঙ্কের ঝড় উঠল। বার্ক ও হেয়ারকে সকলে ধিক্কার দিতে লাগল। নকসেরও বাদ গেলেন না। বার্ককে গ্রেপ্তার করা হল এবং বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হল। কিন্তু হেয়ার কোথায়? সে পালিয়েছে। লণ্ডনের রাস্তায় কয়েকজন লোক হেয়ারকে চিনে ফেলে এবং চোখে চূণ ঢেলে অন্ধ করে দেয়। এরপর হেয়ার আরো ৫০ বৎসর বেঁচেছিল। লণ্ডনের অকসফোর্ড স্ট্রীটে ভিক্ষা করে জীবন-ধারণ করেছে।

ভারতে যে আয়ুর্বেদ উন্নতির শীর্ষে উঠেছিল, কালক্রমে তার অবনতি হতে লাগল। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পরিবর্তে দেখা দিল কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস। শবের প্রতি লোকের মনে কুসংস্কারের অন্ত নেই। শবস্পর্শ করলে শুচিতা নষ্ট হয়, এক বর্ণের শব, অন্য বর্ণের লোকের স্পর্শ করা পাপ, এই সব অযৌক্তিক ধারণা সকলের মনে দানা বাঁধল। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ শবব্যবচ্ছেদ ত্যাগ করলেন।

ভারতে ইউরোপীয় চিকিৎসাপদ্ধতি দ্রুত প্রসার লাভ করে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর। বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৭৩৫ সালের ২৮শে জানুয়ারীতে এক ঘোষণাপত্রে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। ডাঃ এম. জে ব্রামলে হলেন কলেজের অধ্যক্ষ, অন্যান্য অধ্যাপকগণ হলেন হেনরী হ্যারী গুডিব ও উইলিয়াম ব্রুক ও'স্যানেসী। কিছুদিন পর সংস্কৃত কলেজ থেকে এলেন পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। গুডিব শরীর বিজ্ঞান ও ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক আর ও স্যানেসী রসায়নের। ১লা জুন সোমবার কলেজে পড়ান শুরু হয়।

শারীরস্থান পড়াতে গিয়ে গুডিব শবব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি এডিনবরার এম. ডি.। ছাত্রাবস্থায় নিজে শবব্যবচ্ছেদ করেছেন। প্রথমে তিনি কাঠের মডেলের সাহায্যে শারীরস্থান শেখাতেন। পরে মেষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে ছাত্রদের দেখাতেন। তারও পরে মানুষের মৃতদেহের কোন কোন অঙ্গ এনে নিজে ব্যবচ্ছেদ করে দেখাতেন। এইভাবে তিনি আস্তে আস্তে ছাত্রদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করলেন। একদিন গুডিব একটি সম্পূর্ণ মৃতদেহ টেবিলের উপর রেখে বক্তৃতা দিলেন। ছাত্রদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা, কিন্তু কারো মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। গুডিব বুঝলেন, শবব্যবচ্ছেদের এই উপযুক্ত সময়।

পঞ্চাশজন ছাত্র নিয়ে মেডিকেল কলেজ শুরু হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সেরা প্রথম চারজন ছাত্র হলেন, রাজকৃষ্ণ দে, উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্দ্র মিত্র। স্থির হল পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত এই চারজন ছাত্রকে নিয়ে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করবেন, গুডিব তাঁদের নির্দেশ দেবেন। ১৮৩৬ সালের ২৮ অক্টোবর। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। কলেজের একটি ঘরে একটি মৃতদেহ রাখা হয়েছে। ঘরে প্রথমে ঢুকলেন গুডিব, পিছনে মধুসূদন এবং চারজন ছাত্র। অধ্যাপকরা সকলেই এসেছেন, ছাত্রদের মধ্যে যারা সাহসী তারা ভিতরে ঢুকছে আর বাকীরা দরজা, জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। সকলের দৃষ্টি মধুসূদনের হাতের দিকে। তাঁর হাতে একটি ছুরি। গুডিব নির্দেশ দিলেন, বুকের এই জায়গায় ছুরিটি বসাও। মধুসূদন ছুরিটি শক্ত হাতে ধরে বুকের মধ্যে চালিয়ে দিলেন। ছাত্ররা এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল। এবার তারা জোর শ্বাস ফেলল, যেন এক বিরাট উৎকণ্ঠা থেকে তারা নিষ্কৃতি পেল। এবার রাজকৃষ্ণ দে ছুরি নিলেন এবং অত্যন্ত নিস্পন্দতার সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ করলেন। উমাচরণ, দ্বারকানাথ এবং নবীনচন্দ্র ও দেহের কয়েকটি অংশ ব্যবচ্ছেদ করলেন। ঐদিন মেডিকেল কলেজে নূতন যুগের সূচনা হল। মধুসূদন যে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন, তার উল্লেখ আছে, সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় এবং ১৮৫০ সালে মেডিকেল কলেজে মধুসূদনের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচনের সময় ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুনের উক্তিতে। ব্রামলি মধুসূদনের কথা বলেন নি কারণ তিনি ছিলেন শিক্ষক।

মধুসূদনের জন্ম বৈদ্যবাটীতে, সম্ভবতঃ ১৮০০ সালে। তাঁর পিতার নাম বলরাম গুপ্ত। শৈশবে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ একেবারেই ছিল না। সেজন্য একবার তাঁর পিতা তাঁকে শাস্তি দেন, রাগ করে মধুসূদন বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। নিজের চেষ্টায় ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হওয়ার আগে কলকাতায় মেডিকেল স্কুল ছিল। তা স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৪ সালে। এই বিদ্যালয়ের হার্ট বিভাগ ছিল। সংস্কৃত কলেজে এবং উর্দুতে ক্লাশ হত মাদ্রাসায়। সংস্কৃত ক্লাসে ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে আয়ুর্বেদও পড়ান হত। মধুসূদন সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই সময় তিনি অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন এবং শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। বৈদ্যক শ্রেণীর জনৈক শিক্ষক পণ্ডিত ক্ষুদিরাম দাস অবসর গ্রহণ করলে মধুসূদন তাঁর জায়গায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেটা ১৮৩০ সাল। মধুসূদন সে সময় ছাত্র ছিলেন, একজন সহপাঠীকে শিক্ষক নিযুক্ত করার অন্য সহপাঠীরা ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিবাদে কেউ কেউ ক্লাশে আসা বন্ধ করেন। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর মধুসূদন সেখানে ডেমনস্ট্রেটর পদে যোগ দেন '৮৩৫ সালের ১৭ মার্চ। তাঁর বেতন হল মাসে একশত টাকা। মধুসূদন কলেজের শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতিতে তিনি ১৮৪০ সালে পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ হয়ে সার্টিফিকেট লাভ করেন।

মধুসূদন চিকিৎসা বিদ্যার কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। সংস্কৃত কলেজে কাজ করার সময়ই তিনি সুপারের 'Anatonist Vademecum' সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। তা প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে। এই কাজের জন্য সরকার তাঁকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেন। ১৮৪৯ সালে প্রকাশ করেন, 'লণ্ডন ফার্মা কোপিয়ার' বাঙলা অনুবাদ এবং ১৮৫২ সালে বাঙলা গ্রন্থ অ্যানাটমি বা শারীর বিদ্যা।

মধুসূদনের তিন পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ গোপাল চন্দ্র গুপ্ত মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রদের অন্যতম। ১৮৫৬ সালে মধুসূদনের মৃত্যু হয়।

ছাত্রদের মধ্যে প্রথম যিনি শবব্যবচ্ছেদ করেন তিনি রাজকৃষ্ণ দে। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বৎসরে দুহাজার টাকা পুরস্কার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ স্থির করেন শবব্যবচ্ছেদ ও রসায়ন শ্রেণীতে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। ১৮৩৭ সালে ২৯শে জুন প্রথম

বার পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শবব্যবচ্ছেদ শ্রেণীতে রাজকৃষ্ণ দে ও অন্য কয়েকজন, 'দ্বারকানাথ পুরস্কার' লাভ করেন। ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসে মেডিকেল

কলেজের প্রথম পরীক্ষা হয়। এগারজন ছাত্র পরীক্ষায় বসেন এবং মাত্র চারজন

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এঁরা হলেন উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ দে ও নবীনচন্দ্র মিত্র। এরপরই রাজকৃষ্ণ দে সরকারী কাজে যোগ দেন সাব-অ্যাসিস্টান্ট সার্জন পদে। তাঁকে দিল্লীতে পাঠান হয়। কিন্তু সেখানে মাত্র এক বৎসর কাজ করার পর ১৮৪০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা অকালে বিনষ্ট হয়ে গেল। লর্ড অকল্যাণ্ড রাজকৃষ্ণ দের বিধবা স্ত্রীকে ৩০০ টাকা সাহায্য দেন।

উমাচরণ শেঠ ক্লাশের সেরা ছাত্র ছিলেন। তিনি রসায়ন শ্রেণীতে 'দ্বারকানাথ পুরস্কার' লাভ করেন। মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন। উমাচরণ ১৮৩৯ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারী আগ্রা ডিস্‌পেন্‌সারিতে সাব অ্যাসিস্টান্ট সার্জন পদে যোগ দেন। দীর্ঘ ৩৪ বৎসর উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করেন। কলকাতায় ফিরে এসে প্র্যাকটিসে বসেন এবং প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৮৮ সালের জুন মাসে। তাঁর বংশধরগণ তাঁর একটি তৈলচিত্র ১৯২২ সালে মেডিকেল কলেজকে দেন।

দ্বারকানাথ গুপ্তও যথেষ্ট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি শবব্যবচ্ছেদ ও রসায়ন দুটি শ্রেণীতেই 'দ্বারকানাথ' পুরস্কার লাভ করেন। মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি 'কাকরেল কোমপানি হাউসে' চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পারিবারিক চিকিৎসকও ছিলেন। তিনি ম্যালেরিয়ার ওষুধ প্রস্তুত করে যশস্বী হয়েছিলেন। সে সময়ে পাথুরিয়াঘাটায় ডি.গুপ্তের ওষুধের দোকান সুপরিচিত ছিল। কাকরেল কোম্পানির সাহেবদের সহায়তায় তিনি বিদেশ থেকে উৎকৃষ্ট ওষুধ আনাতেন ন্যায্য দামে বিক্রী করতে চেষ্টা করতেন।

নবীনচন্দ্র মিত্রও 'দ্বারকানাথ' পুরস্কার পান শবব্যবচ্ছেদ ও রসায়ন শ্রেণীতে। তিনি প্রথমে কাজ করেন লক্ষ্ণৌতে, পরে আসেন কালনায়। সুচিকিৎসক হিসাবে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন।

বর্তমানে মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে শবব্যবচ্ছেদ একটি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তা ছিল একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত এই বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর অদম্য উৎসাহের ফলেই সম্ভব হয়েছিল কলকাতায় প্রথম শবব্যবচ্ছেদ।

তলোয়ার থেকে ফুল

ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী

বিজ্ঞানী মইম্যান হো হো করে হেসে উঠলেন—বললেন বন্ধুগণ আজ বলতে পারি এমন জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি যার ফলে সমস্ত পৃথিবী আজ আমার মুঠোর ভিতর এসে গেছে।

ছোট আকারের বিজ্ঞানী সম্মেলন। ডাঃ মইম্যানের সহকারী ডাঃ হিউজেস আগের পরিচয়ের খাতিরে আমাকে এই ঘরোয়া বৈঠকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। না হলে ওঁদের ঐ বৈঠকে আমার যাবার কোনও সুবিধাই হত না। আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম—আমাকে মাপ করবেন ডাঃ মইম্যান আপনি কি আবিষ্কার করেছেন তার সঠিক বিবরণ আমি জানি না। তবে একথা বলতে পারি যে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভাল করবার কাজেই তাঁদের সব বুদ্ধিটুকু খাটাবেন এই আশা করে মানুষ। কাজেই মারণ রশ্মি আবিষ্কার করে আপনি ভাল কাজ করেননি।

মইম্যান চোখ কুঁচকে আমাকে দেখলেন। বললেন—তাহলে তুমি কি বলতে চাও ডাঃ অটো হান পরমাণু বোমা আবিষ্কার করে পৃথিবীর অমঙ্গল করেছেন। আমি জোর দিয়ে বললাম নিশ্চয়ই।

মইম্যান ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে বললেন, দুর্বল দেশের বিজ্ঞানীরা শান্তির বাণী আওড়ায় কারণ তারা আমাদের ভয়ে ভীত।

বিদ্রূপের খোঁচা খেয়েও হজম করতে হল।

কিন্তু কি সেই অস্ত্র যা নিয়ে ডাঃ মইম্যানের এত দম্ভ? এর নাম হল লেজার রশ্মি! (Laser Ray) ব্যাপারটা এত জটিল যে আমার কিশোর কিশোরী বন্ধুরা বুঝতে পারবে না। তাই সহজ করে বলি। রুবি বা চুনি পাথর, যা লোকে গয়নায় বা আংটিতে ধারণ করে, তারই মধ্যে থেকে নানা প্রক্রিয়ায় বের করা হয় এক আলোর রশ্মি। এই রশ্মির মজা হচ্ছে এই যে এই আলো অন্য আলোর মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না। সোজা লম্বা লাইন ধরে এর তরঙ্গ এগিয়ে চলে। সেইজন্য এই তরঙ্গ বহু সহস্র মাইল ধরে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে। অন্য রকম আলোর তরঙ্গের আঘাতেও দুমড়ে বেঁকে যায় না। বহু হাজার মাইল চালিয়ে কোনও কিছুর গায়ে আলো ফেলে আবার তার প্রতিফলন ফিরিয়ে আনা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই লেজার রশ্মি পৃথিবী থেকে চাঁদের গায়ে ফেলে প্রতিফলন ফিরিয়ে আনলে চাঁদের অনেক রহস্য চাঁদে লোক না পাঠিয়েও জানা যাবে। আর এই লেজার রশ্মি কেন্দ্রীভূত করলে এত তাপ সৃষ্টি করা যাবে যে যার উপরে এই রশ্মি ফেলা যাবে তা নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ভারতে ফিরে এসে আমি আমার বন্ধু হাইডেলবুর্গের শান্তিবাদী বিজ্ঞানী ডাঃ এডলফ হানসকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিলাম। আমার উদ্বেগের কথাও তাঁকে জানালাম। ১৯৬২তে তার চিঠি পেলাম, তিনি লিখেছেন:

প্রিয় ডাঃ বাগচী,

তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি শান্তিবাদী, তোমার এই উদ্বেগ হতেই পারে। তবে মইম্যানের যা ধারণা তা ভুল। ঐ লেজার রশ্মি নিয়ে রাশিয়ার দুই বিজ্ঞানী বাসোভ আর পপোরভ গবেষণা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। আমেরিকার অন্য এক বিজ্ঞানী চার্লস টাউনও একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। এবং সফলও হয়েছেন। এইরকম রশ্মি একচেটিয়া হলে বিপদ আসা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু বাসোভ আর পপোরভ কতদূর এগিয়েছেন জান। তাঁরা বহু দূরের কোনও বস্তুর গায়ে লেজার রশ্মির প্রতিফলন ঘটিয়ে সে বস্তুকে দেখার কাজেও অনেক এগিয়ে গেছেন। তাঁদের প্রাথমিক সাফল্যের পর তাঁরা স্থির করলেন যে ককেশাস পর্বতের খুব উঁচু এবং দুর্গম এলাকা তাঁরা জরীপ করবেন এই রশ্মির সাহায্যে।

ককেশাসের বত্রিশ মাইল দূরে তারা এই রশ্মির পরীক্ষাগার বসালেন। তারপর শুরু করলেন ককেশাস পর্বতের দুর্গম এবং লোকশূন্য অঞ্চলের জরীপ। লেজার রশ্মি তাদের যন্ত্র থেকে বেরিয়ে ককেশাসের গায়ে লেগে আবার ফিরে এসে প্রতিফলন ঘটাতে লাগল তাদের রাডারে। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন ঐ দুর্গম অঞ্চলে যেন ছোট ছোট বাড়ির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বার বার পরীক্ষা করে তাঁরা পূর্ত বিভাগের কর্তাদের ডাকলেন এই বলে যে ওখানে কিসের জন্য ছোট ছোট বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা জানালেন যে ওটা দুর্গম জঙ্গল। লোকজনের বসতি নেই ওখানে তাঁরা কিসের জন্য বাড়ি তৈরি করবেন। ওটা বিজ্ঞানীদের ভুল। বাসোভ আর পপোরভ আবার তাঁদের পরীক্ষা চালালেন না কোনও ভুল নেই। রাডারে স্পষ্ট বাড়ির প্রতিফলন হচ্ছে।

তখন পূর্ত বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, সৈন্য বিভাগ সবাইকে ডাকলেন। গোয়েন্দা দপ্তর খুব তৎপর হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সেনাদল পর্বতারোহী দল নিয়ে ওখানে পৌঁছল। পৌঁছে তারা হতভম্ব হয়ে গেল। দেখল ছোট শক্ত পাথরের ইমারত যাকে মিলিটারী পরিভাষায় বলা হয় পিলবকস্ সেই ধরনের ছোট ছোট গোটাকয়েক পিলবকস্ তৈরি হয়েছে। আর তারমধ্যে রাখা হয়েছে কিছু ক্ষেপনাস্ত্র। সবগুলি ক্ষেপনাস্ত্রের লক্ষ্যই হল বাকু শহর। জানইত পেট্রল বা ঐ ধরনের তেলের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হল বাকু এলাকা আর বাকু শহর হল তার নিয়ন্ত্রক শহর। অনুসন্ধানে বোঝা গেল কাস্পিয়ান সাগর দিয়ে কোনও শত্রুপক্ষ এই নির্জন অঞ্চলে ঢুকে ঘাঁটি গেড়েছিল। তাদের লক্ষ্যই ছিল বাকু ধ্বংস করা। সম্ভবতঃ লেজার দিয়ে পর্যবেক্ষণের সময় ওরা টের পেয়ে গেছিল যে কিছু একটা হচ্ছে। তাই ওরা সব ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সেই অহঙ্কারী ডঃ মইম্যানের আবিষ্কারের গল্প শুনবে?

১৯৬২-র গোড়ার দিকে খবরের কাগজে প্রকাশিত হল যুক্তরাষ্ট্রে এক অদ্ভুত ধরনের ব্যাঙ্ক ডাকাতি হচ্ছে। এর ব্যাপারটা বুঝতে পুলিশ হিমসিম খাচ্ছে। চারিদিকে হুলস্থূল পড়ে গেছে। ডাকাতেরা বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কের বা অফিসের পুরু ইস্পাতের বা কংক্রিটের দেওয়াল কি যেন কৌশলে কেটে সোনা-রূপা টাকা সব চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। পুলিশ তো ভেবেই পাচ্ছে না যে কি করে নিঃশব্দে এতো পুরু ইস্পাতের বা কংক্রিটের দেয়াল কাটা সম্ভব হচ্ছে।

দু একটা ঘটনার বিবরণ পড়তেই আমার মনে হলো লেজার রশ্মির হাত এতে নেই তো? তখনই আমি স্টেটের পুলিশ কর্তাকে লিখলাম, যতোদূর বুঝতে পারছি, আমি হয়তো চেষ্টা করলে এই রহস্যের সমাধান করতে পারবো।

আমার চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমন্ত্রণ এলো। আবার এলাম আমেরিকায়। ঘটনাটা ঘটেছিলো যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিশ শহরে। সেখানকার পুলিশের বড়োকর্তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হলো। আমি বললাম চুরির জায়গাগুলো আমার একটু দেখা চাই। পুলিশ দলের সঙ্গে পুরানো চুরির জায়গায় দু-একটা স্থান পরীক্ষা করলাম। সেই রাতেই ঐ স্টেটের সবচেয়ে বড়ো ব্যাঙ্ক এলেগেল ব্যাঙ্কে অমনই চুরি হয়ে গেলো। আমার কাজের সুবিধা হলো তাতে।

বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কে যারা বহু ধনী লোকের টাকা, সোনা, হীরা, মুক্তা ইত্যাদি জমা রাখে তাদের থাকে শক্ত ঘর বা ষ্ট্রংরুম। এগুলো প্রায়ই মোটা মোটা ইস্পাতের দেয়াল দিয়ে তৈরি হয় যাতে সহজে ভাঙা না যায়।

এলেগেল ব্যাঙ্কের শক্ত ঘরের দেয়ালও চোরেরা কি কৌশলে সুন্দর করে কেটে মানুষ যাবার রাস্তা করে নিয়েছে। ভেতরে আলমারিটাও একই কৌশলে কেটেছে। পুলিশের বড় কর্তা বললেন, চুরির সঙ্গে ব্যাঙ্কের কোনো কর্মচারীর যে যোগ আছে, এটা ঠিক। কিন্তু এই দেয়াল কাটলো কি করে? কি সুন্দর কাটা দেখেছেন? মনে হচ্ছে, সূক্ষ্ম করাত দিয়ে কাটা। গ্যাস দিয়ে কাটা যায় কিন্তু তার জন্য ভারি ভারি যন্ত্রপাতি আনা দরকার আর তাতে শব্দও হয় প্রচুর। এ কোন যন্ত্রের কাটা?

আমি কাটা জায়গাগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করে বুঝলাম, এ নিশ্চয় তাপ দিয়ে কাটা। আর নিঃশব্দে এতো তাপ সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র ঐ লেজার রশ্মি।

তাহলে কি ডাঃ মইম্যান এর সঙ্গে যুক্ত? না না, একথা ভাবা যায় না। তিনি না হয় মৃত্যু রশ্মি হিসাবে এর প্রয়োগের চিন্তায় মশগুল। তাই বলে ডাকাতি? না না, এ অসম্ভব! তবে? আচ্ছা ডাঃ মইম্যানের সহকারীদের মধ্যে কারো এই প্রবৃত্তি হয় নি তো? ভাবতে লাগলাম। গোয়েন্দা বিভাগকে বললাম, ফাঁদ পাতুন, চোর ধরা পড়বেই।

তারপর কয়েকদিন ধরে সব খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া চললো মিনিয়াপোলিশ শহরের বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কে ডাকাতেরা লুঠ করে নেবার পর নাগরিকদের

আর শান্তি নেই, তাঁরা আর কোন ব্যাঙ্কে টাকা, সোনা রেখে ভরসা পাচ্ছেন না। কিন্তু মিনিয়াপোলিশ নিউ ব্যাঙ্কে সে ভয় নেই। এর ধনাগার এতো শক্ত ধাতুতে তৈরি যে ডাকাতের সব কৌশল এখানে ব্যর্থ হবে। আপনার ধনরত্ন এই ব্যাঙ্কেই নিরাপদ।

এই বিজ্ঞাপন কয়েক দিন দিয়েই আবার প্রচার করা হলো—"আমাদের কথামতো এই শহরের সব ধনীরা তাঁদের সম্পত্তি নিরাপদে রাখবার জন্য মিনিয়া-পোলিশ নিউ ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন—আপনিও দিতে পারেন।"

এদিকে এই বিজ্ঞাপন চললো আর অন্য দিকে ব্যাঙ্কের গোপন ঘরে পুলিশ প্রতি রাত্রে ওৎ পেতে বসে থাকল।

অবশেষে এক রাত্রে ডাকাতের দলের গাড়ি এসে ব্যাঙ্কের সামনে থামলো। কালো কালো পোশাক পরা পাঁচ ছয় জন লোক নেমে এল। ব্যাঙ্কের বন্দুকধারী পাহারাওলা বন্দুক তুলতেই একটা লাল আলোর ঝিলিক দেখা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে

লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ডাকাতরা তারপর এগিয়ে এসে লোহার ফটকটা অনায়াসে কেটে ফেললো। পুলিশদল কিন্তু তখনও চুপ। আমি বলে দিয়েছিলাম ওদের ধরতে হবে পেছন দিক থেকে। সামনাসামনি এলে মৃত্যু রশ্মি দিয়ে নিমেষের মধ্যে সবাইকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে ওরা।

তাই পুলিশদল ওদের এগিয়ে যেতে দিলো। এইবার ওরা ভেতরে ঢুকলো। তারপর যেইধনাগারের দেওয়াল কাটতেযাবে,একসঙ্গে সবগুলো আলোজ্বলে গেলো আর দুমদুম শব্দে পুলিশের গুলি সব কটারপা ভেঙ্গে দিয়েচলে গেল। ওদের মধ্যে একজন মৃতুরশ্মির যন্ত্রটা তুলে ধরবার চেষ্টা করতেই পাঁচছটা গুলিতে যন্ত্রটা চুরমার করে ফেললো পুলিশ।

তারপর দলসুদ্ধ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে গুলিতে ভাঙা পায়ের চিকিৎসা আরম্ভ হলো।

পাহারাওয়ালার দেহ পরীক্ষা করে ডাক্তাররা দু তিনটে সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখতে পেলেন কিন্তু দেহের ভেতরের যন্ত্রপাতি-যেন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এমনই মনে হলো।

হাসপাতালে গিয়ে ওদের দলপতিকে দেখেই বুঝতে পারলাম যে ইনি ডাঃ মইম্যানের সহকারী ছিলেন। তখনই মইম্যানকে ডাকা হলো।

মইম্যান এসে সনাক্ত করলেন যে হ্যাঁ, এই লোকের নাম স্টিফেন। এবং ও তাঁর অন্যতম সহকারীরূপে অনেকদিন কাজ করেছিলো। কিছুদিন হলো স্টিফেন ওঁর ল্যাবরেটরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাগজপত্র এবং যন্ত্রপাতিও উধাও হয়েছিল। তিনি অবশ্য ব্যাপারটাকে তেমন একটা আমল দেন নি তখন। কিন্তু ও লোকটা যে বিজ্ঞানী হয়ে এমন ব্যাঙ্ক ডাকাতি আরম্ভ করবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি ডাঃ মইম্যান।

আমি বললাম, ডঃ মইম্যান, আমার মনে হয় এই স্টিফেনের কাণ্ড থেকে সব বিজ্ঞানীরই শিক্ষা লাভ করা উচিত। বিজ্ঞানীরাও যদি ভালো মন নিয়ে বিজ্ঞান চর্চা না করেন তবে আবিষ্কারগুলোরও এমনই অপব্যবহার হবে। এ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাদের আবিষ্কারকে মানুষের ভালো ছাড়া মন্দ কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না এই সঙ্কল্প তাঁদের নিতে হবে। ইতি তোমার বিশ্বস্ত

এ ডলফ হানস হাইডেলবুর্গ।

ডাঃ হানসের চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম যে ডাঃ মইম্যানের দিক থেকে পৃথিবীর ভয়ের কারণ আর নেই। কারণ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মারণ রশ্মিকে জীবন রশ্মি হিসাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন।

এর পরেও কথা আছে ১৯৬৪ সালে বাসোভ, পপোরভ আর আমেরিকার চার্লস টাউন যুক্তভাবে এই লেজার রশ্মি আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। কিন্তু ডাঃ মইম্যান সম্ভবতঃ তার দুষ্ট বুদ্ধির জন্যই বাদ পড়েছেন। অথচ তিনিও আবিষ্কারকদের অন্যতম।

লেজার রশ্মির ভবিষ্যত প্রয়োগ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মহল খুবই আশা করছেন। এমন আশা তাঁরা করেন যে, পৃথিবীতে বসেই ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের সংবাদও তাঁরা পাবেন।

এছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্র বিশেষ করে সার্জারিতে কাজে লাগবে খুব। আমি ১৯৭২ এ সোভিয়েত দেশে গিয়ে ওদেশের ফিলাতোভ ইনস্টিটিউটে চোখের বিভিন্ন অস্ত্রোপচারে লেজার রশ্মির প্রয়োগ দেখে এসে ভাবলাম মইম্যানের মৃত্যু রশ্মি আজ কেমন ভাবে জীবন রশ্মি হয়ে ফিরে এসেছে।

ডঃ সমীরকুমার ঘোষ

আবিষ্কার—তা আবার আকস্মিক হবে কি ভাবে? তাই প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে হয়ত অনেকেই ভ্রূকুটি করবেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সত্য, পৃথিবীর বহু আবিষ্কার—বিশেষতঃ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই ঘটেছে দুর্ঘটনা বা অনুরূপ কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে। মানুষ যখন কোন আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে তখন সেই কাজ হয় পূর্বপরিকল্পিত। সেই কাজ করতে গেলে প্রয়োজন হয় অনেক প্রস্তুতির এবং ধৈর্য ও সংযমের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হ'তে হয়। আকস্মিক ঘটনা কিন্তু কখনোই পূর্বপরিকল্পিত হয় না, এবং মূল আবিষ্কারের লক্ষ্যের সঙ্গে এইসব ঘটনার কোন সঙ্গতি বা যোগসূত্রও থাকে না। তবুও ঐ সব তুচ্ছ আকস্মিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানীরা বহু সময়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান পেয়ে থাকেন। ফলে, ঘটে যায় মূল্যবান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এইরকমই কয়েকটি চিত্তাকর্ষক আকস্মিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা এখানে আলোচনা করব।

[এক]

প্যারাসুটের নাম শোনেনি, এমন আজ কেউ নেই। বিমানচালনার ক্ষেত্রে এই প্যারাসুট এক অপরিহার্য অঙ্গ। এই প্যারাশুটের জন্ম কিন্তু এক আকস্মিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই ঘটেছিল আজ থেকে বেশ কিছুকাল আগে।

হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্টের এক কয়েদখানা। নিশুতি রাত। কয়েদখানার নিশ্ছিদ্র এক ঘরে রাত্রি যাপন করছে এক বন্দী—নাম, আঁদ্রে জারনোরিন। দীর্ঘদিন বন্দীজীবন যাপন করে আঁদ্রে ক্লান্ত, অবসন্ন এবং হতাশায় ভগ্ন মনোরথ। কিভাবে ঐ নির্মম বন্দীজীবন থেকে পালিয়ে মুক্তি পাওয়া যায়—সেই চিন্তায় তার চোখে নেই ঘুম। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে শোনা এক বক্তৃতার কথা, বক্তা ছিলেন ইংলণ্ডের এক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, নাম লিয়রম্যাণ্ড। বিষয়বস্তু ছিল, 'বাতাসের উর্ধ্বচাপ'। বাতাসের ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে লিয়রম্যাণ্ড দেখিয়েছিলেন এক পরীক্ষা। দুই হাতে দুইটি মজবুত ছাতা ধরে লাফিয়ে পড়ে তিনি দেখিয়েছিলেন সেদিন যে, ছাতার ভিতর দিকের কাপড়ে বাতাসের উর্ধ্বচাপ হেতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হ্রাস পেয়ে কেমনভাবে সহজে ও নিরাপদে মাটিতে নেমে আসা সম্ভব হয়। সেই পরীক্ষাটি আঁদ্রের মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। এই ঘটনার কথা স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁদ্রে যেন বিশাল অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলো এক আশার আলো।

রাত তখন প্রায় দুটো। বুদাপেস্টের জেলখানায় গভীর স্তব্ধতা, 'জেলখানার চারিদিক প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। অতিকষ্টে আঁদ্রে গিয়ে উঠল সেই পাঁচিলের উপর। সঙ্গে নিয়েছে সে নিজের বিছানার চাদরটি এবং একগাছা শক্ত মজবুত দড়ি। চাদরটার চারি কোণায় শক্ত করে বাঁধলো সেই দড়ি গাছিটিকে। তারপর সেই দড়ি ধরে দিল এক লাফ সুবিশাল উঁচু পাঁচিল থেকে। একি! প্রচণ্ডবেগে মাটিতে নেমে না এসে আঁদ্রে যে বাতাসে ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে নেমে আসছে মাটির দিকে। হ্যাঁ, ঐ চাদরটি সেই অবস্থায় ঠিক ছাতার মত কাজ করে আঁদ্রেকে নামিয়ে নিয়ে এল জেলখানার বাইরে নিরাপদ মাটিতে। প্রচেষ্টা তার সফল হ'ল আর বুদাপেস্টের কারাগার থেকে পালানো এক কয়েদীর সার্থক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই জন্ম নিল আজকের যুগের প্যারাসুটের আদিপুরুষ।

[দুই]

সেলাই কলের সূঁচ দেখনি। এরকম কেউ আছ নাকি? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু ঐ সূঁচ আবিষ্কারের নেপথ্যে যে আকস্মিক এক ঘটনা আছে। সেকথা আর

কল্পনাই বা জানে? স্বপ্ন দেখেও যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব, একথা খুব কমই শোনা যায়, তবুও ঘটনাটা এক নির্মম বাস্তবই বটে।

বহুদিন আগে আমেরিকাতে বাস করতেন এক নগণ্য যন্ত্রবিদ। নাম ইলিয়াস হাও। তিনি ছিলেন যেমন পরিশ্রমী তেমনই বুদ্ধিমান। তিনিই প্রথম সেলাইয়ের কল আবিষ্কারক হিসাবে পৃথিবীতে সুপরিচিত। তাঁর আবিষ্কৃত কলে কিন্তু সূঁচের সাহায্যে কিছুতেই সেলাই করা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রতিবারই সেই সূঁচ যেত হয় ভেঙে, নয়ত কল চলত না। কোথায় যে কি গলদ, কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না হাও, চিন্তায় অবসন্ন হ'য়ে একদিন তিনি সেলাইয়ের কলের সামনে বসেই অসময়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। আর দেখলেন এক ভারি মজার স্বপ্ন। স্বপ্নটা হ'ল তিনি যে দেশে বাস করেন, সে দেশে রাজসভায় তাঁর ডাক পড়েছে এবং ঠিকমত সেলাইয়ের কল তৈরি করতে না পারায়, রাজা তাঁর ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। প্রহরীকুল তাঁকে বেঁধে নিয়ে চলেছে ফাঁসির মঞ্চে। ভয়ে ভীত বিহ্বল হাও শুধু এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন রক্ষীদলের দিকে—যদি কেউ তাঁকে রক্ষা করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। হঠাৎ হাও লক্ষ্য করলেন যে, এক প্রহরীর হাতে যে বর্শাটি রয়েছে, তার তীক্ষ্ণ ফলাটির মাথায় রয়েছে একটি ছিদ্র। আর এই দৃশ্য দেখেই। বুদ্ধিমান হাওয়ের মাথায় খেলে গেল এক চিন্তা, তিনি ভাবলেন, যে সূঁচটি তিনি বানিয়েছিলেন তার তলার দিকে ছিল একটি ছিদ্র, যার ফলে সূঁচটি কিছুতেই ঠিকমত কাজ করছিল না। কিন্তু স্বপ্নে দেখা বর্শার মত যদি তিনি ঐ ছিদ্রটি সূঁচটির মাথার দিকে রাখেন তবে হয়ত কাজ হ'তে পারে। যেই ভাবা, সেই কাজ। হাওয়ের ঘুম গেল ভেঙে এবং স্বপ্নের কথা পরিষ্কার মনে রেখেই পরদিন তিনি মাথায় ছিদ্রযুক্ত একটি সূঁচ তৈরি করলেন। সূতা পরিয়ে সেটিকে কলে লাগাতেই দিব্যি সেটি দিয়ে চমৎকার ভাবে সেলাই হ'তে লাগল।

এই ভাবেই আবিষ্কৃত হ'ল সেলাইয়ের সূঁচ নামে এক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের—যা স্বপ্নের মাধ্যমে আকস্মিক ভাবেই সম্ভব হয়েছিল।

[**তিন**]

প্রায় সওয়াশো বছর আগেকার এক ঘটনা। ইংল্যাণ্ডের বার্কশায়ারের কাছে হ্যাগবোর্ন নামে এক জায়গা। সেখানে আছে ছোট্ট একটি কারখানা যেখানে প্রস্তুত হয় হাতে তৈরি কাগজ। কয়েকশত কর্মচারী কাজ করেন সেই কারখানায়। কারখানার একটি বিভাগের কয়েকজন কর্মচারীর অসাবধানতার ফলে একদিন এক মস্ত ভুল হয়ে গেল। হাতে তৈরি কাগজকে মসৃণ ও চক্চকে করার জন্য কয়েকটি

রাসায়নিক মশলা মেশানোর প্রয়োজন হয় কাগজের মণ্ডে। কিন্তু সেই কর্মচারী কয়েকজনের অনবধানতার ফলে, ভুল হয়ে গেল একদিন সেই মশলা মেশাতে। ফলে, সেদিনের তৈরি সমস্ত কাগজের বাণ্ডিল বেরিয়ে এল অমসৃণ, খসখসে কাগজ হিসাবে। মালিক মহাশয় ত' রাগে অগ্নিশর্মা। হবেই ত, ক্ষতির পরিমাণ নেহাৎ কম নয় কারণ ঐ কাগজগুলো কোন কাজেই আসবে না। যাইহোক, কর্মচারীদের তিরস্কার করে ও বেতন কাটার নির্দেশ দিয়ে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হ'লেন আর বিশাল কাগজের বাণ্ডিলগুলি ফেলে রাখলেন গুদামের একপাশে।

বেশ কয়েকদিন পরে ঐ কারখানারই আর এক কর্মচারী কার্যোপলক্ষ্যে ঐ গুদামে গিয়ে কিছু একটা লেখার জন্য, ঐ বাতিল কাগজের বাণ্ডিল থেকে একটি অংশ ছিঁড়ে নিয়ে, তাতে লেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য। যতবারই তিনি লিখতে যান ঐ কাগজের অংশে, ততবারই লক্ষ্য করেন যে, লেখামাত্রই কালি যাচ্ছে শুকিয়ে আর কালিটা চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ায় লেখাটা হয়ে যাচ্ছে এক বিশ্রী ধেবড়ানো ছাপ, অবাক হ'য়ে এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সেই কর্মচারিটির মনে উদয় হ'ল এক নতুন চিন্তার। ভাবলেন তিনি যে, ঐ কাগজগুলিকে কালির লেখা শোষণ করার কাজে ব্যবহার করলে কেমন হয়। আর যেই ভাবা, অমনি কাজ। তখনকার দিনে কালির লেখা শুষে নেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। হাওয়াতে লেখা শুকানোর জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হত। এই আকস্মিক ঘটনা থেকেই বস্তুত কালি শুষে নেওয়ার কাগজ অর্থাৎ 'ব্লটিং পেপার' আবিষ্কৃত হল। কয়েকজন কর্মচারীর অসাবধানতা ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যই পৃথিবীর লোকেরা পেল তাদের অতি প্রয়োজনীয় এক কাগজ, 'ব্লটিং পেপার'।

এই ছোট্ট তিনটি ঘটনা থেকে দেখা গেল যে, আপাতদৃষ্টিতে যা সামান্য বা তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে, তাই অনেক সময়ে দিতে পারে সত্যের সন্ধান বা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের নিশানা। এরকম অনেক অনেক ঘটনা আছে, যা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বা উদঘাটিত হয়েছে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চিরন্তন সত্যের। 'ইনসুলিন', 'স্যাকারিন', 'রঞ্জনরশ্মি', 'গ্যাস-ম্যান্টল', 'নাইট্রো-গ্লিসারিন' প্রভৃতি আজকের যুগের বহু অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের আবিষ্কার হয়েছে এইভাবে সব আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। সেজন্য মনে হয় যে, আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন কত শত সহস্র তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনার সম্মুখীন হই। কিন্তু কখনোই কোন ঘটনাকে সামান্য বলে অবহেলা করা উচিত নয় কারণ কে জানে, কোন্ সামান্য ও তুচ্ছ ঘটনা হয়ত হতে পারে এক মহান্ আবিষ্কারের বা সত্য উদ্ঘাটনের দিশারী। এর জন্য অবশ্য প্রয়োজন কিছুটা অনুসন্ধিৎসা এবং কৌতূহল মিশ্রিত ও চিন্তাপ্রবণ মন থাকার, আর সেটা থাকা কি নেহাৎই অসম্ভব ?

জ্যো
তি
র্বি
দ্যা

ভারতের প্রাচীন মানমন্দির

পরিতোষ পাল

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার অবস্থান দেখেই প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মুনিঋষিরা দিনক্ষণ ঠিক করতেন। বৈদিক যুগে তো মুনি ঋষিরা সৌরমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রদের চলাচলের উপর নির্ভর করে তৈরি করেন বহু সূত্র। সেইসব জ্যোতিষীর সূত্রগুলোর মাধ্যমে প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা শুরু হয়। প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায় ভারতীয় মুনি ঋষিরা রেখে গেছেন নানা অবদান। আর্যভট্ট-ভাস্করের যুগ তো প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা উন্নতির যুগ।

কিন্তু সে যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা হতো কিভাবে? জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে কি প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদরা কোন মানযন্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন? গ্রহনক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণের জন্য কি মানমন্দির ছিল সে যুগে?

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় মানমন্দিরের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ বিষয়ে কোন তথ্যও পাওয়া যায় নি। চোখে দেখেই মুনিঋষিরা পর্যবেক্ষণের কাজটা সারতেন। এমনকি জ্যোতিষীর সমস্যায় চূড়ান্ত মীমাংসা করতেও সে যুগের জ্যোতির্বিদ্‌রা কোন মানযন্ত্রের সাহায্য নেননি। মানযন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা প্রাচীনকালে চীন দেশে কিছু কিছু হলেও মানমন্দির তৈরি হয় অনেক

পরে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পারস্যের মারাঘারে তৈরি হয় সম্ভবতঃ বিশ্বের প্রথম আধুনিক মানমন্দির। তারপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমরখন্দে ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ইউরোপের য়ুরানিবোর্গে দু'টি মানমন্দির তৈরি হয়। কিন্তু ভারতে মানমন্দির তৈরি হয় কবে? কবেই বা এদেশে যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ শুরু হয়?

ভারতের প্রাচীন মানমন্দিরের বয়স খুব একটা প্রাচীন নয়। আজ থেকে তিনশ' বছরের কিছু আগে ভারতে প্রথম মানমন্দির তৈরি হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজ মানসিংহ কাশীতে একটি মানমন্দির তৈরি করেছিলেন। তবে তাতে যন্ত্রপাতির তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেদিক থেকে ভারতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মানমন্দির তৈরির সার্থক রূপকার হলেন জয়পুর-স্রষ্টা মহারাজ জয়সিংহ।

অম্বর অধিপতি জয়সিংহ ছিলেন অদ্ভুত মানুষ। রাজনীতিকুশল, মন্ত্রণাদক্ষ নরপতি হিসেবেই যে তার পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল তা মোটেই নয়। বরং তার বিদ্যানুরাগের পরিচয়টাই ছিল অনেক বেশি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি মহারাজ জয়সিংহের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গণিতশাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় যে উন্নতি দেখা গিয়েছিল জয়সিংহ ছিলেন তারই যথার্থ উত্তরসাধক। জ্যোতির্বিদ্যায় জয়সিংহের অসাধারণ ব্যুৎপত্তির কথা জয়পুরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ তো জয়সিংহের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পঞ্জিকা সংস্কারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

মহারাজ জয়সিংহ জ্যোতির্বিদ্যার চর্চার ক্ষেত্রে এদেশে আধুনিকতার পথ-প্রদর্শকও। সে যুগে ইউরোপ ও আরব থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করে নিয়মিত তিনি সেগুলোর চর্চা করতেন। আর এই চর্চার মাধ্যমেই তাঁর মাথায় আসে মানমন্দির নির্মাণের কথা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করার জন্য বেশ কিছু পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ্‌কে তিনি তার দরবারে স্থান দিয়েছিলেন। তারা সবসময়ই মহারাজার পাশে পাশে থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এছাড়া জয়সিংহের সভাপণ্ডিত হিসেবে ছিলেন জগন্নাথ নামে এক ব্রাহ্মণ। অঙ্কশাস্ত্রে এঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

মানমন্দির তৈরির প্রথম যে প্রচেষ্টা তাকে নিঃসন্দেহে দুঃসাহসই বলতে হবে।

মহারাজ জয়সিংহের মাথায় তখন এই একটাই ভাবনা। একদিন তিনি এক বিশেষ সভা ডাকলেন। সভাপণ্ডিত জগন্নাথকে বললেন সবাইকে খবর দিতে। খবর গেল সভার সকল সদস্যদের কাছে। এলেন গুণিজনেরা। এলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুই উৎসাহী পণ্ডিত মহম্মদ সরিফ ও মহম্মদ মাহদি। মহারাজার বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় যোগ দিতে এলেন মানুয়েল নামক জনৈক পর্তুগীজ পাদরি। সভায় মহারাজ জয়সিংহ বললেন, 'জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায় বর্তমানে যন্ত্রের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণের জন্য তাই যন্ত্রপাতি তৈরি যেমন দরকার, তেমনি দরকার উপযুক্ত স্থানে মানমন্দির তৈরি করা।'

মহারাজার নির্দেশে ইউরোপ ও আরব মুলুকে গেলেন কয়েকজন পণ্ডিত। সঙ্গে সুদক্ষ বেশ কয়েকজন কারিগর, যারা ফিরে এসে যন্ত্রনির্মাণের দায়িত্ব নেবেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক রূপটির সঙ্গে পরিচিত হতে মহম্মদ সরিফকে পাঠানো হলো দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে, মহম্মদ মাহদি গেলেন সুদূর দ্বীপ সমূহে। পর্তুগীজ পাদরির মাধ্যমে পর্তুগালের রাজার কাছে জয়সিংহ পাঠালেন এক চিঠি। তাতে তিনি লিখলেন, মানমন্দির তৈরির ব্যাপারে সাহায্য চাই। পর্তুগালের রাজা অনুরোধ রক্ষা করলেন। যন্ত্রপাতিসহ একজন জ্যোতির্বিদ্‌কে পাঠালেন তিনি জয়সিংহের কাছে। একে একে ফিরে এলেন অন্যরাও। সভায় বসে প্রত্যেকে জানালেন তাদের অভিজ্ঞতার কথা, জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের কথা। এলো বহু বইপত্র। মহারাজ জয়সিংহ সভাপণ্ডিত জগন্নাথকে দিয়ে আরবী মিজাস্তি নামক সিদ্ধান্তের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করালেন 'সিদ্ধান্ত সম্রাট' নাম দিয়ে।

এই সিদ্ধান্ত-সম্রাটকে অবলম্বন করেই ভারতের বুকে প্রথম মানমন্দির তৈরি হয়। এক জায়গায় দু' জায়গায় নয়, পাঁচ জায়গায় মানমন্দির তৈরি করেন মহারাজ জয়সিংহ। ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাসে এই মানমন্দিরগুলোর ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানে এগুলো নিঃসন্দেহে অক্ষয়কীর্তি। দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, কাশী ও মথুরাতে জয়সিংহ শুধুমাত্র যে মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাই নয়, সেগুলোকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যে, এক একটি মানমন্দির সেযুগে বিবেচিত হয়েছিল উন্নততর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে। এজন্য মহারাজ জয়সিংহ নিজে বেশকিছু যন্ত্রপাতিও উদ্ভাবন করেছিলেন।

দিল্লীর মানমন্দির: জয়সিংহ স্থাপিত মানমন্দিরগুলোর মধ্যে প্রথম তৈরি হয় দিল্লীর মানমন্দির দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহর অনুরোধে ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে জুম্মা মসজিদের প্রায় দু'মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এই মানমন্দিরটি তৈরি করা হয়। বিরাট এলাকা জুড়ে এটির অবস্থান। যন্ত্রপাতির সাহায্যে এটি আধুনিকভাবে সজ্জিত করতে মহারাজ জয়সিংহ খুবই উৎসাহ নিয়েছিলেন। দিল্লীর মানমন্দিরের অধিকাংশ যন্ত্রই কারিগর দিয়ে নির্মাণ করানো হয়েছিল। বাইরে থেকে আনা যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর না করে বরং নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করে সেগুলোকে চুন আর পাথর দিয়ে তৈরি করান তিনি। এই মানমন্দিরের প্রবেশ পথের অদূরেই ছিল একটি বৃহদাকার শঙ্কু। শঙ্কুর মুখ পৃথিবীর

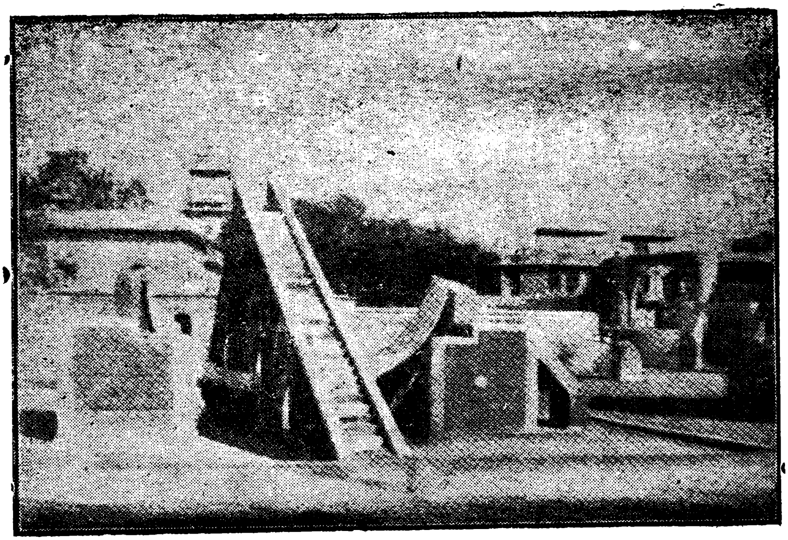

দিল্লীর মানমন্দিরের আভ্যন্তরীন দৃশ্য

অক্ষরেখার সমান্তরাল। এর উলম্বচ্ছেদ সমকোণী ত্রিভুজের মতো। এই ত্রিভুজের কোণ দিল্লীর অক্ষাংশের সমান। শঙ্কুর মাঝখান দিয়ে সোজা উপরে উঠে গিয়েছে সিঁড়ি। শঙ্কুর দুপাশে আবার দুটি বৃহৎ বৃত্তাকার গাঁথুনি। এতেও ছিল সিঁড়ি শঙ্কুর ছায়া এই বৃত্তের উপর পরতো। আর এক একটি সিঁড়ি অতিক্রম করতে ছায়ার সময় লাগতো চার মিনিট। এই ধরনের আরেকটি শঙ্কু ছিল পাশে। এ দুটির সাহায্যে সৌরকাল নির্ণয় করা হতো।

দিল্লীর মানমন্দিরের সবচেয়ে বৃহৎ যন্ত্র হলো সম্রাট-যন্ত্র। এটির অবস্থান

ঠিক মাঝখানে। এটির মাধ্যমে সময় নির্ণয় করা হতো। এই যন্ত্রের প্রধান অংশ বলতে একটা বড় শঙ্কুর অবনত দুই ধার। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বৃত্তের চতুর্থ ভাগের ন্যায় দু'টি আকৃতি। শঙ্কুর একটি ধার ছিল উত্তর মেরু অভিমুখী। আর শঙ্কুর মুখ ছিল পৃথিবীর অক্ষরেখার সমান্তরাল। এই সম্রাট যন্ত্র ছাড়াও জয়সিংহ দু'টি অর্ধগোলাকার যন্ত্র তৈরি করান। এদুটির নাম হলো জয়প্রকাশ। এই যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের অবস্থান যেমন জানা যেতো, তেমনি অন্য জ্যোতিষ্কের অবস্থিতিও নির্ণয় করা যেতো। এটিও জয়সিংহের নিজস্ব উদ্ভাবিত যন্ত্র। এছাড়া এই মানমন্দিরে ছিল আরও কয়েকটি যন্ত্র। রামযন্ত্র নামে একটি যন্ত্র ছিল, যেটি দেখতে বৃত্তাকার প্রাচীরের মতো। তার ভেতরে ছিল একটি স্তম্ভ। স্তম্ভ ও প্রাচীরের গায়ে দাগ কাটা ছিল। সেগুলোর সাহায্য প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ চালাতেন জ্যোতির্বিদরা। মিশ্র-যন্ত্র নামে একটি যন্ত্রে চারটি যন্ত্রের সমাবেশ ঘটেছিল।

কাশীর মানমন্দির ঃ মহারাজ মানসিংহের তৈরি কাশীর গঙ্গাতীরের এই মানমন্দিরটি জয়সিংহের হাতে উন্নততর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই মানমন্দিরটি

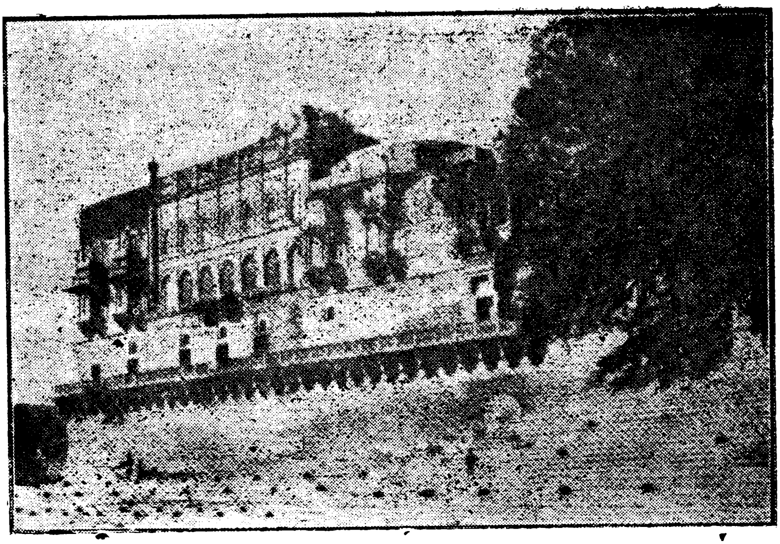

কাশীর মানমন্দিরে বাইরের দৃশ্য

সুদৃশ্যও ছিল। এতে প্রায় আট ন' রকমের যন্ত্রপাতি ছিল। এখানে সূর্যের

নতাংশ ও উন্নতাংশ জানার জন্য একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হতো। এর ভিত্তি যন্ত্রটিতে দুটি শলাকা যুক্ত ছিল। এই শলাকার ছায়া পাশাপাশি দুটি অঙ্কিত ধনুআকৃতির দেওয়ালের উপর পড়তো। কখন কোথায় ছায়া পড়ে তা দেখেই মধ্যাহ্নে সূর্যের ক্রান্তি কোন্ দিকে তা নির্ণয় করা হতো। এই মানমন্দিরেও একটি সম্রাট যন্ত্র ছিল। সম্রাট যন্ত্রের পূর্বদিকে বসানো হয়েছিল বিষুব যন্ত্র। এটিও পাথরের তৈরি এবং বিষুববৃত্তের সমতলে বসানো ছিল। এই যন্ত্রটির ঠিক মাঝখানে একটি শলাকা ছিল। এই শলাকার ছায়া দেখে সূর্য বা নক্ষত্রের নতাংশ জানা যেতো। এই মানমন্দিরে লোহার একটি যন্ত্রকে বলা হতো চক্রযন্ত্র। লোহার তৈরি একটা চক্র, যেটি সব সময় ঘুরতে পারে। এটির সাহায্যে শুধু যে গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্রান্তি নির্ধারণ করা হতো তাই নয়, এটির সাহায্যে গ্রহ বা নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করা যেতো। এছাড়াও কাশীর মানমন্দিরে ছিল আরেকটি বিষুব চক্র, একটি দিগংশ যন্ত্র। ছিল নাড়ীবলয় নামক একটি গোলাকার যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্ক সমূহ উত্তর গোলার্ধে কি দক্ষিণ গোলার্ধে আছে তা জানা যেতো। এতে সময়ও নির্ণীত হতো।

উজ্জয়িনীর মানমন্দির : প্রাচীন ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র ছিল উজ্জয়িনী। এর অবস্থানও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রাচীন জ্যোতিষীয় গবেষণা 'সূর্য সিদ্ধান্তে' বলা হয়েছে, 'লঙ্কা ও সুমেরু পর্বতের সমসূত্রপাতে যে রেখা কল্পিত হয়, তার নাম মধ্যরেখা। ঐ রেখাতে রোহীতক নগর, উজ্জয়িনী ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থান অবস্থিত।' জয়সিংহের তৈরি মানমন্দিরের আগে কোন জ্যোতিষ যন্ত্র সেখানে দেখা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দে এটা তৈরি হয়েছিল। এই মানমন্দিরে সিমেন্টের তৈরি কয়েকটি যন্ত্রপাতি ছিল। দু'টি বিষুববৃত্তও ছিল। আর ছিল একটি সম্রাট যন্ত্র, একটি দক্ষিণোবৃত্তি যন্ত্র, একটি নাড়ীবলয় যন্ত্র ও একটি দিগংশ যন্ত্র।

জয়পুরের মানমন্দির : নিজরাজ্যে অবস্থিত এই মানমন্দিরটিকে উন্নততর পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে মহারাজ জয়সিংহ কোন ত্রুটি করেন নি। রাজপ্রাসাদের কাছেই বিশাল এলাকা জুড়ে এই মানমন্দিরটি ১৭৩৪ সালে তৈরি হয়। জয়পুর মান-মন্দিরের যন্ত্রগুলি এমনই সুগঠিত ও পর্যবেক্ষণ উপযোগী যে, এগুলোর নতুনত্ব ও নির্মাণ কুশলতা দেখে পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছিলেন। এই মানমন্দিরে বসেই মহারাজ জয়সিংহ অধিকাংশ সময় গ্রহ তারার অবস্থান পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ

করতেন। মানমন্দিরের প্রবেশ পথেই ছিল কঠিন চুনে তৈরি এক প্রকাণ্ড বৃত্ত, যাতে রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি অঙ্কিত ছিল। তারপর কতকগুলো বিষুববৃত্ত যন্ত্র, কয়েকটি আস্তরলাব। এই মানমন্দিরে রয়েছে ৭৫ ফিট উঁচু একটি শঙ্কু। এটি ইট আর চুন দিয়ে তৈরি। এটির উপরে উঠে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা আছে। এই বিশাল শঙ্কুর দু'পাশে ধবধবে সাদা চুনের তৈরি দু'টি প্রকাণ্ড বৃত্তার্ধ আছে। এতে দাগকাটা রয়েছে।

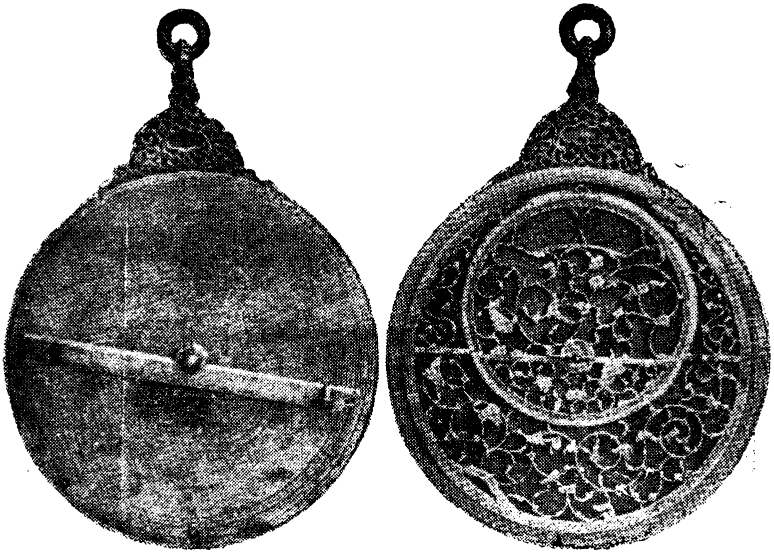

জয়পুর মানমন্দিরের আস্তরলাবের সামনের এবং পেছনের অংশ।

শঙ্কুর ছায়া এর উপর যখন যেখানে পরে তাই দেখে সূর্যের উন্নতাংশ জানা যায়। এটি ছাড়াও জয়পুরের মানমন্দিরে যে সব যন্ত্র রয়েছে সেগুলোতেও ডিগ্রী ও মিনিট অঙ্কিত। একমাত্র জয়পুরের মানমন্দিরেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটি আস্তরলাব লোহার আংটা থেকে ঝোলানো রয়েছে। এই যন্ত্রগুলো তামা ঢালাই করে তৈরি।

জয়পুরের মানমন্দিরের যন্ত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সম্রাট যন্ত্র। জয়সিংহ উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলোর মধ্যে এই যন্ত্রটিই সবচেয়ে বড়। এছাড়া এখানে আছে যন্ত্রাংশ যন্ত্র, রাশিবলয় যন্ত্র, জয়প্রকাশ, রাম যন্ত্র, দিগংশ যন্ত্র, নাড়ীবলয় যন্ত্র প্রভৃতি। জয়পুর মানন্দিরের জন্য জয়সিংহ বিশেষ ভাবে তৈরি করিয়েছিলেন একটি যন্ত্র। সেটির নাম কপাল যন্ত্র।

এইসব যন্ত্র ছাড়াও জয়পুর মানমন্দিরে ধাতুর তৈরি বেশ কিছু যন্ত্রপাতি রয়েছে।

এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চক্র যন্ত্র, ক্রান্তিবৃত্তি যন্ত্র, উন্নতাংশ যন্ত্র, ধ্রুবব্রহ্ম যন্ত্র প্রভৃতি। জয়পুর মানমন্দিরের পিতলের তৈরি আস্তরলাব হলো খুবই আকর্ষণীয়।

মথুরার মানমন্দির: মহারাজ জয়সিংহের তৈরি শেষ মানমন্দিরটি তৈরি হয়েছিল মথুরার প্রাচীন দুর্গশিখরে। এই মানমন্দিরটি বহুদিন আগেই অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে। জয়সিংহ বেশ কয়েকটি যন্ত্র এখানে স্থাপন করেছিলেন। পৃথিবীর অক্ষ নির্দেশক একটি শঙ্কু, কয়েকটি বিষুবচক্র এবং স্থানীয় অক্ষাংশ জানবার জন্য আর দু'টি ছোট যন্ত্র ছিল। মথুরার মানমন্দির উজ্জয়িনীর মানমন্দিরের অনুকরণেই তৈরি হয়েছিল। এই মানমন্দিরের যন্ত্রগুলো অন্যান্য মানমন্দিরের যন্ত্রগুলোর তুলনায় অনেক ছোট এবং সংখ্যায় সেগুলো কম।

মহারাজ জয়সিংহের তৈরি এই পাঁচটি মানমন্দিরে যে পরিমাণ যন্ত্রের সামাবেশ

মথুরার মানমন্দিরের দৃশ্য

ঘটেছিল তা ভারতের জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একজন মহারাজার অদ্ভুত খেয়াল বলে এগুলোকে চিহ্নিত করলে ভুল করা হবে। বরং ভারতের ধারাবাহিক জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে এগুলোর একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের অবহেলার কারণেই সেগুলোর অধিকাংশ আজ ধ্বংসের শেষ সীমানায়। কোন কোনটি বিলুপ্তির অতল গহ্বরে হারিয়েও গেছে। সেগুলোকে যদি উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করা হতো তাহলে অনেক নতুন নতুন তথ্য জানাও অসম্ভব ছিল না

এই বিজ্ঞান

সাধন দাশগুপ্ত

জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের পাঁচটি ধারা—কে, কি, কেন, কবে, কোথায়। এবং যেমন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে আরো একটি ইন্দ্রিয়, যা মন, যোগ করা হয়, সেই কল্পনার সঙ্গে তুলনা করে আরেকটি প্রশ্ন চিহ্ন সহজেই জিজ্ঞাসুরা তুলে থাকেন, কেমন করে! কেমন করে চেনা যায়, কেমন করে ঘটে, থাকে, হয়, ইত্যাদি। এ জাতীয় নানা ক্রিয়াকলাপ ঘেঁটে কে-কি কেন কবে-কোথায় এর উত্তর জিজ্ঞাসুরা খুঁজে চলেন।

খোঁজার উত্তর কি সব সময় সঠিক পাওয়া যায়? যায় না। সেই যেমন পাঁচ অন্ধের হাতি দেখা। কেউ কান ছুঁয়ে বলেন, হাতি কুলোর মত ; কেউ শুড় ছুঁয়ে বলেন, এ যে দেখি একজাতীয় সাপ ; অন্যে পা ছুঁয়ে বলেন, হাতি থাম কিম্বা গাছের গুঁড়ি। ল্যাজ কারো কাছে আনে দড়ির আকৃতি আর পুরো শরীরে বোধ জাগায় হাতি যেন এক নিটোল বক্র দেয়াল! এঁদের কাছে হাতির শরীরের এক এক অংশ হাতি বলে প্রতিভাত হচ্ছে,—প্রতিভাত হচ্ছে চেনা জানা বস্তুর আদলে। কুলোর মত কান বলতে ঠিক কুলো যেমন তেমন কান বুঝিনা ; কারণ বাক্যাংশের মধ্যে 'মত' কথাটি। রাজকন্যার বাঁশির মত নাক, পটলচেরা চোখ, মেঘের মত চুল, সঞ্চারিণী লতাটির মত দেহ যে ছবিটি মনের মধ্যে টেনে আনে, তা' ঐ উপমাগুলির বিশিষ্টতা ও গুণের তুলনা। ছোট ছেলে গল্প শুনতে শুনতে বলতে পারে, 'ওরকম করে বলছ কেন?' এই কেনর উত্তর ঠাকুমা-দিদিমা মা-বাবার জানা নেই। সৌন্দর্যের সঠিক বর্ণনা কথার কোনো বাগ্‌ভঙ্গীতে কি স্পষ্ট করে বোঝান যায়? কথা কি পারে সৌন্দর্যের সঠিক অনুভূতি জাগাতে? তবু আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে আঁকা-বলা ছবিটি আবছা হলো যেন চেনা, যেন জানা ; সে যেন অধরা নয়, অ-বোঝাও নয়।

বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় এই উপমা উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার এসেছে। কারণ মুখের ভাষায়

যে কোন বস্তুকে সুস্পষ্ট করে জানাতে গেলে, যে কোন প্রশ্নের উত্তর বোঝাতে গেলে খানিকটা অতিকথন আসে, গাণিতিক সংক্ষিপ্ততার আঁটসাঁট বাঁধন হারিয়ে যায়। কথা মানে অনেক কথা, শব্দার্থ মানেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। আর সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি রীতি নজরে আসে ; অন্ধের হাতি দেখার মত একটি প্রশ্নের হাজার উত্তর। দার্শনিক শোপেনহায়ার তাঁর বিখ্যাত রচনা 'Die vierfache wurzel des stages vom Grunde' অথবা 'মূল সিদ্ধান্তগুলির চতুর্ধা উৎসের সন্ধান' নামক নিবন্ধে এই কেন'র উত্তরে যে কত ঝামেলার উত্তর পাওয়া যেতে পারে তার কথা বলেছেন। শোপেনহায়ার শেষ পর্যন্ত সব প্রশ্নের শেষ কথায় টেনেছেন, 'এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।' বিজ্ঞানীরা এর পরেও প্রশ্ন তুলবেন, এরকম ইচ্ছা ঈশ্বরের হবে কেন ?

এই কেন প্রশ্নের উত্তরে অনেক সময় মজার ও অদ্ভুত কথা শোনা যায়। যেমন প্রশ্ন : বুদ্ধিমান প্রাণীদের অস্তিত্বের কারণটা, তারা আছে কেন ? এর উত্তরে আরেক বুদ্ধিমানের উত্তর : তারা না থাকলে এই প্রশ্নটা তুলত কে হে ?

কিম্বা ধরা যাক, মোটর গাড়ির স্পার্কপ্লাগ একটা নির্দিষ্ট সময়ে পেট্রোলের মিশ্রণটাকে প্রজ্বলিত করে কেন ? এর উত্তর দুটো হতে পারে : এক : মেসিনের যন্ত্রাংশ এমনভাবে তৈরি যে ঠিক ঐ সময়ে স্পার্কটা ঘটবে। এবং দুই : ঐ সময়ে স্পার্কটা ঘটলে মেসিনটির দক্ষতা বা এফিসিয়েন্সি বাড়ে।

প্রথম উত্তরটি পদার্থবিজ্ঞানীদের খুশি করবে। তবু তারা প্রশ্ন তুলবেন, যন্ত্রাংশটা ঠিক অমনভাবে তৈরি হবে কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর জানাচ্ছে দ্বিতীয় উত্তরটি-এটিই প্রশ্নকে নিরসন করে। এ ধরনের উত্তরকে বলা হয় টেলিওলজিকেল বা পরম কারণ-মূলক ব্যাখ্যা—যা তখনকার মত প্রশ্নের ধারাবাহিকতা থামিয়ে দেয়।

তবু এই টেলিওলজিকেল ব্যাখ্যা সবসময় মানুষের পছন্দসই হয় না। যেমন, প্রশ্ন তোলা হলো, রামবাবু দৌড়ুচ্ছেন কেন ? এর সহজ উত্তর হলো, অফিসের বাসটা ধরতে হবে, দেরী হয়ে গেছে যে ! আর পরম কারণমূলক উত্তর হবে, মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট আদেশ পায়ের মাংস পেশীতে পৌঁছে গেছে বলে। দ্বিতীয় উত্তর শুনলে, যে কোন লোক বলবেন, ইয়ার্কি হচ্ছে ?—অথচ এই উত্তরে বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসতা নিবারিত হয়।

সেই ছেলে আর বাবার গল্প। ছেলে প্রতি মিনিটে বাবাকে হাজার প্রশ্ন করে,

তার কাছে পরম কারণমূলক উত্তর বলে কিছু নেই। বাবা নাজেহাল হয়ে ছেলেকে টফি, লজেন্স বই ছবি ঘুষ দেন, তবু ছেলের প্রশ্নের ধারা থামে না, অস্থির হয়ে ছেলেকে ধমক দিয়ে বাবা বলেন, এবার থামতো, বাপু! তোমার প্রশ্নের ঠেলায় আর পারিনে; আমরা আমাদের বাবাদের এত প্রশ্ন ছেলেবেলায় কখনো করিনি!—কাঁদকাঁদ মুখে ছেলে বলে, করলে বোধহয় আমার একআধটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতে; একটাও তো ঠিকঠাক পারলে না!

এখানে প্রশ্নের ধারা থামায় ধমক। যাজ্ঞবল্ক্যের সেকালীন পরমকারণমূলক উত্তরের পরেও গার্গী প্রশ্ন তুললে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে ধমকে বলেন, গার্গী অতি প্রশ্ন করোনা, মাথা ফেটে যাবে!

এই অতি প্রশ্নের বেড়া শিশুর জানা নেই। বিজ্ঞানীরাও মানেন না। এইজন্য পরম কারণমূলক বা টেলিওলজিকেল উত্তর নিয়ে বিজ্ঞানীদের যন্ত্রণা। পরম কারণ কি? এটাই যে পরম কারণ, বুঝলে কি করে? অসীমের গণিতের মত অসীমের শেষ যেমন জানা যায় না, তেমনি আজকে যাকে পরম বলি, কাল সে যে অন্য এক পরমকে আসন ছেড়ে দেবেনা—একি বলা যায়? কয়েকটা প্রশ্ন নেওয়া যাক।

—সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায় কেন?

—কারণ যেদিকে সূর্য অস্ত যায় সে দিকটাকে আমরা নাম দিয়েছি পশ্চিম।

—তাই বুঝি? তবে অস্ত যায় কেন?

—ঠিক অস্ত যায় না। পৃথিবী লাট্টুর মত পাক খায় বলে উলটো দিকে চলে যায়,—দেখিনা।

—পৃথিবী পাক খায়? কেন পাক খায়?

এ জাতীয় প্রশ্ন ধারার উত্তর খোঁজার চেষ্টায় গড়ে ওঠে নিউটনের মহাকর্ষবাদ, আইনস্টাইনের সাধারণ তত্ত্ব, এবং গণিত-ভিত্তিক কোয়ান্টাম মেকানিকস। তবু এতসব খেটেখুটে পৃথিবী যে লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে তার লেত্তিটির সঠিক নিশানা পাওয়া যায় না। কিছু কেন এখনো থেকে যাচ্ছে!

এই পরমকারণমূলক বা পরম কারণিক উত্তরের খোঁজে বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরকে টেনে আনছেন না; তাঁরা প্রকৃতি বা নেচারের কথা তুলছেন। আর পরমব্যাখ্যাকে আপাতত মানা হচ্ছে না, অন্তত নেচুর্যাল বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদার্থবিদ্যার শাখায়

নয়। সেখানে এখন যাকে মানা হচ্ছে তা হলো সীমিত পরিমিতির মধ্যে আপেক্ষিক বা তুলনামূলক বিচার। এই তুলনা অবশ্যই উপমা-উৎপ্রেক্ষা নয়; এটি হলো কোন একটি আপাত ধ্রুবকের সাহায্যে-সাপেক্ষে গুণাগুণ বা চারিত্রিক বিশিষ্টতার আলোচনা।

পদার্থবিদ্যা বা ফিজিক্সে পরম বলে কিছু নেই। না থাকুক; বায়োলজি বা প্রাণবিজ্ঞানে এখনো পরম কারণ খোঁজা হচ্ছে। যেমন, থাবার ব্যবহার হত্যার জন্য, পা থাকে চলে ফিরে বেড়াবে বলে, আর ডানা হলো ওড়ার কারণে। এ সব উত্তরে কারো কোন আপত্তি নেই। এরা টেলিওলজিকেল ব্যাখ্যা। কিন্তু এরপর প্রশ্ন ওঠে—এসব হলো কি করে? হলো কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিস্তর কচকচানি চলছে-চলবে গোছের চলেছে। বর্তমানে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীদের মত হলো, এসব প্রকৃতির নির্বাচন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই সব পদ্ধতিগুলিকে প্রকৃতির কাছে টেঁকসই মনে হয়েছে। প্রকৃতি নিজেই পেপার সেটার, ও একজামিনার; সেই আবার ইণ্টারভিউ নিয়ে ঝাড়াই-বাছাই করে এদের বেছে নিয়েছে; এরা ভাল হতে পারে, মন্দ হতে পারে, হতে পারে সুন্দর বা অসুন্দর, সহনীয় বা দুঃসহ। এরা সকলেই প্রকৃতির নির্বাচিত।

এই ব্যাখ্যায় কিছুটা হাঁফটানা গেল। কিন্তু তারপর আবার প্রশ্ন, প্রকৃতিকে কি ঈশ্বর বলে ভাবব? অথবা সামান্য চোখ বা প্রাণীজগতের প্রাথমিক চেতনার ইন্দ্রিয়টি শুধু কি প্রকৃতির নির্বাচন ক্রিয়ার ফলে উত্তরোত্তর উন্নত হয়ে বর্তমান মানুষের জটিল চক্ষু-মস্তিষ্কের অবস্থা পেয়েছে? প্রকৃতিই কি সব?

সঙ্কর প্রাণী বা সঙ্কর গাছ বিজ্ঞানীরা করেছেন, এখানে বিজ্ঞানীদের নির্দেশনা দেখা-বোঝা যায়। তাঁরা গাইড। প্রকৃতি কিভাবে নির্দেশ দিচ্ছে, গাইড করছে?

সরীসৃপ থেকে পাখির উদ্ভব; বেশ মানা গেল। সরীসৃপের আঁশ হঠাৎ কেন পালকের আকার পায়, যার কোন পেশি নেই, যে কোন কাজের নয়, শুধু ফুলের পাপড়ির মত ছড়িয়ে থাকে? ঈল মাছ বিদ্যুৎ নিয়ে কাদার মধ্যে পথ খোঁজে, সামান্য বিদ্যুৎ শক্তি হলেই সেখানে চলে যায়। তবু সে কেন এত উচ্চ বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি করে যা মানুষকেও অবশ করে দেয়? গরু কেন জাবর কাটে? জিরাফের কেন শ্রুতি স্বর নেই? ঘোড়ার যে আদি চেহারা আবিষ্কৃত হয়েছে তা হলো খরগোশের

এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। কয়েক হাজার বছরের বিবর্তনের ধারায় সেই আদি রূপ এখন অশ্বাকৃতি পেয়েছে, যে গাড়ি টানে. মাল বয়, অথবা যার দৌড়ের উপর বাজি ধরা হচ্ছে। বিবর্তন বা এভল্যুশনের ধারায় কি পরম ব্যাখ্যা সম্ভব? প্রাকৃতিক নির্বাচন কি টেলিওলজিকেল মীমাংসা টেনে আনতে পারবে?

একদল বিজ্ঞানী ঐ বাজি ধরার কথা তুললেন। বুলেট টেবিলে গুঁটির দান নির্দিষ্ট করে বলা যেতে পারে যদি সমস্ত সম্ভাব্য অস্থির পরিবর্তনশীল অবস্থা বা কারণ-গুলিকে স্থিরভাবে জানা যায়,—এটি গাণিতিক নিয়মে সম্ভব। কিন্তু সব সম্ভাব্য অবস্থা কি জানা যায়? কোন কোন বিশেষ টেবিলের ফলাফল হয়তো বলা যায়, সর্বত্র সেকি সম্ভব? যাকে বলা হয় in principle বা মূলতঃ, সেই ভাবে সব পাশার সব দান মূলতঃ বলা সম্ভব নয়। তবু এখানে সম্ভাব্য সব ঘটনা প্রবাহের কথা ভাবা যেতে পারে। পাঁচজন অন্ধের ভেবে-নেয়া হাতির চেহারার সবটা মিলে জুলে হাতির কাছাকাছি জন্তুর চেহারার আদল পাওয়া যাবে; তবু এখানে বাদ থাকে হাতির দাঁত আর চোখের চিহ্নগুলি। এদেরও খোঁজ পাওয়া যাবে যদি অন্ধরা আরো হাতড়াতে পারে। ঠিক সেই ভাবে সব সম্ভাব্য ঘটনাদের ভাবা যায়, গোষ্ঠীবদ্ধ করা যায়; আর এইসব বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের আলোচনার ফলে কি ঘটছে বা ঘটতে পারে তা আপাতত হাতির চেহারার মত জানা যেতে পারে। এইখানেই আবির্ভাব হলো গণিতভিত্তিক সম্ভাবনা তত্ত্ব। এপথে প্রাকৃতিক বা প্রাণবিজ্ঞান উভয় শাখাতেই বহু 'কেন'র উত্তর পাওয়া গেল, অনেক উত্তরের সম্ভাবনার খোঁজ পাওয়া যায়। সম্ভাবনার ভাবনায় সত্যকে কিছুটা জানা যায়!

তবে এই সম্ভাবনার তত্ত্বে চান্স বা দৈব অথবা সুযোগ কথাটি লুকিয়ে থাকে। প্রকৃতির ইন্টারভিউ পার হওয়া একটা চান্স বৈকি। অথবা কণাজগতের ভাঙচুরলায় কোন কণাটি আগে ভাগে এগিয়ে আসবে এটি জানা যায় না; এখানেও যে চান্স নিতে পারে সে আসে। টেলিগ্রাফের তারে বসে থাকা অনেক পাখির কোনটা যে আগে উড়ে যাবে সে কি সঠিক বলা যায়? সবারই এখানে সমান সুযোগ। Lady Luck বা ভাগ্য দেবীর আশীর্বাদ কেউ পায়, কেউ পায় না? জ্ঞানের সমুদ্রের পারটা কি শেষ পর্যন্ত সম্ভাবনার অরণ্য দিয়ে ঘেরা থাকবে? কেন?

এই পরিস্থিতি কোন কোন বিজ্ঞানী সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছেন, কেউ বা

পারেন নি। প্রাকৃতিক নির্বাচন বা অন্য যা কিছু বলা হোক না কেন, সেখানে নিয়ম থাকবে। প্রকৃতির বাছাই-এর মধ্যে সব বিপরীত, বিরোধাভাস আছে। আছে বিভিন্নতা, আপাত বিশৃঙ্খলা। তবু এই বিপরীতদের নিয়ে প্রকৃতির সমতার বোধ গড়ে ওঠে ; এক প্রাণী বিলুপ্ত হয়, অন্য প্রাণী আসে ; সৃষ্টি হয় নতুন প্রজাতির। এই নির্বাচনে কারচুপি থাকবে না, এখানে নিয়ম আছে—সেই নিয়ম সমতার, অথবা সমন্বয়তার। সেই নিয়ম কি সম্ভাবনার পথে গড়ে ওঠে ? সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ জানা গেলে নিয়মটিকে কি জানা যাবে ? এই নিয়ম বর্তমানে রাজনৈতিক নেতাদের মত কি সুযোগ অভিলাষী ? অথবা সুযোগ সন্ধানী যেখানে থাকে চান্স নিয়ে লড়ে যাওয়া ? অথবা এখানে কি থাকে সর্বার্থসার্থক মূল্যবোধের উপর গড়ে ওঠা অম্লান সহাস পরিমিতিটির মত একটি বোধ, একটি আইডিয়া বা তত্ত্ব ? আইনস্টাইন সেই তত্ত্বটি খুঁজে গেলেন, কারণ তাঁর মতে ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ নিয়ে পাশা খেলছেন না। আজকের এই অজানা চান্স শব্দটি পরবর্তীকালে অন্য অর্থ, অন্য রূপ পাবে ; প্রয়োজন বিশদ তথ্যানুসন্ধানের ; আরো অনেক কেন'র উত্তর খুঁজে পাওয়া। পুরনো সংখ্যাগুলির নতুন ব্যাখ্যার মত, চান্স এর নতুন অর্থ সম্ভাবনার সাপেক্ষে গড়া হবে না, হবে সুনির্দিষ্ট, সুনির্ধারিত অধিজ্ঞাত জ্ঞানের সাহায্যে। সে জ্ঞান তখনো হয়তো আপেক্ষিক, তবু সে অনেক সুবোধ্য। এখানে পাশার দানের বাজি জেতা নেই, নেই একগোছা চাবি নিয়ে আন্দাজে দরজা খোলার চেষ্টা। বরং একে বলা যাবে, জানলা দিয়ে বাইরের জগৎটিকে দেখা, আর কি করে সেই জগতে পা দেয়া যাবে সে নিয়ে মনে মনে ডাকঘরের অমলের মত চিন্তা করা। একদিন সে জগতে অমল পা দিবে, কারণ তারপরেও থাকে ভিন্ন এক নতুন জগৎকে দেখার জন্য অন্য এক জানলা, আর তার পাশে পাতা তার খাটটি। যেখানে শুয়ে, বসে সে বাইরের জগতের তথ্যগুলির সুলুক-সন্ধান জানবে, নতুন জগতের যাবার কথা ভাববে। কেমন করে সেই নতুন জগৎটিতে অমল পা দিবে। সে সম্ভাবনার বোধ এখন জানা নেই। তবু সেই অসম্ভব কাজটি হয়তো চিন্তার ফলে, ভবিষ্যতে, কোন এক সময়ে করে ফেলা হবে। সম্ভাবনা কি জানাবে সেই অসম্ভব পথটির নির্দেশ অথবা অন্য কোন নতুন তত্ত্ব ? সে কবে ঘটবে ? আর এই জগৎটিকে চেনার শেষ কোথায় ? শেষে আছে কি ? আছে কে ? অথবা শেষ পাওয়া যাবে কবে ? কেন এই জানার আকাঙ্ক্ষা ?

এই শেষ প্রশ্নের উত্তরে সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। আকাঙ্খার 'কেন' বিজ্ঞান-কে এগিয়ে টেনে নিয়ে যায়। অথচ তার যাত্রানদের দুই পারটি লুকোন বিবিধতা অস্থিরতা দিয়ে ঘেরা। কেন দিয়ে আঘাত করে পার ভেঙে দুকূলপ্লাবী জ্ঞানের প্রবাহ বহাবার ইচ্ছা বিজ্ঞানীদের।

জ্ঞানের সীমারেখা টানা যায়, অজানার সীমারেখা কি আছে? কতটুকু জানা গেছে? বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে অনেক জানার পর জানা গেল, এই জানা জ্ঞানটির হাজার 'কেন'র কলরোল তুলছে। তারা কি? তারা কে? তাদের জানা যাবে কখন? কবে? কেমন করে? কেন তারা অজানা? পরম কারুণিক ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী কি পরম কারণিক প্রকৃতি?

এই জানার ইচ্ছার নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে এইসব কেনরা বা কেমন করের দল। এরা রূপ পালটায়, ভাষা পালটায়, তবু প্রশ্ন চিহ্নটি পালটায় না।

আজকের বিজ্ঞান জগতের এই 'কেন'দের না জানলে অগ্রগতির ঠিক ঠিকানাটি জানা যাবে কি করে?

বিখ্যাত বিজ্ঞানী অটো ফ্রিশ তাঁর নিবন্ধ 'why' এ বিজ্ঞানীদের সেই আশার কথা জানালেন। বললেন, অন্যদিকে, ভবিষ্যতে এরা (নতুন পদ্ধতিরা) হয়তো বা নতুন অভাবনীয় প্রাকৃতিক ঘটনার কথা জানাবে। সে সব ভারি রোমাঞ্চের। তবু ভবিষ্যতের ঘোষণা আমি যে তখনো করতে পারব, সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ নই।'

নিঃসন্দেহ নন। তবু নিরাশ নন। কারণ, মানুষের জিজ্ঞাসার কেন এখনো আছে—আছে অজানাকে জানার ইচ্ছা। সেইতো বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান সুভাষিত

সূর্যদেহ একটি কঠিন ঘনীভূত জ্বলন্ত পিণ্ড। উহা হইতে অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছটা পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রবর্তী পিণ্ডের চতুর্দিকে আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ন্যায় অপেক্ষাকৃত শীতল বাষ্পের একটি আবরণ আছে। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি যাবতীয় মূল পদার্থ এই বহিরাবরণে বাষ্পাকারে বর্তমান, এই আবরণটির ভিতর দিয়া যখন পিণ্ড নিঃসৃত আলোক আসে, তখন প্রত্যেক মূল পদার্থ, তাহারা বিশিষ্ট বর্ণ অন্তর্গৃহীত করিয়া লয় এবং সেই সেই স্থানে কৃষ্ণরেখা উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই সমস্ত কৃষ্ণরেখা পরীক্ষা করিলে সূর্যের আবরণে কি কি মূল পদার্থ আছে, তাহা নির্ণয় করা যায়।

—মেঘনাদ সাহা

বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান

ডঃ অলোক চক্রবর্তী

শিক্ষার ধারা, প্রকরণ আর প্রয়োগ নিয়ে প্রত্যেক দেশেই সবসময়ে নানা ধরনের গবেষণা হয়ে থাকে। গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে পাঠ-সূচীরও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এসব পরিবর্তনের কাজ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর পাঠক্রমে বার কয়েক এই রকম পরিবর্তন হয়েছে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর এই আলোচনা নয়—এই আলোচনা কেবল উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীর 'পদার্থবিদ্যা' বিষয়টির উপর। যে কোন বিষয়ের উপর পাঠ গ্রহণ করতে গেলে কয়েকটা অভ্যাসের প্রয়োজন।

এক নম্বর, যে বিষয় লিখতে যাচ্ছি, তার পূর্বের বিষয়গুলি জানা আছে কিনা, সেটা দেখতে হবে। দু'নম্বর, পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে, তা যে কোন বিষয়েরই উপর হোক একাগ্রতা আর আগ্রহ দরকার। তিন নম্বর, যে বিষয়টি পড়ছি তাকে ভালবাসা, তাকে পছন্দ করা চাই।

কোন একটা অধ্যায় বা অংশ সম্পূর্ণটা একবার ধরে ধরে রিডিং দিয়ে নেবে। হাতে থাকবে একটা পেন্সিল। সেটা দিয়ে যে নামগুলি আগে পাও নি, এই অধ্যায়েই নতুন শিখেছো, সেগুলি চিহ্নিত কর। গাণিতিক অংশে যেখানে গুণ-ভাগ করে শেষে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে, সেই সব অংশগুলি প্রথম বার রিডিং-এর সময় মোটামুটি চোখ বুলিয়ে যাও। তবে শেষ সিদ্ধান্তটির প্রতি ভাল করে নজর দাও, এরপর বই বন্ধ করে তুমি চিন্তা কর পঠিত অধ্যায়ের মূল বক্তব্য।

এর পরের দিন, ঐ অধ্যায় আবার পড়তে হবে। এবার প্রথমে নতুন term-গুলি আলাদা আলাদা করে দু তিনবার করে পড়। এরপর গাণিতিক অংশ দেখতে হবে। কি প্রমাণ করতে যাচ্ছো, সেটা আগের দিনই জানা হয়ে গেছে। তাই এবার

খাতা খুলে লিখে কষতে থাকো। দু'একটা গাণিতিক ধাপ সবসময়েই এড়িয়ে যাওয়া হয়, পাঠ্যপুস্তকে নিজে প্রত্যেকটি ধাপ লিখে লিখে করে ফেল।

এরপরের কাজ হচ্ছে ঐ অধ্যায়ের কষে দেওয়া অঙ্কগুলি দেখা। এবার দেখো গ্রন্থে কিভাবে করা হয়েছে। অনেক সময়ে হয়তো দেখবে তোমার ব্যবহৃত সূত্রেতেই অঙ্কটা আরও তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। গ্রন্থে হয়তো অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে করা হয়েছে। তখন তোমার কতো আনন্দ বলো তো ? এবার কষে দেওয়া সব অঙ্কগুলি ঐভাবেই দেখে যাবে। এক একটা অঙ্কে এক এক ধরনের অজানা রাশি। তোমার ধারণার সঙ্গে গ্রন্থের ব্যবহৃত সূত্র মিলছে কিনা, সেটা যাচাই করতেই হবে। অর্থাৎ তোমায় চিন্তাশীল হয়ে উঠতে হবে। আবার কোন কোন অঙ্কে দেখা যাবে আগে একটা রাশির মান বার করে নিতে হবে এবং ঐ মান অন্য একটা সমীকরণে বসিয়ে অজানা রাশির মান নির্ণয় করতে হচ্ছে। প্রথম চোটে হয়ত অঙ্ক হবে না, তাতে ভয় পেয়ো না।

কোন একটা অধ্যায়ের পাঠগ্রহণ মোটামুটি বেশ বুঝে শেখা হয়ে গেলে, প্রশ্নপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখ। ঐ সব দেখে একটা প্রশ্নপত্র তৈরি কর, যেগুলি সাধারণ বা common সেগুলি একবার করেই লিখবে। এবার ঐ প্রশ্নের উত্তরগুলি লেখো দরকার হলে বই দেখেই। উত্তর অযথা দীর্ঘ বা অতি সংক্ষিপ্ত করবে না, প্রয়োজনী চিত্র পরিষ্কার করে যথাযথ জায়গায় আঁকবে, চিত্রে ব্যবহৃত কোন অক্ষর দু'বার হয়ে গেছে কিনা লক্ষ্য করবে, আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আলোক-রশ্মির দিকে বোঝাতে তীর চিহ্ন ব্যবহার করে। অসদ্ বিম্বের ক্ষেত্রে ছেদ যুক্ত লাইন দেবে। খাতায় প্রশ্নোত্তর এবং অঙ্ক বেশ ভালোভাবে লেখার পর যাদের সুবিধা আছে তারা শিক্ষকদের দেখিয়ে নাও।

আর যাদের সুবিধা নেই ? তারা ? ?

হ্যাঁ, তাদেরও ব্যবস্থা আছে। দুতিন জন বন্ধু মিলে একটা টিম তৈরি কর। তারপর ঠিক করবে একজন আলোক-অংশ, একজন চুম্বক—অংশ, একজন তাপ-অংশ করবে। তোমার ভাগে পড়েছে তাপ-অংশ। তুমি তোমার সম্পূর্ণ note করে ফেললে। তোমার বন্ধুরা অন্য অংশ তৈরি করবে কিন্তু তাপ অংশ শুধু বই থেকে পড়বে। তোমার সম্পূর্ণ note তার হাতে দেবে এবং সে পড়ার পর তার মতামত নেবে। দেখো সে তোমার অনেক ভুল ধরবে। ঘাবড়িও না, আবার সে যখন চুম্বকত্ব-অংশ লিখে তোমায় দেবে—তুমিও তার অনেক দোষ দেখতে পাবে।

লুইস্ ক্যারলের ধাঁধা

সুনীত রায়

লুইস্ ক্যারলের আসল নাম ছিল, চার্লস্ লাটউইজ ডজ্‌সন্। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী চেশায়ার এর গীর্জার যাজক রেভারেণ্ড চার্লস্ ডজসনের প্রথম পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৮ সালে 'দি রেকটরি' পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা 'ক্রাণ্ডল ক্যাসল' প্রকাশিত হয়। তিনি ছিলেন মুখচোরা লাজুক প্রকৃতির তোতলা— অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট্ অব্ চার্চ স্কুলের একজন অঙ্কের শিক্ষক। ক্যারল্ ছোটোদের খুব ভালোবাসতেন, তাদের খুশি করার জন্যে অনেক ধরনের রূপকথার গল্প শোনাতেন, ম্যাজিক দেখাতেন আর ভালো ভালো মজাদার ধাঁধা তৈরি করতেন। অ্যালিসের অ্যাডভেঞ্চারে অনেক ধাঁধা কথার মধ্যে, ছড়ার মধ্যে, গানের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে— যা পড়তে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু, ধাঁধার উত্তরের কথা চিন্তা করলেই সমস্ত মজাটা নিমেষের মধ্যে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, পড়ে থাকে একরাশ বিরক্তি আর উৎকণ্ঠা।

লুইস্ ক্যারলের কিছু ধাঁধা যা আমরা 'আজবদেশে' দেখতে পাই, সেই নিয়ে আলোচনা করার পর, কিছু বিখ্যাত গাণিতিক ও সাঙ্কেতিক তর্কমূলক ধাঁধা নিয়ে আলোচনা করব।

'অ্যালিসের অ্যাডভেঞ্চার' এর পাগলা চায়ের আসরের একটা দৃশ্যে দেখতে পাই, অ্যালিস্ খুব আগ্রহভরে আড়চোখে টুপিওয়ালার ঘড়িটা দেখছিল আর বলছিল 'কি আজব ঘড়িরে বাবা, দিন বলা যায়, সময় বলা যায় না।' টুপিওয়ালা অমনি বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, 'কেনই বা বলা যাবে ? তোমার ঘড়িতে কি সাল বলা যায় ?' অ্যালিস্ উত্তরে বললে অনেকদিন ধরে তো একই সাল থাকে। টুপিওয়ালা শুনে বলে, 'আমারও সেই একই অবস্থা।' এইভাবে ঘটনা ঘটতে থাকলে, হঠাৎ টুপিওয়ালা অ্যালিস্‌কে জিগ্যেস করে বসে, বলতে পারলে না তো আমার ঘড়িটা কি ? অ্যালিসের কোন উত্তর আমরা পাইনি। আর এই আজব ঘড়ির উত্তর ক্যারলও কোনো জায়গায় বলে যান নি। আমার মনে হয়, আজব ঘড়িটা 'ক্যালেণ্ডার' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, ক্যালেণ্ডার দেখে আমরা দিন বলতে পারি। কিন্তু সময় বলতে পারি না। আর সাল তো ৩৬৫ দিন ধরে একই থাকবে—সে বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে ?

'আজবদেশে' এর এক জায়গায় দেখা যায় যে, জন্ তার ভাই জেমকে একটা বাক্স দিল, যাতে কোনো ঢাকনা নেই কিন্তু অসংখ্য তালা লাগানো ছিল। জেম বাক্সটা পাওয়ার পর যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে গেল আর তক্ষুনি সেটা জনকে ফেরৎ দিয়ে দিল। হঠাৎ দেখা গেল, বাক্সের দুটো ঢাকনা খুলে গেল। বাক্সের গায়ে যে অসংখ্য তালা লাগানো ছিল, তাদের একটারও চাবি নেই। বাক্সটা কি ? লুইস্ ক্যারল এই ধাঁধার উত্তরে বলেছিলেন বাক্সটা হল মানুষের মাথা, কোনো বিশেষ ঘটনাকে একটা রূপকের আশ্রয় নিয়ে তৈরি করলে, সেটা একটা বিশেষ ধরনের ধাঁধার রূপ নেয়, এই ধাঁধাটাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ক্যারল ধাঁধার মূল সত্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন, জেমের মাথায় খুব কোঁচকানো কোঁচকানো ঘন চুল ছিল। যখন সে ঘুমুচ্ছিল তখন তার ভাই জন তার মাথায় একটা ঘুঁসি মারল। যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে যেতেই চোখের বন্ধ পাতা দুটো খুলে গেল। সেই সময় জেম সন্দেহবশতঃ ভাই জনকে দ্বিগুন জোরে তার মাথায় একটা ঘুঁসি মারল। মাথার চুলগুলো হল অসংখ্য তালা আর ঢাকনি দুটো হল চোখের দুটো পাতা। আর রহস্যময় বাক্সটা মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে ক্যারলের ধারণা। এরকম ধরনের বেশ কিছু ধাঁধার অদ্ভুত অদ্ভুত সব বিশ্লেষণ তিনি করেছেন।

'আজব দেশের' ধাঁধা যে অনেক তা অনেক আগেই বলেছি, এবার এই শেষ ধাঁধা দিয়ে 'আজবদেশের' ধাঁধা শেষ করব।

একদিন রাজা কোষাগারে গিয়ে দেখলেন, তার আর্থিক সঙ্গতি আর আগের মতো নেই। তাই, খরচ কমাবার উদ্দেশ্যে তাঁর সভায় যে একশোজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের অন্য জায়গায় চলে যেতে অনুরোধ করলেন। ঐ একশোজন জ্ঞানীর মধ্যে এমন কিছু জ্ঞানী ছিলেন যাঁদের উপস্থিতি রাজার পছন্দ ছিল না। কারণ, তাঁদের মতবাদের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা পার্থক্য থেকেই যেত। তার ফলে, রাজা এঁদের কাছ থেকে খুব একটা উপকার পেতেন না। ঐ বিশেষ ধরনের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? এই নিয়ে একটা ছড়ার ধাঁধা আছে—

"সাতজনের দুটো করে চোখই অন্ধ,
দুজনের একটা করে চোখ অন্ধ।
চারজনে দুটো করে চোখেই দেখতে পায়,
ন'জন একটা করে চোখে দেখতে পায়।

ছড়াটা ভালো করে পড়লে বুঝতে পারা যায়, দুজনের একটা করে চোখ অন্ধ আর নজন একটা করে চোখ দেখতে পায়। দুটোর মধ্যে গড় নিলে দেখতে পাই। পাঁচজন দুটো করে চোখেই দেখতে পায়। আবার সাতজন সম্পূর্ণই অন্ধ। তাহলে তাঁরা সংখ্যায় বারো জন হলেন। কিন্তু চারজন দুটো চোখেই দেখতে পায়। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা একটু চিন্তা করলে দেখা যায় মোট নজন দুটো চোখেই দেখতে পায় আর সাতজন সম্পূর্ণই অন্ধ। অর্থাৎ সেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা দলে ষোলোজন ছিলেন।

সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্বের মুন্সিয়ানা ফুটিয়ে তুলতে লুইস্ ক্যারল্ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্যারল চব্বিশটা শুয়োরের ছানা দেখতে পেলেন। তখন, তাঁর মনে হল এই চব্বিশটাকে চারটে খোঁয়াড়ে কেমন করে রাখলে শেষ খোঁয়াড়ে শুয়োরের সংখ্যা আগের খোঁয়াড়ের শুয়োরের সংখ্যা যতটা দশের কাছাকাছি ছিল, তার থেকে বেশি দশের কাছাকাছি হবে। প্রশ্নটার ধরন জটিল হলেও ধাঁধাটা খুব সহজ। প্রথম খোঁয়াড়ে আটটা শুয়োর রাখা হল, দ্বিতীয় খোঁয়াড়ে দশটা শুয়োর রাখা হল, তৃতীয় খোঁয়াড়ে একটাও শুয়োর রাখা হল না,

চতুর্থ খোঁয়াড়ে ছু'টা শুয়োর রাখা হল। দ্বিতীয় খোঁয়াড়ে শুয়োরের সংখ্যা দশ। এই দশ, আগের খোঁয়াড়ে শুয়োরের সংখ্যা আটের থেকে দশের বেশী কাছাকাছি। তৃতীয় খোঁয়াড়ে একটাও শুয়োর নেই, সুতরাং সেটাও দ্বিতীয় খোঁয়াড়ে দশটা শুয়োরের থেকে দশের বেশী কাছাকাছি। চতুর্থ খোঁয়াড়ে ছ'টা শুয়োর তৃতীয় খোঁয়াড়ে শুয়োরের থেকে দশের বেশী কাছাকাছি। আবার প্রথম খোঁয়াড়ে আটটা শুয়োর চতুর্থ খোঁয়াড়ের ছ'টা শুয়োরের থেকে বেশী দশের কাছাকাছি। এক কথায়, প্রথম খোঁয়াড়ে আটটা শুয়োর, দ্বিতীয় খোঁয়াড়ে দশটা শুয়োর, তৃতীয় খোঁয়াড়ে একটাও শুয়োর না রেখে চতুর্থ খোঁয়'রে ছ'টা শুয়োর রাখলে ধাঁধার সব নিয়মই মানা হবে।

হঠাৎ করে যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, ছুটো ঘড়ি আছে। একটা ঘড়ি একদমই চলে না, আর একটা ঘড়ি প্রত্যেকদিন এক মিনিট করে পিছিয়ে যায়। কোন ঘড়িটা ভাল? সবাই একই উত্তর সমস্বরে বলে উঠবে, পরের ঘড়িটা। ঘড়ির চরিত্রটা একটু ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই দ্বিতীয় ঘড়িটা প্রতিদিনে এক মিনিট করে পিছিয়ে পড়ার ফলে, আবার ঠিক সময় বারো ঘণ্টা বা সাতশো কুড়ি মিনিট পরে দেবে। অর্থাৎ ছুবছরে একবার ঠিক সময় দেবে। অবশ্য বছরটার প্রত্যেক মাস সাধারণ হিসেব মত ত্রিশ দিন ধরে নিয়েই করতে হবে। কিন্তু, যে ঘড়িটা চলে না, ধরা যাক সেটা আটটায় বন্ধ হয়ে গেছে। সারাদিনে ছুবার আটটা বাজবেই, একবার সকালে আর একবার রাত্তিরে। তাহলে, প্রথম ঘড়িটা দিনে ছুবার ঠিক সময় দিচ্ছে। এখন যদি জিগ্যেস করা হয়, কোন ঘড়িটা ভালো? এবার সবাই স্বীকার করবে প্রথম ঘড়িটাই ভালো। ছু'বছরে একবার ঠিক সময় দেয় যে ঘড়ি তার থেকে দিনে ছু'বার ঠিক সময় দেয় যে ঘড়ি সেটা তো নিশ্চয়ই ভালো। এই ধাঁধা থেকে আমরা আরও একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যেসব জিনিস হঠাৎ করে ভালো মনে হয়, সবসময় সেটা নাও হতে পারে।

সংখ্যাতত্ত্ব কি ও কেন?

অমূল্য গুপ্ত

'মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা আর স্ট্যাটিসটিক্স'—কথা কটি নাকি বলেছিলেন ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের অন্যতম নায়ক ডিসরেলী। শুধু ডিসরেলীই নন, সংখ্যাবিজ্ঞান বা স্ট্যাটিসটিক্সের প্রতি অবজ্ঞা বা বিতৃষ্ণার একটা মনোভাব অনেকেরই আছে। কিন্তু কেন ?

ইতিহাসের দিক থেকে স্ট্যাটিসটিক্স হল 'স্টেট এরিথমেটিক' বা 'রাষ্ট্র-গণিত'। এই গণিত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য তা মিটিয়ে দেয় গড়ের হিসেবে। এজন্য কারও কারও অভিমত হল, যে সমাজে স্ট্যাটিসটিক্স বিশারদদের বাড়-বাড়ন্ত, সে সমাজে স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বেরও বাড়ন্ত ঘটে। প্রথম যুগে রাষ্ট্রের কাজেই বিষয়টিকে ব্যবহার করা হত, এবং আজও হচ্ছে। কতদূর পর্যন্ত নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে নাগরিক বা প্রজাদের 'পকেট কাটা' চলে শাসকমাত্রেরই তা জানা চাই। যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে রাজা-রাজড়ারা জানতে চাইতেন লোকবল এবং অর্থবলের কতটা সংরক্ষণ তাঁদের আছে, শত্রুসৈন্যকে পরাভূত করতে কত লোককে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে হবে, কত সংখ্যক কামান, সৈন্যদের যুদ্ধ-পোশাক কতটা খাদ্য সম্ভার প্রয়োজন হবে, আর এজন্য কী পরিমাণ অর্থ চাই যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কি প্রজাদের পক্ষে জোগান সম্ভব।

প্রাচীনযুগে যে দুটি ক্ষেত্রে স্ট্যাটিসটিক্সের ব্যবহার ছিল তা হল কর চাপানো এবং মিলিটারি সার্ভিস। স্বভাবতঃই নাগরিকবৃন্দ বিষয়টিকে ভাল চোখে দেখত না।

সিজার অগাস্টাস একবার ফরমান জারি করেন যে, "বিশ্বের'' প্রতিটি লোককে নাম লেখাতে হবে। নিজ নিজ জনপদে ফিরে প্রত্যেক ব্যাক্তিকে তার নাম পঞ্জীভূত করার আদেশ হল। এই সব ঘটনা প্রাচীনকালে স্ট্যাটিসটিক্সের প্রয়োগের কথা মনে করিয়ে দেয়।

একজন বলেছেন, যদি স্ট্যাটিসটিশিয়ানরা না থাকতেন তাহলে বেথলেহেমের আস্তাবলের বদলে প্রভু যীশু নাজারাথের একটা ছোট্ট কুটিরের আরামদায়ক পরিবেশে জন্মাতেন। কথাটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সব যুগেই পরিকল্পনকারীরা জনগণের সুখসুবিধার প্রতি উদাসীন ও অন্ধ। বেথলেহেমের মতো একটা ছোট্ট জায়গায় জনতার ভিড় যে প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়াবে একথাটা তাঁদের চিন্তায় আসেনি।

স্ট্যাটিসটিক্সের প্রতি জনসাধারণের বিরূপতার আরও অনেক কারণ আছে। অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলেই রাষ্ট্র স্ট্যাটিসটিশিয়ানের স্মরণ নেয়। আর রাষ্ট্রের নির্দেশে তাঁরাও তখন কোটি কোটি টাকার চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েন, চার্ট আর টেবিলের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন কোটি কোটি টাকা নিয়ে ৫২ সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের সেবায় কি করবেন। কাজেই নিজেদের সামান্য যা পুঁজি আছে, জনস্বার্থে তাও যেন তাঁরা দিয়ে দেন। যাঁরা এই সব চার্ট ইত্যাদি তৈরি করেন তাঁরা যদি জানতেন বয়স্ক লোকেদের শতকরা দশজনও যদি এই সব চার্টের আর টেবিলের মাথামুণ্ডু বুঝতেন! চার্টের দিকে তাকিয়ে তাঁদের ক্ষোভ ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন তাদের অপারগতা। নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হয়, বিজ্ঞানের দ্বারা বিমূঢ়, তাঁর ক্ষোভ গিয়ে পড়ে চতুর স্ট্যাটিসটিশিয়ানদের ওপরে যাঁরা তাকে এতটা বোকা বানিয়েছে।

স্ট্যাটিসটিক্স জনপ্রিয় না হওয়ার আরও নানা কারণ আছে। যেমন এর প্রকাশ ভঙ্গিমায় কেমন যেন বিজ্ঞাপন ধর্মিতা। যথা জনসাধারণকে বলা হল: "অমুক বিশেষ শ্রেণীর (যাঁর প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধাভক্তি আছে)। 'দশজনের ন'জন' একটা উন্নত ধরনের পণ্য ব্যবহার করেন। নিঃসন্দেহে কথাটা একটা সহজ সত্য। কিন্তু এর গভীরে যে কিছু চাতুরী আছে সে কথা সংশয়বাদীরা যদি মনে করে তবে তাদের কোন পাপ হওয়ার কথা নয়। কেননা, 'দশজনের ন'জন' কথার মাধ্যমে অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগে পাঠকের মাথায় ঐ বিশেষ উন্নত শ্রেণীর প্রতি 'দশজনের ন'জন' ধারণাটিকে অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা আছে।

ঐ 'দশজনের ন'জন' বক্তার সুবিধামতো নির্বাচন করা হয়েছে কিনা সেকথাও বলা নেই।

এছাড়া, আরও মারাত্মক ব্যাপারও আছে। রাজনীতি ও ভেষজবিজ্ঞানের (দুটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হল মাত্র) একটি গোষ্ঠী নিজেদের বক্তব্যকে অহেতুক ফাঁপিয়ে প্রকাশ করেন। এ কাজে তাঁরা স্ট্যাটিসটিক্সের সাহায্য নেন এবং বিশ্বাস করেন যে 'সংখ্যা কখন মিথ্যা বলে না'। তাঁদের ধারণা যে 'সংখ্যাকে কিছুতেই বিরোধিতা করা চলে না।' তাঁরা তাঁদের এই বিশ্বাসে কিন্তু নিখাদ। ঝটপট সংখ্যা-বিজ্ঞান প্রয়োগ করে তাঁরা যখন কোন সিদ্ধান্তে আসেন তখনও ঐ বিশ্বাস চিড় খায় না। এদের দেখেই তো লোকেরা বলেন—

"There are lies damned lies and statistics"।

কিন্তু সংখ্যাবিজ্ঞান বা স্ট্যাটিসটিক্স আদপেই অবজ্ঞা বা বিতৃষ্ণার বিষয় নয়। অপব্যবহার করা হয় বলেই যে এর ব্যবহারের প্রয়োজন নেই একথা অযৌক্তিক। একথা সত্যি যে, সংখ্যারা যখন কোন বাস্তব সমস্যাঘটিত হয়, তখন ঐ সংখ্যাগুলোকে যথোচিতভাবে ব্যাখ্যা করা দুরূহ। আর একদিকে এরিথমেটিকের নিয়মকানুন খুবই সহজ-সরল। সমস্যাটি এখানেই। দশমিকের পর 19 ঘর অবধি গড় নির্ণয় একটা 'জলবৎ তরলং' ব্যাপার। আর ঐ গড়কে দেখতে-শুনতেও বেশ accurate বা সঠিক মনে হয়। আর তারপরেই কিন্তু বিষম বিপদপাত। যা গণিতের accuracy তাকে মন চালাতে চায় আলোচ্য সমস্যা-বিষয়ে (যার জন্য ঐ গণনা) আমাদের জ্ঞানের accuracy হিসাবে। এভাবে আমরা decision of accuracy-র শিকার হই। একবার যদি কোন উৎসাহীকে এই রোগে ধরে তবে তাঁর এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল সকলেরই সর্বনাশ।

বলতে গেলে, স্ট্যাটিসটিক্স অনুসন্ধানের একটি প্রণালী মাত্র। এর প্রয়োগ তখনই হয় যখন অন্যান্য প্রণালী আর কার্যকরী হয় না। এ একেবারে শেষ চেষ্টা, ডুবন্তের কাছে ভাসমান এক চেলা কাঠের মতো। ঠিকমত সম্পন্ন হলে স্টাটিস্টিক্যাল বিশ্লেষণ হল বিভিন্ন অনিশ্চয়তার সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ, আমাদের স্বীকারগুলোর দক্ষ সার্জারি। সার্জেন যেমন অনর্থক কাটা-ছেঁড়া থেকে নিজের ছুরি-কাঁচিকে সচেতনভাবে বাঁচিয়ে চলেন স্ট্যাটিসটিশিয়ানকেও ঠিক তাই করতে হয়। প্রায়ই ঘোষণা করতে হয় রোগী অপারেশন যোগ্য নয়। সত্যকার বিজ্ঞানের একজন সচেতন ও দক্ষ সেবকরূপে স্ট্যাটিস্টিশিয়ানদের যে একটা ভূমিকা রয়েছে সে সম্পর্কে বলতে গেলে, জনসাধারণ একেবারেই অজ্ঞ। সকল দক্ষ বিজ্ঞানীর মতো সংখ্যাতত্ত্ববিদও একমাত্র সত্যের কুঠারেই শান দেন এবং সৎ এবং সতর্ক অনুসন্ধানের পণ্য ছাড়া আর কোন পণ্য বিজ্ঞাপনের বেসাতি করেন না।

উদ্ভিদের আত্মরক্ষা

প্রমীলা বসু-ও সুনন্দা মুখোপাধ্যায়

মানুষকে যখন কেউ ব্যথা দেয় বা আক্রমণ করে, তখন তার কাছে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র না থাকলে সে হাত, পায়ের সাহায্যে বাধা দেবার চেষ্টা করে। এমন কি যদি হাত, পায়ের জোর না থাকে, তবে সে দাঁতের সাহায্যেও জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। অন্যান্য জীবেরাও নানান উপায়ে বা কৌশলে জীবন রক্ষা করে। সেসব আলোচনা করতে হলে অন্য এক অধ্যায়ে চলে যেতে হবে। আমরা এখানে উদ্ভিদ কি কৌশলে আত্মরক্ষা করে, সেই বিষয়ে আলোচনা করবো। আত্মরক্ষার কৌশলগুলি শুধু তাদের নিজেদের সৃষ্ট নয়, পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই উৎপত্তি। বিশ্ব-প্রকৃতিও এদের নানানভাবে সাহায্য করে।

লেবুর কাঁটা

আত্মরক্ষার বর্ম হিসাবে নানাপ্রকার কাঁটাঃ যতরকমের কাঁটা দেখা যায় তাদের অধিকাংশই ধারালো ও শক্ত ছুঁচের মত। বিশেষভাবে তৃণভোজী প্রাণীদের দূরে রাখার জন্য এদের সৃষ্টি। ভাল ক'রে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশ কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বেল, লেবু, ডুরান্টা, বাগানবিলাস প্রভৃতি গাছের কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। এটা বোঝবার উপায় হচ্ছে যে, কাঁটাগুলো থাকে পাতার কক্ষে বা শাখার ডগায়। এই কাঁটা কখনও (যেমন ডুরান্টা) পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে। উদ্ভিদদেহের অন্তঃস্থলের কলা (tissue) থেকে এই কাঁটার উৎপত্তি, তাই এদের সহজে স্থানচ্যুত করা যায় না। এগুলি সরল, শক্ত ও ছুঁচলো, কাজেই মোটা চামড়ার প্রাণীর দেহ সহজেই বিদ্ধ করতে পারে।

কোনও কোনও গাছের পাতা বা পাতার অংশ বিশেষ কাঁটায় রূপান্তরিত হয়।

ফনী মনসা

প্রায় অধিকাংশ মনসাজাতীয় গাছের দেহের বহিঃস্তরে প্রচুর ছোট ছোট সূক্ষ্ম কাঁটা দেখা যায়। ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলে দেখা যায় যে, এগুলি বেশ সুবিন্যস্ত-ভাবে সাজানো থাকে। এরা সবই হচ্ছে ঐসব গাছের পাতার রূপান্তর। এদের সংস্পর্শে এলে এরা সহজেই জীবজন্তুর গায়ে আটকে লেগে থাকে। প্রাণীর দেহ থেকে এদের ছাড়ান কঠিন। এইসব গাছের কাণ্ড সবুজ ও খাদ্যে পরিপূর্ণ থাকে, কাঁটাগুলি পাতার কাজ করে। এদের কাঁটার সঙ্গে একরকম বিষাক্ত রস থাকায় ক্ষতস্থানে খুব জ্বালা করে।

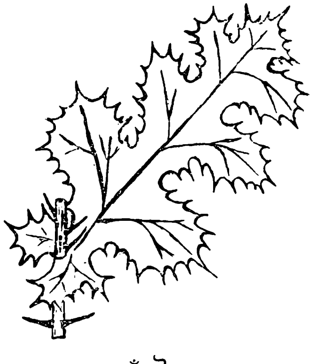
শেয়ালকাঁটার পাতা

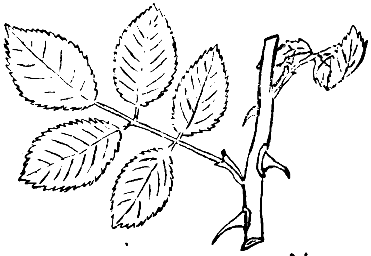
গোলাপের কাঁটা

আনারস, খেজুর, কেতকী, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি গাছের পাতার ডগা এবং শেয়াল কাঁটার পাতার প্রান্ত কাঁটায় রূপান্তরিত হয়।

আবার কিছু কিছু শক্ত ছুঁচল কাঁটা দেখা যায় যেগুলি বাঁকা হয়। এদের উৎপত্তি উদ্ভিদদেহের বহিঃস্তরের কলা থেকে; তাই এদের সহজেই স্থানচ্যুত করা যায় এবং এতে উদ্ভিদের দেহের কোন ক্ষতি হয় না। কাণ্ড, শাখা বা পাতায় এই ধরনের কাঁটা এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে। গোলাপ, বেত, শিমূল প্রভৃতি গাছে এই কাঁটা দেখতে পাওয়া যায়। রামবেগুন ও কন্টিকারী গাছে পাতার শিরা-উপশিরাও কাঁটায় ভর্তি থাকে।

কুল, বাবলা, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের উপপত্র (stipule) দু'টি ধারালো কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। পত্রমূলের (leaf base) দু'ধারে দু'টি কাঁটা থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এইসব কাঁটাযুক্ত গাছদের তৃণভোজী প্রাণী বিশেষভাবে পাশ কাটিয়ে চলার চেষ্টা করে।

আত্মরক্ষার বর্ম হিসাবে রোঁয়াঃ বিচুটি গাছের কথা তো সবাই জানো। এদের পাতা, ফল বা সমস্ত দেহ ছোট রোঁয়ায় ভর্তি থাকে। এই রোঁয়ার নীচে এমনভাবে বিষাক্ত রস সঞ্চিত থাকে যে, রোঁয়াগুলি প্রাণীদেহের সামান্য সংস্পর্শে এলেই সেগুলির সরু মুখ ভেঙে গিয়ে প্রাণীদেহে ঢুকে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে ইনজেক্শনের মত রস এসে দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এর দরুণ প্রথমে চুলকানী ও পরে প্রবল যন্ত্রণা শুরু হয়। এইজন্য এই ধরনের গাছগুলিকে শুধু তৃণভোজী প্রাণীরাই নয় এমন কি মানুষেরাও এড়িয়ে চলে।

তামাক, পুনর্নবা, ভেরেণ্ডা প্রভৃতি গাছের পাতায়, শাখা-প্রশাখায় ও ফলে আরেকরকম রোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলি খুব চট্চটে ধরনের যদি কখনওকোন প্রাণী এইসব গাছের অংশবিশেষ ভুলক্রমে খেয়ে ফেলে, তবে তার নিস্তার নেই। ঐ আঠালো রোঁয়া সমস্তমুখে আটকে যায় আর তা ছাড়ানো বড়ই কষ্টকর।

আত্মরক্ষার অন্যান্য উপায়ঃ এমন সব বহু গাছ আছে, যাদের দেহের ভেতর থেকে নানানরকম বিষাক্ত রস নিঃসৃত হয়। এইসব রসের রকমফের আছে।

আকন্দ, করবী, কলকে, নয়নতারা, বট, ডুমুর, পেঁপে, আফিং, শেয়াল কাঁটা প্রভৃতি গাছের দেহে দুধের মত আঠালো জিনিস আছে, যা প্রাণীদেহের চামড়ার

সংস্পর্শে এলে নানারকম অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তাই গরু ছাগলের হাত থেকে বাগানকে রক্ষা করার জন্য এইসব গাছ বেড়া দেওয়ায় ব্যবহার করা হয়।

তামাক গাছে নিকোটিন, সিঙ্কোনা গাছে কুইনাইন, আফিং গাছে মরফিন, নাক্সভমিকা গাছে স্ট্রীক্‌নিন্, ধুতুরা গাছে ডেটুরিন প্রভৃতি ক্ষার-জাতীয় জিনিস এমনই বিষাক্ত যে, এর সামান্য পরিমাণ খেলে সবল জন্তুও প্রাণ হারায়।

পটল ও নিমের পাতায় তিক্ততা, গাঁদাল গাছের পাতায় বিশ্রি গন্ধ, তুলসী জাতীয় গাছে উগ্র গন্ধ থাকায় এইসব উদ্ভিদদের অনেকেই পরিহার করে চলে।

ওল ও কচু খেলে বা এইসব গাছের সংশ্রবে এলে জিব, গলা, হাত, পা চুলকায় কারণ র‍্যাফিডস্ (Raphides) নামে একরকম অতিসূক্ষ্ম সূচাকৃতি লবণ জাতীয় পদার্থের কেলাস আছে, যা' মুখে, হাতে ও পায়ে লাগলে এইরকম অনুভূতি হয়। তাই এইসব গাছ গরুছাগলের হাত থেকে সহজেই বেঁচে যায়।

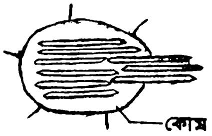

কচুর র‍্যাফিড্‌স্

এছাড়া কন্দ ও খাদ্যসঞ্চিত শিকড় যেমন আলু, পেঁয়াজ, মূলা, গাজর, রাঙ্গাআলু প্রভৃতি মাটির নীচে থাকার দরুণ রক্ষা পায়।

কতকগুলি উদ্ভিদকে আবার দেখা যায় কোন জীবজন্তুর আকার ধারণ করতে। এরা দেখতে এমন হয় যে, সে সব গাছকে হঠাৎ খেলে প্রাণীরা ভয় পেয়ে যায়। দার্জিলিং, শিলং প্রভৃতি পাহাড়ি জায়গায় এক ধরনের সর্পাকৃতি কচু জাতীয় গাছ আছে। পাহাড়ের পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা যায় ঘন গাছপালার ভিতর সাপ যেন ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই কচুজাতীয় গাছের ফুলের মঞ্জরীগুলি একটি বড় সবজে-বেগুনী রঙের মঞ্জরী-পত্র দিয়ে ঢাকা থাকে। এই মঞ্জরী পত্রগুলি একটি বড় ফণার আকারে ফুলের মঞ্জরীগুলিকে ঢেকে রাখে।

সাপের ফণার মত মঞ্জরীপত্র

জীবনী বিষয়ক

আধুনিক বিজ্ঞান জগতে ভারত

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

একসময় ভারত ছিল সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ পীঠভূমি। তখন দেশদেশান্তর থেকে বহু শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষায় ভারতের তক্ষশিলা, নালন্দা, কাঞ্চী, বিক্রমপুর প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের পীঠস্থানগুলিতে উপনীত হত।. গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, স্থাপত্য বিদ্যা, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি বিজ্ঞানের নানা শাখায় ভাস্করাচার্য, আর্যভট্ট, চরক-সুশ্রুত, কণাদ, নাগার্জুন, ময়দানব (সূর্যসিদ্ধান্ত রচয়িতা), জীবক প্রমুখ ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধকদের অবদান তখন সমগ্র বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা ও সমাদর অর্জন করেছিল।

ভারতের এই গৌরবোজ্জ্বল যুগের পর এলো এক অন্ধকার বন্ধ্যা যুগ যার ফলে বিশ্বের বিজ্ঞানচর্চার আসর থেকে ভারত হলো স্থানচ্যুত। দাতার আসন থেকে ভারত নেমে এলো গ্রহীতার দলে। বিজ্ঞানজগতে নিজস্ব কিছু দান করার যোগ্যতা তার আর ছিল না।

১৮৯৫ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যখন তাঁর অনন্য সাধারণ অবদান নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞান-সভায় উপস্থিত হলেন, তখন থেকে এই অবমাননার যুগের অবসান হলো। আধুনিক বিজ্ঞানজগতে জগদীশচন্দ্রই প্রথম দেখালেন—ভারত ভিক্ষুক নয়, ভারতেরও নিজস্ব কিছু দেবার আছে। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানজগতে ভারতের আসন আবার প্রতিষ্ঠিত হলো। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এসে সে আসন আরও প্রতিষ্ঠিত করলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র এদেশে বিজ্ঞানচর্চার যে স্বর্ণদ্বার খুলে দিলেন, সে পথে অগ্রসর হয়ে পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস রামানুজন, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ প্রতিভাধর

বিজ্ঞানসাধকেরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদানে বিজ্ঞানজগতে ভারতের মুখ আরও উজ্জ্বল করলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্রের মূল্যবান আবিষ্কারগুলিকে প্রধান তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ের আবিষ্কার বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ সংক্রান্ত। এক ধরনের ছোট যন্ত্র তৈরি করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, ২·৫ সেন্টিমিটার থেকে ৩·৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র বিদ্যুৎতরঙ্গে আলোকের শক্তি বর্তমান। এই আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি বিনা তারে শব্দ প্রেরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি বিনা তারে শব্দ প্রেরণ করে বিশ্বজগৎকে বিস্মিত করেছিলেন।

১৮৯৫ সালের গোড়ার দিকে কলকাতার টাউন হলে বাংলার রাজ্যপাল উইলিয়ম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে এক বৃহৎ জনসমাবেশে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিনা তারে শব্দ প্রেরণের পরীক্ষা দেখিয়েছিলেন। তিনি সামনে রেখেছিলেন কতকগুলি যন্ত্রপাতি। এক সময় একটি যন্ত্র থেকে তিনি উৎপন্ন করলেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। সেই যন্ত্র-উৎপন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ৭৫ ফিট দূরে অন্য ঘরে রাখা একটি ঘণ্টা বাজিয়ে দিল ও পিস্তলে আওয়াজ তুললো। জগদীশচন্দ্র যদিও এই কৌশল সর্বপ্রথম প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু বেতার আবিষ্কর্তার স্বীকৃতি লাভ করেন ইতালীর বিজ্ঞানী মার্কনি। কারণ ১৯০১ সালে তিনি একই পদ্ধতিতে বেতার টেলিগ্রামের সংকেতের মাধ্যমে আটলান্টিক মহাসাগরের দুই প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা হচ্ছে জৈব ও জড় পদার্থ সংক্রান্ত। জড় পদার্থও যে উত্তেজনায় ও বিদ্যুৎস্পর্শে সাড়া দেয় তা তিনিই প্রথম প্রচার করেন। তাঁর এই আবিষ্কার বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি নানা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন ধাতুখণ্ড, উদ্ভিদ বা প্রাণীর পেশীকে যে কোন প্রকারে উত্তেজিত করা হোক না কেন, তাদের ভেতর থেকে একই ধরনের সাড়া পাওয়া যায়। কেউ কেউ মনে করেন, মানুষের স্মৃতিশক্তির যান্ত্রিক প্রতিরূপ তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন। পরবর্তীকালে রেডার, কমপিউটার ইত্যাদি যন্ত্র আবিষ্কারের প্রাথমিক ভিত্তি হলো জগদীশচন্দ্র উদ্ভাবিত মানুষের স্মৃতিশক্তির যান্ত্রিক প্রতিরূপ।

জগদীশ চন্দ্রের তৃতীয় পর্যায়ের গবেষণা হচ্ছে উদ্ভিদ সংক্রান্ত। এই পর্যায়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 'ক্রেস্-কো-গ্রাফ' বা কুঞ্চনমান যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্মতম সঞ্চালনকে বহুগুণ বিবর্ধিত অবস্থায় দেখা যায়। লজ্জাবতী লতা ও প্রাণীদেহ নিয়ে জগদীশচন্দ্র একটা তুলনামূলক পরীক্ষা করেছিলেন। লজ্জাবতী লতার শাখায় বৈদ্যুতিক শক দিলে গাছটির দূরবর্তী গ্রন্থিসমূহে কুঞ্চন ঘটে। তিনি যন্ত্রের সাহায্যে দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে আধুনিক ভারতে রসায়নবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। সত্যই তিনি তা-ই ছিলেন। রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'মারকিউরাস নাইট্রেট' নামে একটি যৌগিক পদার্থের আবিষ্কার। পারদের সঙ্গে লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে হলুদ রঙের এই যৌগিক পদার্থটি উৎপন্ন হয়। এই পদার্থটিকে বাংলায় বলা হয় রস সিন্দুর। তাঁর আবিষ্কারের আগে এর পরিচয় অজ্ঞাত ছিল, বর্তমানে পারদের অন্যান্য যৌগের সঙ্গে এই পদার্থটিও যুক্ত হয়েছে। রসায়নশাস্ত্রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আর একটি বড় অবদান 'হিন্দু রসায়নবিদ্যার ইতিহাস' রচনা। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞানজগতের কাছে তুলে ধরেছিলেন, প্রাচীন কালে রসায়ন বিজ্ঞানেও ভারত কত উন্নত ছিল।

এদেশে রসায়ন শিল্পের জনকও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধির জন্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যে একান্ত প্রয়োজন তার পথ তিনি প্রদর্শন করেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠা করে। মাত্র ৭০০ টাকার মূলধন সংগ্রহ করে তিনি এই রাসায়নিক কারখানা স্থাপন করেছিলেন, আজ তা এক সুবৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

শ্রীনিবাস রামানুজন

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের মতো গণিতবিদ্যাতেও ভারতীয়েরা যে অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন আধুনিক বিজ্ঞানজগতে তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হচ্ছেন শ্রীনিবাস রামানুজন। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজের এক দরিদ্র পরিবারের এই সন্তান কেবলমাত্র নিজের প্রতিভার বলে অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে কিভাবে বিশ্বখ্যাতির আলোকতোরণে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সে এক বিস্ময়কর কাহিনী! ছোটবেলা থেকেই

গণিতের প্রতি এক অসাধারণ অনুরাগ ছিল রামানুজনের। ছাত্রাবস্থায় অন্যান্য বিষয় ছেড়ে শুধু গণিতচর্চায় তিনি মেতে থাকতেন সব সময়। ফলে ইংলিশে কম নম্বর পাওয়ায় এফ এ (বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন নি এবং এই সঙ্গে তাঁর পড়াশোনারও ইতি।

অফিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের গণিতচর্চায় মনপ্রাণ তিনি ঢেলে দেন, খাতায় পাতার পর পাতায় লিখে যান নিজস্ব গবেষণার ফসল। গণিত-বিশেষজ্ঞ উপরিওয়ালাকে সে খাতা দেখান মূল্যায়ণের জন্যে। তিনি রামানুজনের কাজের গুরুত্ব যথাযথ উপলব্ধি করতে না পেরে উপদেশ দেন, কেম্ব্রিজের প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক জি এইচ হার্ডির কাছে তাঁর খাতা পাঠাতে। সেই অনুযায়ী রামানুজন তাঁর গণিতচর্চার খাতা তুটি পাঠিয়ে দেন অধ্যাপক হার্ডির কাছে। গণিত-চর্চায় রামানুজনের অনন্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে হার্ডি স্তম্ভিত হয়ে যান।

নানা বাধা অসুবিধা অতিক্রম করে হার্ডি কেম্ব্রিজে রামানুজনকে আনতে সমর্থ হলেন। শুরু হলো এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। রামানুজনের অনন্য গণিতপ্রতিভার স্বীকৃতিতে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করলেন। অল্পদিনের ব্যবধানে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজও তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করলেন। রামানুজন কখনও উচ্চ গণিতের পাঠ গ্রহণ করেন নি, অথচ জটিল গণিত বিষয়, বিশেষত সংখ্যাতত্ত্বে (Theory of Numbers) তিনি যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তা আজও বিজ্ঞানজগতে এক পরম বিস্ময় হয়ে আছে।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন

১৯৩০ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন নোবেল পুরস্কার অর্জন করে প্রমাণ করলেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয়েরা আপাঙ্‌ক্তেয় নয়, পরন্তু তাঁদের অন্যান্য মৌল গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানজগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারেন।

বিজ্ঞানে যে অনন্য আবিষ্কারের জন্যে রামন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, সেটি বিজ্ঞানজগতে 'রামন প্রতিক্রিয়া' (Raman Effect) নামে সুপরিচিত। এই প্রতিক্রিয়ার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, কোনো বস্তুর অণুতে যদি আলোর সংঘাত হয়, তাহলে আলোর কম্পনসংখ্যা হয় বৃদ্ধি পাবে, নয়ত হ্রাস পাবে। ফলে ঘটবে আলোর বিকিরণ। আমরা জানি, কোনো বস্তুর উপর আলো পড়লে বস্তুর দ্বারা আলো

শোষিত ও বিকিরিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রামনের আবিষ্কারের মূল কথা হলো, যখন কোনো বস্তুর অণুর মধ্যে পরমাণুগুলো বাঁধা পড়ে, তখন তার মধ্যে এক ধরনের কম্পন সৃষ্টি হয়। আবার আমরা জানি, বস্তুপিণ্ডের অণুগুলো বিভিন্ন শক্তিস্তরে থাকতে পারে। ভূমিস্তরে অবস্থিত অণু বাইরের শক্তি শোষণ করে নেয় এবং উর্ধ্ব-স্তরে উত্তেজিত হয়। পরে উর্ধ্বস্তর থেকে আবার ফিরে আসে নিম্নস্তরে। সূর্যের আলোও একরকম শক্তি। তাই সূর্যরশ্মি কোনো কোনো বস্তুর উপর পড়লে সূর্য-রশ্মির সাত রঙের কোনো কোনোটি শোষিত হয় ও বিকিরিত হয়। তাই কোনোটিকে আমরা দেখি লাল, কোনোটিকে নীল, কোনোটিকে বা সবুজ। গোধূলির আকাশে আমরা যে রঙের খেলা দেখি, তা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে ভাসমান অসংখ্য ধুলোরাশি ও জলকণা থেকে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত সূর্যের আলো।

রামনের আবিষ্কারের ফলে অণুরাজ্যের বহু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিশেষত আলোর তরঙ্গতত্ত্ব, বিকিরণ ধর্ম ও তাপগতিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়। রামন প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আজ পর্যন্ত তিন হাজারেরও বেশি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে।

মেঘনাদ সাহা

১৯১৯ সালে তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এক যুগান্তকর আবিষ্কার করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁর এই আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে সাহার 'তাপ আয়নন তত্ত্ব' (Theory of Thermal Ionisation) নামে সুপ্রসিদ্ধ। অনাদি অতীত থেকে সূর্য তাপ ও আলোক বিকিরণ করে আসছে এবং আজও তা অব্যাহত আছে। সূর্যের এই অফুরান তেজের উৎস কি? নানা গবেষণার ফলে আজ জানা গেছে, সূর্যদেহে সব সময় চলছে পারমাণবিক বিস্ফোরণ। সূর্য দেহের হাইড্রোজেন গ্যাস প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড তাপে হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছে বলেই এই বিস্ফোরণ এবং এই রূপান্তরের ফলে উৎপন্ন হচ্ছে অফুরন্ত তেজ।

সূর্যদেহ থেকে যদি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা হলে পৃথিবী যে উপাদানে তৈরি সূর্য দেহেও সেসব উপাদান অবশ্যই থাকবে। ডঃ সাহা বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিলেন, পার্থিব সব উপাদানগুলিই রয়েছে সূর্য দেহে, তবে পরিমাণ অতি সামান্য। তিনি হিসেব করে

দেখলেন, সূর্য দেহের প্রতি ১০০ ভাগের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ ৮১.৭ ভাগের মতো। বাকি ১৮.১৭ ভাগ হিলিয়াম, ০.০৭ ভাগ কারবন। অবশিষ্ট ০.০৬ ভাগ নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, লোহা, নিকেল, দস্তা, সীসা, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি পার্থিব উপাদানের গ্যাস। পরীক্ষার সাহায্যে তিনি আরও প্রমাণ করলেন, শুধু সূর্য নয়, যে কোনো নক্ষত্রপৃষ্ঠে এই ধরনের তাপ সম্ভব এবং সেখানে সব কটি মৌলিক পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। নক্ষত্ররা যে আলো পাঠায়, সে আলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে তার উপাদানগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। ডঃ সাহার আবিষ্কারের ফলে এই রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সেরা ১০টি আবিষ্কারের মধ্যে মেঘনাদ সাহার আবিষ্কারকে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে সমুচ্চারিত হয়ে থাকে। এই সমুচ্চারণের পশ্চাতে আছে সত্যেন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত এক অনন্য সংখ্যায়ন বিধি, যার অভিনবত্বে ও গুরুত্বে আইনস্টাইন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং এই বিধি প্রয়োগ করেন বিস্তৃত ক্ষেত্রে। এই সংখ্যায়ন বিধি বিজ্ঞান জগতে 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' নামে সুপরিচিত। আজকের দিনে অবশ্য এই সংখ্যায়ন শুধু 'বোস সংখ্যায়ন' নামেই উল্লেখিত হয়ে থাকে। ১৯২৪ সালের কথা। তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ 'প্লাঙ্কের সূত্র ও আলোক কোয়ান্টাম' প্রবন্ধ শিরোনামায় তাঁর চার পাতার এই গবেষণাপত্র আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চান। আইনস্টাইন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্রটি নিজেই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞান-পত্রিকা 'ৎসাইটশ্রিফট ফ্যুর ফিজিকস'-এ প্রকাশ করতে দেন। শুধু তাই নয়, এই গবেষণাপত্রের পাঠ টীকায় নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে জানালেন: 'বোস যেভাবে প্লাঙ্কের সূত্র উপস্থাপিত করেছেন তা আমার মতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি এখানে যে পন্থা প্রয়োগ করেছেন তার সাহায্যে একটি আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টামবাদ পাওয়া যেতে পারে, এটা আমি অন্যত্র দেখাব।'

প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত বিকিরণ সূত্রে আলোক কোয়ান্টা বা ফোটন (আলোক কণা) -কে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের শক্তি কোয়ান্টা (শক্তি গুচ্ছ) হিসাবেই গণ্য করেছিলেন।

কিন্তু বোস আলোক কোয়াণ্টাকে বস্তুকণার সমতুল্য গণ্য করে অগ্রসর হলেন। অর্থাৎ আলোক কণার তরঙ্গ চরিত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কণা চরিত্রের ভিত্তিতে তিনি প্লাঙ্ক সূত্রকে উপস্থাপিত করলেন। প্লাঙ্ক সূত্রকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি এটিকে সংখ্যায়নিক সমস্যা হিসাবে সমাধান করলেন।

তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে বোসের এই তত্ত্ব বিজ্ঞান জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে এবং তাঁর তত্ত্বের ভিত্তিতে গবেষণা করে কয়েকজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় সত্যেন্দ্রনাথের কাজের গুরুত্ব কতখানি।

কিন্তু এইভাবে সমাধান করতে গিয়ে বোসকে এক নতুন গণনা পদ্ধতির সাহায্য নিতে হলো। তৎকালে বস্তুকণার দ্বারা গঠিত গ্যাসের আচরণ ব্যাখ্যায় যে ধরনের সংখ্যায়নিক বিধি প্রয়োগ করা হত, তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পন্থায় তিনি অগ্রসর হলেন। তিনি ধরে নিলেন যে, ফোটন সমষ্টির মধ্যে এক ফোটনকে অপর এক ফোটন থেকে পৃথক ভাবা যাবে না। কিন্তু তৎকালে প্রচলিত সংখ্যায়নিক গতিবিদ্যার সূত্রানুসারে ভাবা হত, প্রতি ফোটন পৃথক। বোস পৃথক রাস্তায় গিয়ে ভরহীন আলোক কোয়াণ্টাকে সাধারণ ভরসম্পন্ন বস্তু কণার মতো প্রয়োগ করলেন তাঁর গবেষণায়। এই ভাবেই তিনি নতুন করে আবিষ্কার করলেন প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্র।

বোসের এই সংখ্যায়ন বিধি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বোসের প্রবর্তিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়ে ১৯২৬ সালে ফের্মি এবং ডিরাক বস্তু সমাবেশের ক্ষেত্রে আর একটি সংখ্যায়ন গড়ে তোলেন, যা 'ফের্মি ডিরাক সংখ্যায়ন', বা শুধু 'ফের্মি সংখ্যায়ন' নামে সুপরিচিত।

মৌলকণার ক্ষেত্রে এই বোস সংখ্যায়ন ও ফের্মি সংখ্যায়ন-এর গুরুত্ব অপরিসীম। যে সব মৌলকণা বোস সংখ্যায়ন বিধি মেনে চলে তাদের বলা হয় 'বোসন'। আর যে সব মৌল কণা ফের্মি সংখ্যায়নের অনুগামী, তাদের বলে 'ফের্মিয়ন'। বর্তমানে মৌল পদার্থ বিজ্ঞান এই দুটি প্রধান স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ভবিষ্যতে যে কোনো মৌলকণা আবিষ্কৃত হোক না কেন, তাদের এই দুটি সংখ্যায়ন বিধির একটিকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

আধুনিক কালে বোস সংখ্যায়নের প্রয়োগ ক্ষেত্র আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং বোসের গবেষণার গুরুত্ব আরও বিশেষ ভাবে অনুভূত হচ্ছে।

বিদ্যালয় পর্যায়ে জীবন বিজ্ঞান

ডঃ তারকমোহন দাস

আজ প্রায় ছয় বছর হল আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জীবনবিজ্ঞানকে একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয়রূপে স্কুলের মাধ্যমিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোন একটি নূতন বিষয় যখন প্রবর্তন করা হয় তখন ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণের মনে তিনটি প্রশ্ন ওঠে, তা হল বিষয়টি কি ?—অর্থাৎ জীবন বিজ্ঞান বলতে ঠিক কি বোঝায় ? ঐ বিষয়টি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য কি ?—তাতে ছাত্রছাত্রী ও সমাজের কি উপকার হবে ? এবং কারা ঐ বিষয়টি পড়বে ? আমার মতে সংক্ষেপে জীবন বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—যে বিজ্ঞানে জীবাণু থেকে মানুষ পর্যন্ত সকল জীবের মূল প্রকৃতি, আকার, জীবনক্রিয়া, পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক, পরস্পর নির্ভরতা, স্থায়িত্ব, স্বাভাবিক বিকাশ ও বিবর্তনের মূল সূত্রগুলি প্রধানতঃ আলোচিত হয় তা হল জীবনবিজ্ঞান। এই সজ্ঞার তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল বিভিন্ন জীবের মূল প্রকৃতি ও জীবন ক্রিয়ার মধ্যে যে অর্থবহ ঐক্য রয়েছে তা বোঝা পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জানা, পৃথিবীতে কোনো জীবই একলা বাস করে না, একের অস্তিত্ব অন্যের ওপর নির্ভরশীল, এই পরস্পর নির্ভরশীলতার প্রকৃত মূল্য বোঝা পরিবেশের সম্পদগুলি সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবন কিভাবে কোটি কোটি বছর টিকে আছে তা বোঝা, পৃথিবীতে আমাদের স্থায়িত্ব লাভের জন্য ঐ সম্পদগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা শেখা, সেই সঙ্গে বংশগতি ও বিবর্তনের মূল সূত্রগুলি জানা। কিন্তু এই জানা, বোঝা ও শেখার বিষয়গুলি এমন হবে যা আমাদের জীবনে কাজে লাগে।

জীবন বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যায়—একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন বৃত্তি অবলম্বন করে পৃথিবীতে বাস করতে হলে জীবনের কতকগুলি মূল বিষয় সম্পর্কে তার অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যেমন আমাদের জীবনের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক, পরিবেশের সম্পদগুলি কিভাবে আমরা ব্যবহার করছি ? পৃথিবীর জল, বায়ু,

মাটি, জীবাণু, উদ্ভিদ ও পশু-পাখিরা কি ভাবে আমাদের জীবন ধারণে সাহায্য করছে? পৃথিবীতে জীবনযাপনের বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?—আমরা তা ঠিকমত পালন করছি কি, না? এগুলি আমাদের সকলেরই জানা দরকার। জীবন সম্পর্কে আমাদের এই প্রাথমিক জ্ঞানের অভাবের জন্যই আমরা যেখানে বাস করি সেখানকার উপাদানগুলি ঠিকমত চিনতে পারি না,—মূল্য বুঝতে পারি না,—তাদের সঠিক ব্যবহারেও সক্ষম হই না,—তার ফলে আমরা যে কাজই করি না কেন তা সঠিক পথ ধরে এগোয় না,—যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে কল্যাণকর, পৃথিবীতে জীবনের সমৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। জীবন সম্পর্কে আমাদের এই অংশ প্রয়োজনীয়, ন্যূনতম বিজ্ঞান সম্মত বাস্তব জ্ঞানের অভাব পূরণের জন্যই জীবনবিজ্ঞানকে একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসাবে প্রবর্তন করা হয়েছে।

আগে প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা পড়ান শুরু হত ইণ্টার মিডিয়েট বা বি. এস. সি. স্তর থেকে। আগেকার এই প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা পড়ানোর মূল লক্ষ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব বা শরীরতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ করা। সুতরাং ঐসব কোর্সে জটিলতা ছিল, গভীরতাও ছিল। আমরা কোন ক্রমেই সেই ইণ্টার মিডিয়েট বা বি. এস. সির. কোর্সকে কনডেন্স করে মাধ্যমিক স্তরে টেনে ১০-১১ বছরের ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে যাব না। কিছু শরীরতত্ত্ববিদ তৈরী করা আমাদের মূল লক্ষ্য নয়, বিশেষজ্ঞ তৈরির এটা প্রাথমিক কোর্সও নয়। সেটা সুরু হবে বি. এস. সি. পর্যায় থেকে, সুতরাং, ঐ সব কোর্সের অন্তর্গত জটিল নানারকম তত্ত্ব ও তথ্য বিস্তারিত ভাবে শিক্ষা দিয়ে শিশুদের মন ভারাক্রান্ত করে তুললে জীবন বিজ্ঞানের যা মূল উদ্দেশ্য তা-ই সিদ্ধ হবে না। জীবন বিজ্ঞানে তাই উদ্ভিদবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা এবং শরীর বিদ্যা আলাদা ভাবে স্থান পায় নি, ছাত্রছাত্রীরা যাতে জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জীবন বিজ্ঞান যখন দেশের সর্ব সাধারণের জন্য, তখন জীবন বিজ্ঞান যতদূর সম্ভব সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় ভাবে শেখাতে হবে এবং এমন কিছু শেখান উচিত নয় যা অত্যন্ত জটিল, দুর্বোধ্য ও অসংলগ্ন এবং আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে যার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই।

জীবন বিজ্ঞানের যে পাঠক্রম রচিত হয়েছে তার মূল কাঠামোটি রচিত হয়েছে,

—ক্লাশ সিক্স-এর পাঠক্রমে পরিবেশ বলতে কি বোঝায়, কি করে পরিবেশের প্রতিটি বস্তু খুঁটিয়ে দেখতে হয় তা শেখা,— যেমন দূর থেকে দেখে কোন বস্তুর সঠিক পরিমাপ, দূরত্ব ও আয়তন সম্পর্কে ধারণা করা, হাতে করে তুলে কোন বস্তুর ওজন বলার ক্ষমতা লাভ করা। ক্লাশ সেভেন-এ পরিবেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে সমাজ ও জীবনের সম্পর্ক জানা। ক্লাশ এইট-এ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকার ও আভ্যন্তরাণ গঠন জানা (এটি আমার ঠিক মনঃপুত হয়নি)। ক্লাশ নাইন ও টেন-এ জীবনের মূল বিক্রিয়াগুলির তাৎপর্য জানা এবং সেই সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক, জীবনের বিবর্তন ও স্থায়িত্বলাভের মূল সূত্রগুলি জানা, ইত্যাদি।

এই পাঠক্রমের ওপর নির্ভর করে অনায়াসে অনেক বই লেখা যায় যা পেলে ঐ বয়সের ছেলেমেয়েরা খুসীতে ভরপুর হয়ে উঠবে, তাদের ভাবনা ও চিন্তার জগৎ উদ্বেল হয়ে উঠবে নূতন কিছু জানার আনন্দে। কিন্তু সেই পথে যে প্রধান তিনটি বাধা আজ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, তার প্রথমটি হল স্বল্প পরিসরের মধ্যে মাত্র এক'শ সোয়া'শ পাতার মধ্যে বিষয়টি ছেলেমেয়েদের মনের মত করে তুলে ধরা শক্ত। দ্বিতীয়তঃ—জীবন বিজ্ঞান কি, কেন এবং কাদের জন্য ?—এই তিনটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর জীবন বিজ্ঞানের বই ও পঠন-পাঠনের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তৃতীয়তঃ গত কয়েক বছর ধরে জীবন বিজ্ঞানের প্রশ্নও আগেকার বায়ালজির মত হচ্ছে, অনাবশ্যক জটিল প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নও আসছে,—তার ফলে শিক্ষক ও ছাত্রমহলে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, এর ক্ষতিকর প্রভাব জীবন বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন পদ্ধতির ওপর পড়তে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত সিলেবাসের প্রথম পৃষ্ঠায় জীবন বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা লেখা আছে তা যদি ঠিকমত অনুসরণ করা হয় তাহলে এই সব অসুবিধা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবার কথা নয়। জীবন বিজ্ঞানের প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনকার জীবন ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সেই সম্পর্কটি যথাযথ ভাবে স্থাপনের মধ্যেই জীবন বিজ্ঞানের সার্থকতা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে,—এই একটি মাত্র কথা যদি আমরা ঠিক মত বুঝতে পারি তাহলে অবশিষ্ট কাজ আপনা থেকেই সহজ হয়ে আসবে।

যে গাছে বিষ আছে

পবিত্রানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়

গাছে বিষ! কথাটা শুনে অনেকই তোমরা অবাক হবে, জানি। কিন্তু সবার আমরা মহাবালেশ্বরে যে অভিজ্ঞতা পেলাম, কি বলবো তোমাদের, আমরা নিজেরাও কি কম ঘাবড়ে গিয়েছিলাম?

মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত শৈলাবাস মহাবালেশ্বর। ছবির মতো সাজানো। নাম না জানা অসংখ্য গাছপালা ও ফুলের গাছ। আমাদের সঙ্গে কোলকাতার কয়েকজন জীব বিজ্ঞানীও ছিলেন। হঠাৎ হাঁটতে হাঁটতে আমাদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হাঁচি, মাথার যন্ত্রণা, কিছুক্ষণ পরে বমি আর তার পর দেখা দিল শ্বাস কষ্ট। আমরা সকলেই ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে ডাক্তার ডাকা হোল। ডাক্তার উপসর্গগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন কিন্তু রোগের সঠিক কারণ খুঁজে পেলেন না, অবশ্য তার ঔষধে আমাদের সঙ্গীটি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলো। আমাদের সঙ্গে যে জীববিজ্ঞানী ছিলেন তিনি যখন সব ঘটনা শুনলেন তাঁকে বেশ চিন্তিত মনে হোল। অনেকক্ষণ পরে তিনি বলে উঠলেন না—এর মধ্যে ব্যাপার আছে, এর রহস্য খুঁজে বার করতেই হবে।
হল কাল তিনি আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবেন।

পরের দিন আমরা সেই পথ দিয়ে আবার বেড়াতে বেরোলাম, যে পথ দিয়ে আগের দিন হেঁটেছিলাম। আমাদের সঙ্গী জীববিজ্ঞানী আমাদের সঙ্গে চলেছেন, তার দৃষ্টি কখনও সামনে কখন বা রাস্তাধারের গাছপালার ওপর। মাঝে মাঝে তিনি রাস্তার ধারে ঝুঁকে পড়া গাছের কাছে চলে গিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করছেন, ফলে মাঝে মাঝে তিনি পেছিয়ে পড়ছিলেন হঠাৎ আমাদের সঙ্গী বিজ্ঞানী চিৎকার করে উঠলেন। পেয়েছি পেয়েছি। আমরা সবাই ছুটে গেলাম তার কাছে, কি পেয়েছেন তিনি? হ্যাঁ এই সেই বিষাক্ত গাছ যার কাণ্ড, পাতা ও ফুলে বিষ ছড়িয়ে

আছে। আমাদের তখন ভীষণ কৌতূহল, কোন গাছের, কিরকম বিষ, আমরা হুড়মুড় করে সেই গাছের কাছে চলে গেলাম। তিনি আমাদের সজোরে দূরে সরিয়ে দিলেন, কাছে গেলেই বিপদ। ব্যাপারটা যা বললেন তাহ'ল এই রকম।

এই বিষাক্ত গাছের নাম রোডোডেনড্রন। সমস্ত গাছ জুড়ে ফুল ফুটে আছে, ফুলগুলি অতীব সুন্দর সকলেরই মন আকৃষ্ট করে। প্রজাতি অনুসারে এদের ফুল লাল, বেগুনে, হলদে অথবা সাদা হতে পারে। এই গাছ পাহাড়ের বনে জঙ্গলে ও রাস্তার ধারে জন্মায়। এই গাছের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থাকলেই বিপদ, অনেক সময় এদের ফুলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ফুল তুলতে গেলে আরও বিপদ ঘনিয়ে আসে। শুরু হয়ে যায় বিষক্রিয়া। এই গাছের মধ্যেই রয়েছে একরকম বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ যার নাম এ্যানড্রোমেডোটক্সিন, এটি আমাদের স্নায়ুকে অবশ করে পক্ষাঘাত সৃষ্টি করে এবং হৃৎপিণ্ডের ওপরও সরাসরি বিষক্রিয়া করতে পারে তারপর আস্তে আস্তে শ্বাসযন্ত্র রুদ্ধ করে মৃত্যু ঘটায়। এই গাছের পাতার মধ্যে রয়েছে এরিন নামে একটি রাসায়নিক যৌগ যার ফলে পাহাড়ে রাস্তার ধারে এই গাছের বনের পাশ দিয়ে হাঁটলে বিপদ ঘটায়, শুরু হয়ে যায় বিষক্রিয়া। প্রথমে হাঁচি শুরু হয় প্রচণ্ড ভাবে তারপর মাথার যন্ত্রণা, আস্তে আস্তে অবসাদ আনে।

শুধু পাহাড় পর্বতে নয় শুনলে অবাক হবে এরকম বিষাক্ত গাছ গাছরা তোমাদের ঘরের পাশেই হয়ত রয়েছে এরা অনেক সময় ভীষণ অসুখ-বিসুখ বাধায় একথা তোমরা জান না। আমরাও জানতাম না, সে অভিজ্ঞতা হলো আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে। জায়গাটা কোলকাতা থেকে খুব কাছেই নাম রাজীবপুর। ঠিক হল বন্ধুর বাড়িতে সেদিন থেকে পরের দিন ফিরে আসবো। কিন্তু বাধ সাধলো, দুপুর বেলা থেকেই শুরু হল জ্বর, সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, নাক দিয়ে জল গড়াতে আরম্ভ করলো। বিকেল বেলাতেই কোলকাতায় ফিরে এলাম। ডাক্তার বললেন ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে। ঘটনাটা শুনে আমাদের বন্ধু জীব বিজ্ঞানী বললেন সামনের রবিবারই তিনি সেখানে যাবেন। আমরা আবার গেলাম তাঁকে সঙ্গে নিয়ে।

রাজীবপুরের সেই বন্ধুর বাড়িতে সুন্দর একটা ফুলবাগান ছিল। সুতরাং বাগানে অনেক রকমের গোলাপ, বিভিন্ন রঙের জবা আর সবচেয়ে দেখবার মত ছিল বিভিন্ন রকমের করবী গাছ। এদের কারও ফুল লাল কারও বা সাদা। বাগানের পাশ

দিয়েই রাস্তা, ঐ রাস্তার দুধারে ছোটবড় অনেক রকম গাছ ছিল। বন্ধু জীববিজ্ঞানী রাস্তা থেকে হাতে করে গাছটা তুলে এনে দেখালেন—এর নাম ডটুরা মেটেল, বাংলায় একে ধুতরো ফুল বলে। এটি সাংঘাতিক একটি বিষাক্ত গাছ। বিষ ছড়িয়ে আছে গাছের কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলে। এ গাছের বিষের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে স্কোপোনেমিন নামে একরকম রাসায়নিক যৌগ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন এদের ফুল ফোটে তখন হয় আরও বিপদ। এই ফুলের পরাগ বাতাসে ছড়িয়ে যায় আর শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের নাকে ও মুখে ঢুকে যায় ফলে শুরু হয় বিষক্রিয়া। এই বিষক্রিয়ার লক্ষণ সাধারণত সর্দি, মাথাধরা এবং তারপর ব্রঙ্কাইটিসের মত মনে হয়। এই গাছের পরাগেও রয়েছে বিষ। এই গাছ সাধারণত রাস্তার ধারে হয়ে থাকে। এরা গুল্ম জাতীয়, লম্বা তিন চার ফুট হয়। এদের ফুল সাদা রঙের, আকৃতি বেশ বড়, সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ আছে। ফুলের আকৃতি ফানেলের মতন, ছোট বোঁটা আছে। এদের বৃতি নলের মতন, পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। ফুলের পাপড়ি পাঁচটা জোড়া অবস্থায় থাকে। পুংকেশর পাঁচটা, পাপড়ির সঙ্গে গোড়ায় যুক্ত, পরাগধানি খুব বড় ও লম্বা হয়, এগুলি লম্বালম্বিভাবে ফেটে গিয়ে বাতাসে পরাগ ছড়ায়। গর্ভমুণ্ড দুটি খণ্ডে বিভক্ত। এদের ফলকে ক্যাপস্যুল বলে। গায়ে কাঁটা আছে।

ডটুরা মেটেল

এ গাছ ছাড়া বাগানে করবী গাছটাও কি কম বিষাক্ত? এ গাছের ফুলগুলো অতীব সুন্দর কিন্তু গোটা গাছটাই বিষাক্ত। এই গাছ ছাগল গরুতেও খায় না। এ গাছে নেরিওডরিন ও করবিন নামে দুটি বিষাক্ত পদার্থ আছে এরা আমাদের শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের অবসাদ আনে আর সেই সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের কাজেরও ব্যাঘাত ঘটায় ফলে সাংঘাতিক বিপদ ডেকে আনতে পারে। এছাড়া গ্রামের রাস্তাঘাটে আর

একশ্রেণীর গাছ দেখতে পাবে, এদের নাম বেড়াকল্মি। সাধারণতঃ বেড়া তৈরি করতে এই গাছ অনেকে ব্যবহার করে। এ গাছও বিষাক্ত। এদের ফুল থেকে পরাগ বাতাসে ভেসে বেড়ায় আর তা থেকে ঘটে বিপত্তি। এ গাছের পরাগ বিষাক্ত। নাক মুখ দিয়ে ঢুকে সৃষ্টি করে জ্বর, গা ব্যথা এবং সর্দি। এ গাছের বৈজ্ঞানিক নাম আইপোমিয়া ফিসটুলসা। এরা গুল্ম শ্রেণীর উদ্ভিদ। সারা ভারতবর্ষে এ গাছ জন্মায়। গাছগুলি লম্বায় পাঁচ-ছ ফুট হয়, গাছে পাতা সাজানোর পদ্ধতিটি এখানে একান্তর। ফুল বেশ বড় হয়, সাধারণত সাদা থেকে বেগুনে রঙের। এদের পুষ্প-বিন্যাস নিয়ত। বৃতি পাঁচটা থাকে, পাপড়িও পাঁচটা তবে সবগুলি এক সঙ্গে যুক্ত বলে ফুলের আকৃতি অনেকটা ফানেলের মত হয়। পুংকেশর ও পাঁচটা, গর্ভকেশর একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত পাওয়া যায়। এ গাছকে চিনে রেখো।

বিজ্ঞানের ছড়া

কমল চক্রবর্তী

প্রশমন

অম্ল আর ক্ষার
করে মুখ ভার
করে মারামারি
ধর্ম দেয় ছাড়ি ;
লবণ ও জল আসে
কেউ না থাকে পাশে,
ধরে নাম প্রশমণ
করে ক্রিয়া আমরণ।

সমযোজ্যতা

তোমার অভাব, আমার অভাব
এসো, মিলি করি ভাব—
দেবো তোমায় করিতে ভোগ।

ভালবেসে তুমিও দেবে
ইলেকট্রনে ভাগও বসাবে
থাকবে না কারো অনুযোগ।

শব্দ-কূট

শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী

নিচের যন্ত্রগুলির আবিষ্কারকদের নাম উপযুক্ত ঘরে বসিয়ে শব্দ-কূটটি সমাধান কর—

পাশাপাশি ঘরসংখ্যা

1. দূরবীক্ষণ যন্ত্র, (4)
2. মিলিটারি ট্যাঙ্ক, (5)
3. টর্পেডো, (6)
4. অণুবীক্ষণ যন্ত্র, (4)
5. মোটর সাইকেল, (4)
6. রেডিও, (3)
7. বেলুন, (5)
8. এক্স-রে, (4)
9. লিনোটাইপ, (7)
10. টেলিগ্রাফ, (3)
11. ফাউনটেন পেন, (6)
12. টেলিভিসান, (7)
13. স্টেথোস্কোপ, (3)
14. টেলিফোন, (5)
15. স্টীমার, (4)
16. রেল ইঞ্জিন, (5)

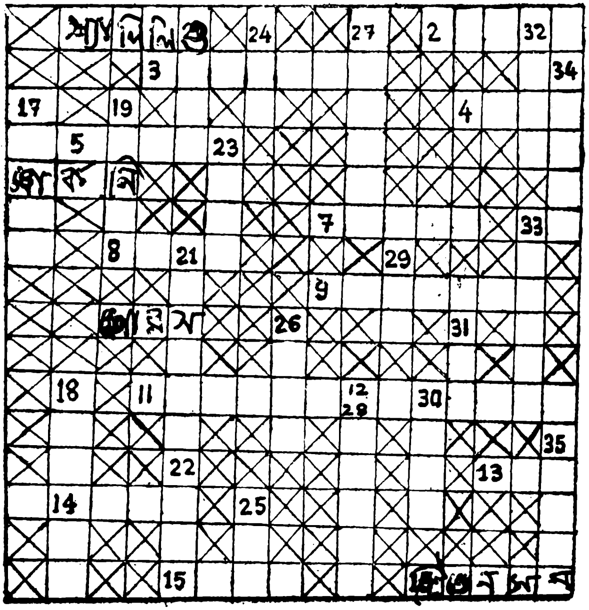

শব্দ-কূট

উপর নিচে ঘরসংখ্যা

17. ইক্‌মিক্ কুকার, (5)
18. থার্মোমিটার, (6)
19. সেলাইকল, (5)
20. দিয়াশলাই, (4)
21. বাষ্পীয় ইঞ্জিন, (6)
22. পিস্তল, (3)
23. হার্মোনিয়াম, (4)
24. মেসিনগান, (3)
25. এরোপ্লেন, (দুইভাই) (3)
26. ফটোগ্রাফ, (কালার) (4)
27. ছাপার হরফ, (6)
28. ফ্রেস্কোগ্রাফ, (6)
29. ডিজেল ইঞ্জিন, (3)
30. সবচেয়ে বেশি যন্ত্রের আবিষ্কর্তা (সিনেমাসহ) (4)
31. ডিনামাইট, (3)
32. ব্যারোমিটার, (4)
33. হেলিকপ্টার, (5)
34. সাবমেরিন, (5)
35. বাই-সাইকেল, (5)

শব্দ-কূটের সমাধান

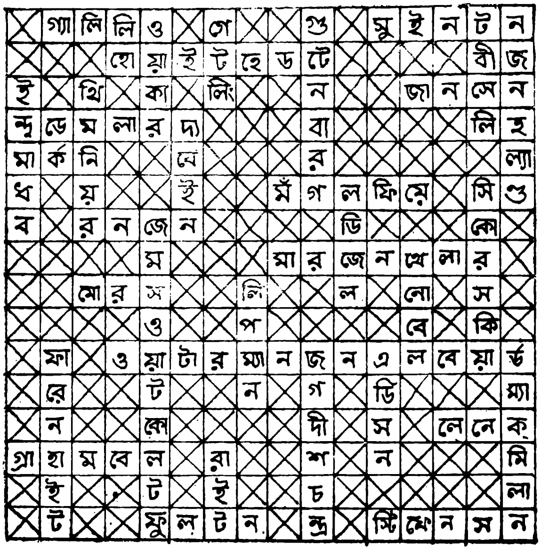

সংখ্যাকূট

শ্রীঅসিত কুমার চক্রবর্তী

নিচের ইঙ্গিত অনুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যা বসিয়ে সংখ্যা-কূট'টি সমাধান কর :

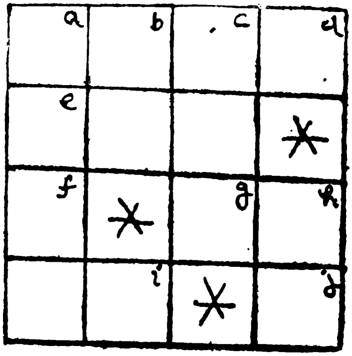

পাশাপাশি

a—ম্যাক্স প্লাংক যে খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান ; e—এক বর্গমাইলে যত 'একর' হয় ; f—মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহ সংখ্যা ; g—লেড-এর পারমাণবিক সংখ্যা ; i—জলের ঘনত্ব সর্বোচ্চ হয় যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়।

উপর থেকে নিচে

a—লেড-এর স্ফুটনাঙ্ক যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ;

b—প্লুটোনিয়াম-এর পারমাণবিক সংখ্যা ;

c—এযাবৎ আবিষ্কৃত মোট মৌলের সংখ্যা ;

d—অসমিয়াম-এর যোজ্যতা ;

h—এক 'দিনরাত্রি'তে যত ঘণ্টা হয় ;

i—শনিগ্রহের বলয় সংখ্যা।

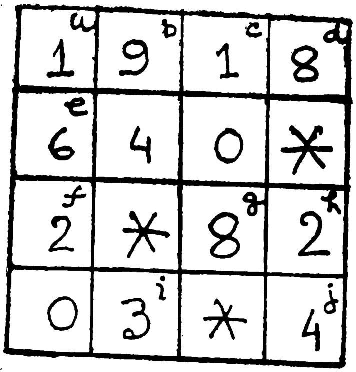

যে মেশিন ভাবতে পারে

অদ্রীশ বর্ধন

'তুমি কি সত্যি সত্যিই মনে কর যে তোমার আমার মতই মেশিনও মাথা খেলাতে পারে, ভাবতে পারে, সমস্যার সমাধান করতে পারে?'

কল্যাণাক্ষ তখুনি কোন উত্তর দিলে না। টেবিলের ওপর বিভিন্ন কায়দায় সাজাতে লাগল তাসগুলো। প্রশ্ন করলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দেওয়াটা বেশ কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি ওর মধ্যে। জটিল প্রশ্নের উত্তর ভাবতে তো সময় লাগে, কিন্তু অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে কিছু শুধোলেও চটপট সাড়া দেওয়ার কোন স্পৃহাই দেখা যায় না ইদানীং। হপ্তার পর হপ্তা ধরে দেখে আসছি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বিচিত্র অভ্যাসটি। কিন্তু রকম-সকম দেখে বুঝেছি উত্তর দিতে এত সময় নেওয়ার কারণ ভারিক্কেপনা দেখানোও নয়, অথবা মনে মনে তোলাপাড় করাও নয়। ও আসলে সব সময়ে তন্ময় হয়ে থাকে অন্য কিছু নিয়ে। চৌপর দিনরাত কিসের চিন্তা যেন কুরে কুরে বসে যাচ্ছে ওর মনের গভীরতম কন্দরে বিমনা থাকার কারণ এইটাই, আর কিছু না।

কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিলে কল্যাণাক্ষ।

বলল, 'যন্ত্র কাকে বলে? অনেক ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকরকম সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে শব্দটার। আভিধানিক সংজ্ঞা কি? না, যন্ত্র তাকেই বলে যার দ্বারা শক্তিকে প্রয়োগ করা হয়, কার্যকর হয় অথবা অভীপ্সিত ফলাফল সৃষ্টি করা হয়। তাই যদি হয়, তাহলে মানুষও কি যন্ত্র নয়? মানুষও যে ভাবে অথবা ভাবে যে সে ভাবছে —তা তো আর তুমি অস্বীকার করতে পারো না।'

একটু গরম হয়ে বলি, 'আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে না থাকলে, পষ্টাপষ্টি

বলে ফেললেই পারো। ভাল করেই জানো তুমি যে যন্ত্র বলতে আমি মানুষকে বোঝাই নি। মানুষেরই হাতে গড়া কিছুকে বুঝিয়েছি। মানুষ যাকে গড়ে এবং পরিচালনা করে তাকেই বলি যন্ত্র।'

'কিন্তু যখন সে তাকে নিজের অধীনে রাখতে পারে না'—বলে আচম্বিতে লাফিয়ে উঠে জানলার সামনে গিয়ে অপলকে তাকিয়ে রইল ঝড়োরাতের কুচকুচে কালো আঁধারের পানে। আমি কিন্তু অনেক চোখ চালিয়েও মসীলিপ্ত বাগানের কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। ক্ষণেক পরেই একটু হেসে ফিরে এসে বসে পড়ল কল্যাণাক্ষ। বলল, 'কিছু মনে কর না, তোমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু আভিধানিক সংজ্ঞাটা নিয়েই আলোচনা করেছিলাম ও সংজ্ঞার আওতায় মানুষও এসে পড়ছে কিনা ? যাই হোক, তোমার প্রশ্নের সহজ সরল পরিষ্কার উত্তর দিতে আমার কোন অসুবিধে নেই এবং তা এখুনি দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, যে কাজ দিয়ে যন্ত্রকে চালু রাখা হয়, তা নিয়ে সে ভাবতে পারে অনায়াসেই।'

উত্তরটা সোজাসুজিই বটে। কিন্তু তবুও তা ভাল লাগল না একটি বিশেষ সন্দেহ মনের কোণে উঁকি দেওয়ায়। কেমন জানি সন্দেহ হলো আমার, অহোরাত্র মেশিন-শপে কাজের মধ্যে ডুবে থেকে কল্যাণাক্ষের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কতটা হয়েছে জানা নেই, তবে তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে অন্যদিক দিয়ে। আমি জানতাম অনিদ্রা-রোগে প্রায় কষ্ট পেতে হয় ওকে। ব্যাধিটা শাখাপ্রশাখা ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ওর মনকে পেঁচিয়ে ধরে নি তো ? তখন অবশ্য ওর উত্তর শুনে মনে হয়েছিল, বাঃ, চমৎকার, খাসা জবাব তো ! কিন্তু এখন যখন সে কথা ভাবি, তখন মনে হয় অন্য কথা। তখন বয়স ছিল কাঁচা, এবং অজ্ঞতা যে তারুণ্যের একটা মস্তবড় প্রকৃতি, তা তো আর কারও অজানা নেই ! কাজে কাজেই এ-হেন চাঁচা-ছোলা উত্তর শুনে বাগবিতণ্ডার মস্ত সুযোগ পেয়ে গেলাম।

বললাম, 'তাই নাকি ? বন্ধু, তাই যদি হয়, তাহলে বুঝিয়ে দাও দিকি বিনা মস্তিষ্কে কি করে চিন্তা করতে সক্ষম সে ?'

উত্তরটা এল একটু দেরীতে। অবশ্য ততটা দেরীতে নয়, যতটা লক্ষ্য করেছিলাম আলাপের শুরুতে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে চট করে পাল্টা প্রশ্ন করে বসল ও।

বলল, 'বিনা মস্তিষ্কে গাছপালা কি করে চিন্তা করে শুনি ?'

'আরে, গাছপালার কথা ছেড়ে দাও। ওদেরকে আমি দার্শনিকদের পর্যায়ে ফেলি। আচ্ছা, তোমার কথাই মেনে নিয়ে বলছি। মাথা খেলিয়ে আজ পর্যন্ত ক'টা সিদ্ধান্তে তোমার গাছপালারা পৌঁছোতে পেরেছে বল দিকি। প্রমাণ নিয়ে আর কষ্ট কর না, শুধু ফলাফলগুলো বলে ফ্যাল।'

আমার স্থূল শ্লেষটুকু যেন ওকে স্পর্শই করল না। ও বললে, 'ওদের কার্য-কলাপ লক্ষ্য করলেই তোমার প্রশ্নের আংশিক জবাব পেতে। অনুভূতি সচেতন লজ্জাবতী লতার কথা বাদ দিলাম। কীটভুক কয়েকটা ফুলের কথাও বললাম না। পরাগ-কেশর নামিয়ে যে-সব ফুল পরাগ ছড়িয়ে দেয় মৌ-লোভী মৌমাছিদের ওপর দূর-সঙ্গীদের কাছে তা পৌঁছে দিয়ে তাদের ফলবতী করার জন্যে—তাদের কথাও না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু একটা আশ্চর্য ঘটনা বলি শোন। কিছুদিন আগে আমার বাগানে একটা খোলা জমিতে একটা পরাশ্রয়ী লতা পুঁতেছিলাম। মাটির ওপর লতাটা মুখ বার করতে না করতেই গজখানেক দূরে একটা কাঠি পুঁতে দিলাম মাটির ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে লতাটা এগিয়ে চলল কাঠিটার দিকে। কয়েকদিন বাদে তা কাছাকাছি যখন পৌঁছেছে, তখন কাঠিটা তুলে নিয়ে পুঁতে দিলাম আর একদিকে। তখন থেকে গতি পরিবর্তন করলে লতাটা। শুরু হলো নতুন দিকে পোঁতা কাঠিটার দিকে তার যাত্রা। এবং মোড় নিলে সে বেশ খানিকটা কোণ করে। বার কয়েক এই কাণ্ড করলাম এবং প্রতিবারই অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দিক পরিবর্তন করে কাঠিটার দিকে ধেয়ে চলল লতাটা। শেষকালে যেন হতাশ হয়েই হাল ছেড়ে দিয়ে কাছাকাছি একটা ছোট্ট গাছের দিকে এগিয়ে গেল বেচারী। কাঠিটা এদিকে-সেদিকে আগিয়ে নিয়ে কয়েকবার লোভ দেখালাম। এবারে কিন্তু আর প্রলোভনে ভুলল না সে। সোজা এগিয়ে গিয়ে গাছটাকে আশ্রয় করে জড়িয়ে উঠল ওপর দিকে।

জলকণার সন্ধানে অবিশ্বাস্য ভাবে দীর্ঘায়িত হয়ে চলে ইউক্যালিপটাসের শেকড়। একজন নাম-করা হর্টিকালচারালিস্টের কাছে অদ্ভুত একটা গল্প শুনেছিলাম। ইউক্যালিপটাসের একটা শেকড় একটা পুরোনো ড্রেনের পাইপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর এগিয়ে চলে পাইপ বরাবর। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সামনে বাধা পড়ে একটা পাথরের দেওয়ালে। পাইপের খানিকটা সরিয়ে ফেলে দেওয়ালটাকে গাঁথা হয়েছিল সে জায়গায়। ড্রেন ছেড়ে দেওয়াল ধরে এগিয়ে চলল শেকড়টা এবং

যতক্ষণ না একটা ফাঁক পাওয়া গেল, ততক্ষণ গতি পরিবর্তন করলে না। এই জায়গায় একটা পাথর খসে পড়ে গেছিল। ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে দেওয়ালের ওদিকে পৌঁছে গেল শেকড়টা। তারপর আবার ফিরে এল ড্রেনে এবং অদেখা অংশটায় ঢুকে পড়ে আবার শুরু হলো তার পাইপ-অভিযান।'

'তাৎপর্যটা কি ধরতে পারলে না? গাছেরও যে চেতনা আছে, তাই তো প্রমাণিত হয় এ থেকে। প্রমাণিত হয় যে তারাও ভাবে।'

'ধরে নেওয়া গেল, হ্যাঁ, ভাবে। কিন্তু তারপর? আমাদের আলোচনা হচ্ছিল মেশিন সম্বন্ধে, গাছপালা সম্পর্কে নয়। মেশিনের খানিক খানিক অংশ কাঠ দিয়ে তৈরি হলেও হতে পারে এবং সে সব কাঠের মধ্যে যে প্রাণের ছিটে-ফোঁটাও থাকে না, তা বলাই বাহুল্য। তবে, অধিকাংশ মেশিনই তৈরি হয় পুরোপুরি ধাতু দিয়ে। খনিজ জগতেও চিন্তার নজির দেখা যায় না কি?'

'Crystallization অর্থাৎ কেলাসন, মানে, খনিজ পদার্থের দানা-বাঁধা রহস্যের ব্যাখ্যা কি করে করবে শুনি?'

'আমার কোন ব্যাখ্যাই নেই এবং তা করারও চেষ্টা করি না।'

'তার কারণ, ক্রুস্ট্যালের উপাদান মৌলিক পদার্থগুলোর মধ্যে যে আত্যন্তিক বুদ্ধিদীপ্ত সহযোগিতা, তা না স্বীকার করে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তাই সে চেষ্টা কর না। সিপাইরা যখন সারি বেঁধে দাঁড়ায় বা চার কোণা ব্লকের সৃষ্টি করে, তখন বলো যে এর পেছনে আছে যুক্তি। বুনো-হাঁসের দল উড়ে চলার সময়ে যখন V অক্ষরের আকারে নিজেদের সাজিয়ে নেয়, তখন বলো সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু যখন একটা খনিজ পদার্থের সমধর্মসম্পন্ন অ্যাটমগুলো সলিউশনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন ভাবে এগুতে এগুতে গাণিতিক ভাবে নিখুঁত বিভিন্ন আকারে সাজিয়ে নেয় নিজেদের অথবা জমে যাওয়া জলকণা সুষ্ঠু, সুন্দর, সুডৌল তুষার-কণিকার আকার ধারণ করে, তখন আর তোমাদের মুখে কোন কথা সরে না। এই জাতীয় আশ্চর্য অযুক্তির কোন বিশেষ নাম আবিষ্কার করাও তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি আজ পর্যন্ত।'

ওর কথা ফুরোতে না ফুরোতেই স্পষ্ট শুনলাম পাশের ঘরে আশ্চর্য রকমের কয়েকটা দুম দুম শব্দ। কে যেন ঘুষির পর ঘুষি মেরে চলেছে টেবিলের ওপর। পাশের ঘরটাই কল্যাণাক্ষের মেশিন-শপ। সে ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির

প্রবেশাধিকার নেই এ কারখানায়। শব্দটা কানে আসামাত্র রীতিমত উদ্বিগ্ন মুখে সাঁৎ করে কারখানা ঘরে ঢুকে গেল ও। ও ঘরে যে কেউ থাকতে পারে, এমন ধারণা এতক্ষণ আমার আসে নি। কল্যাণাক্ষের ঐ রকম হন্তদন্ত হয়ে ঢোকার বহর দেখে প্রবল কৌতূহল হলো আড়ি পেতে শোনার। চাবির দরজায় চোখ রাখি নি এবং সে জন্যে আজও নিজেকেই নিজে ধন্যবাদ জানাই। এলোমেলো উদ্ভট কতকগুলো শব্দ ভেসে এল। অনেকটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দের মত। থর থর করে কেঁপে উঠল ঘরের মেঝে। পরিষ্কার শুনলাম ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ এবং ভাঙা ভাঙা গলায় কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল, 'গোল্লায় যাও!' তারপরেই সব চুপ। একটু পরেই বেরিয়ে এল কল্যাণাক্ষ।

শুকনো হাসি হেসে বললে, 'হুট্ করে তোমাকে একলা ফেলে যাওয়ার জন্যে কিছু মনে করো না। কোন কাজকর্ম না দিয়েই একটা মেশিন ফেলে এসেছিলাম ও ঘরে। তাই মেজাজ খিঁচরে গেছিল বেচারার।'

আমি অপলকে তাকিয়েছিলাম কল্যাণাক্ষের ডান গালের পানে। সমান্তরাল চারটে আঁচড় দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছিল।

চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, "মেশিনটার নখগুলো ছেঁটে দিলে কেমন হয়?"

কল্যাণাক্ষ কিন্তু কর্ণপাত করল না এ বিদ্রূপে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে ছেড়ে যাওয়া কথার খেই তুলে নিয়ে শুরু করল তার বক্তিমে।

'এমন অনেক বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন বস্তু মাত্রই সচেতন। পড়াশুনো তো তোমার বড় কম নয় হে, সুতরাং তাঁদের নাম করতে চাই না আর তোমার কাছে। এঁদের সঙ্গে তোমার মতের যে তিলমাত্র মিল নেই, তা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। এঁরা মনে করেন প্রতিটি অ্যাটমের আছে বোধশক্তি, আছে প্রাণের ইঙ্গিত, আছে চেতনার স্পন্দন। আমিও তাই মনে করি। নির্জীব, নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ বলে কিছু ইহজগতে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। প্রত্যেকেই জীবন্ত, প্রত্যেকের মধ্যে আছে শক্তির সহজাত স্ফুরণ। আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সংযোগ আছে। উন্নততর প্রাণীর বুদ্ধি প্রাখর্যের কাছে তারাও নতি স্বীকার করে, তাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে না। তাই তো দেখি মানুষ তার খুশিমত বিশেষ বিশেষ ধাতুর বিশেষ বিশেষ ধর্মকে করায়ত্ত করে সৃষ্টি

করেছে বিচিত্র সব মেশিন। একটা সম্পূর্ণ মেশিনের মধ্যে যে জটিলতা থাকে, সে জটিলতার অন্তরালে নিহিত থাকে যতখানি ধীশক্তি আর উদ্দেশ্য, তারও কিছু কিছু প্রতিটি অ্যাটমের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

'হারবার্ট স্পেন্সারের 'জীবন'-এর সংজ্ঞা মনে পড়ে তোমার? তিরিশ বছর আগে এ সংজ্ঞা পড়েছিলাম আমি। পরে তার কোন পরিবর্তন সাধন হয়েছিল কি না তা আমার জানা নেই। হলেও হতে পারে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, আজ পর্যন্ত এমন একটা শব্দও আমার মাথায় আসে নি যা ঐ সংজ্ঞার যে কোন শব্দের চাইতে বেশি উপযুক্ত হতে পারে। অনেক ভেবেও এমন কোন শব্দ আমি মনে করতে পারি নি, যার স্থান হতে পারে ঐ সংজ্ঞার মধ্যে। 'জীবন' কি, সে সম্বন্ধে এর চাইতে ভাল সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত আমি আর পাই নি। শুধু সব চাইতে সেরা নয়, হারবার্ট স্পেন্সারের এই সংজ্ঞাই হলো 'জীবন;-এর একমাত্র সম্ভাব্য সংজ্ঞা।

'তিনি বলেছেন, জীবন মানেই হলো কতকগুলো বহুধর্মী পরিবর্তনের নিশ্চিত সমন্বয়। এ পরিবর্তন বহিস্থ সমঅবস্থান আর অনুক্রমে সঙ্গে তাল রেখে কখনও যুগপৎ, আবার কখনও বা ক্রমান্বয়।'

আমি বললাম, 'এটা গেল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির ব্যাখ্যা। কিন্তু কারণ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত এর মধ্যে নেই।'

ও বললে, 'এ সংজ্ঞায় এর চাইতে বেশি আর কিছু বলা সম্ভব নয়। মিল কি বলেছেন জানো তো? পূর্ববর্তী ঘটনা ছাড়া কারণ জানা অথবা ফলাফল ছাড়া প্রতিক্রিয়া জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কতকগুলো ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিভিন্ন ধর্মী হলেও একটি ছাড়া আর একটিকে ঘটতে দেখা যায় না। সময়ের দিক দিয়ে বিচার করে প্রথমটিকে বলি কারণ; দ্বিতীয়টিকে বলি প্রতিক্রিয়া। খরগোশকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুকুর, এ দৃশ্য যিনি অনেকবার দেখেছেন, কিন্তু কুকুরকে খরগোশ তাড়িয়ে নিয়ে যেতে কস্মিনকালে দেখেন নি, তিনি খরগোশটাকে কুকুরের কারণ হিসেবে ধরে নিলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।'

হাসতে হাসতে আবার বললে ও, 'আমার খরগোশ হয়ত যুক্তিবদ্ধ তর্কের সড়ক থেকে অনেক দূর টেনে এনেছে আমায়। কিন্তু এরকম পাছু নেওয়াতেও আনন্দ আছে, নাকি বল? আমি যা বলতে চাই, তা হলো এই। হারবার্ট স্পেন্সারের

'জীবন'-এর ব্যাখ্যার মধ্যে মেশিনের তৎপরতারও স্থান আছে। অর্থাৎ, সংজ্ঞাটায় এমন কিছু নেই, যা মেশিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পর্যবেক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী আর চিন্তাশীল পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগাঢ় যাঁর প্রজ্ঞা, সেই হারবার্ট স্পেন্সারের মতে তৎপর থাকাকালীন সময়টুকুর মধ্যে মানুষ যেমন সজীব, ঠিক তেমনি মেশিন যতক্ষণ চালু থাকে, ততক্ষণ সে-ও জীবন্ত। বিজ্ঞানী জগদীশ বোসও দেখিয়ে গেছেন, একনাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ কাজ করার পর ধাতুও মানুষের মত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হরেকরকম মেশিনের আবিষ্কর্তা আর নির্মাতা হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে এসব তথ্যের মধ্যে এতটুকু অসত্য নেই।'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল কল্যাণাক্ষ। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল টেবিলের ওপর এলোপাতাড়ি ভাবে সাজানো তাসগুলোর দিকে। দেরী হয়ে যাচ্ছিল। ভাবলাম, এইবার ওঠা যাক। কিন্তু তবুও ওকে এইভাবে নিরালা নির্জন বাড়িতে একলাটি ছেড়ে যেতে মন সরলো না আমার। একলাটিই বা বলি কি করে? পাশের ঘরে যে লোকটা ঘাপটি মেরে রয়েছে, তার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আর কিছু না জানলেও একটি জিনিস অনুমান করতে মোটেই বেগ পেতে হয় নি আমায়। লোকটার সঙ্গে কল্যাণাক্ষর বিশেষ সদ্ভাব নেই এবং তার স্বভাবটিও বড় হিংস্র আর নিষ্ঠুর। ওর দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে চোখের ওপর চোখ রেখে কারখানা ঘরের দরজাটা দেখিয়ে ফিস ফিস করে শুধোলাম আমি: 'কল্যাণাক্ষ, ওঘরে কাকে লুকিয়ে রেখেছ?'

অবাক হয়ে গেলাম ওর হাসি দেখে। লঘুভাবে হেসে ফেলল ও। কোনরকম দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলে: 'কাউকে নয়। যে কাণ্ডটা নিয়ে এখনও মনে মনে তোলপাড় করছ তুমি, তার জন্যে আমিই দায়ী। একটা মেশিনকে কোনরকম কাজ না দিয়ে তোমার অজ্ঞতা দূর করার জন্যে লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়ছিলাম কিনা, তাই। 'চেতনা' যে 'ছন্দে'র সৃষ্টি তা জানার সৌভাগ্য কি তোমার কোনদিন হয়েছে?'

'চুলোয় যাক তোমার চেতনা আর ছন্দ,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম আমি। 'আর নয়, এবার চলি। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। যে মেয়ে-মেশিনটাকে ও ঘরে ফেলে এসেছিল, পরের বার যখন তাকে থামানো দরকার মনে করবে, তখন যেন একজোড়া দস্তানা পরিয়ে নেওয়া হয় তার হাতে।'

আমার বাক্যবাণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য না করেই তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি।

রিম ঝিম রিম ঝিম বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছিল। আর সে কি কুচকুচে কালো আবলুস কাঠের মত নিকষ অন্ধকার। জনহীন পথের দু'পাশে অনেক দূরে দূরে টিম টিম করে জ্বলছিল গ্যাসের বাতি। অন্ধকারের জঠর ভরাবার পক্ষে সে আলো নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আর পেছনে নিবিড় তমিস্রার মধ্যে ভেসে ছিল শুধু একটা চৌকোণা আলো—কল্যাণাক্ষের 'মেশিন-শপে'র পর্দাবিহীন জানালা। আর সবক'টা জানালাতেই ঝুলছে পর্দার অনুশাসন, শুধু এই জানলাটাই কোনগতিকে থেকে গেছে অনাবৃত। ধাতব-চেতনা সম্পর্কে আমার শিক্ষক হিসেবে আর ছন্দের জনক হিসেবে ও যে আবার শুরু করেছে অধ্যয়ন কার্য, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না আমার মনে। আমি এসে পড়ায় বাধা পড়েছিল ওর সে পড়াশুনোয়। তখন ওর উদ্ভট কথাবার্তা শুনে বিস্তর কৌতুক অনুভব করলেও একটা জিনিস আমি কিন্তু মোটেই মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। ওর মন, চরিত্র, এমন কি ওর অদৃষ্টকেও নিয়ন্ত্রণ করছে ওর এই আপাতত অসংলগ্ন চিন্তাধারা। বড় দুঃখময় এই সম্পর্ক। অবশ্য এসব চিন্তাধারা যে বিকৃত মস্তিষ্কের বিদঘুটে উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছু নয়, এরকম একটা ক্ষীণ আশঙ্কাও অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল মনের কন্দরে। কিন্তু আশ্চর্য, যতই বিকৃত আর উদ্ভট হোক না কেন ওর বক্তিমে, ওর বাচনভঙ্গী কিন্তু অদ্ভুত রকমের যুক্তিনিষ্ঠ বলিষ্ঠ। বারবার ওর শেষ কথাটা ফিরে আসছিল আমার মনে—'চেতনা' যে 'ছন্দে'র সৃষ্টি, তা জানার সৌভাগ্য কি তোমার কোনদিন হয়েছে? সাদাসিদে হলেও কথাটার মধ্যে অসীম প্রলোভনের সন্ধান পেলাম। যতবার তা ফিরে এল মনের মধ্যে ততবারই ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার অন্তর্নিহিত অর্থ, প্রকট হয়ে উঠতে লাগল প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু। আমার তো মনে হলো এই কথাটার বনিয়াদের ওপরেই একটা দর্শন খাড়া করে ফেলা যায়। চেতনা যদি ছন্দ থেকেই উৎপন্ন হয়, তাহলে প্রত্যেকটা বস্তুই তো সচেতন; কেননা, প্রত্যেকেরই গতি আছে এবং সব গতিই তো ছন্দময়। চিন্তাধারার এই তাৎপর্য আর গভীরতা কল্যাণাক্ষ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারলাম না। আমি কিন্তু এই অচিন্তিতপূর্ব সত্যের অপরিসীম ব্যাপ্তি উপলব্ধি করে অভিভূত হয়ে পড়লাম। ও কি শুধুই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কৃচ্ছ্র সাধনের মার্গ পেরিয়ে উপনীত হয়েছে এই দার্শনিক বিশ্বাসে?

অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পরেও কল্যাণাক্ষ আমায় যা বিশ্বাস করাতে পারে নি, আচম্বিতে সেই বৃষ্টি-মুখর রাতে ক্ষণেকের চিন্তায় তা বিদ্যুদ্দামের মতই উদ্ভাসিত করে তুলল আমার মনের দিক হতে দিগন্ত। অভিনব এই উপলব্ধি। তুফান-প্রকম্পিত তমিস্রা-মগ্ন সেই নিঃসঙ্গ রাতে নতুন করে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করলাম 'দার্শনিক চিন্তাধারার সীমাহীন বৈচিত্র্য আর উত্তেজনা'। নতুন প্রজ্ঞার উপলব্ধি আর যুক্তিবোধের অহমিকায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম আমি। মনে হলো, যেন মাটিতে পা পড়ছে না, যেন কোন অদৃশ্য ডানাযুগল শূন্যে তুলে নিয়ে ধেয়ে চলেছে পবনবেগে।

যে মানুষটিকে আমার গুরু আর পথপ্রদর্শক বলে হঠাৎ চিনতে পারলাম, প্রবল ইচ্ছে হলো আবার তার কাছে ফিরে গিয়ে আরও আলোর সন্ধান নেওয়ার। অজানতেই পেছন ফিরে এবং তা বোঝার আগেই আচমকা দেখলাম কল্যাণাক্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি আমি। বৃষ্টির জলে ভিজে সপ্‌সপে হয়ে উঠলেও মোটেই অস্বচ্ছন্দ বোধ করলাম না। উত্তেজনার চোটে দরজার ঘণ্টা খুঁজে না পেয়ে ঠেলা মারতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম বসবার ঘরে। এই ঘর থেকেই একটু আগে বিদায় নিয়েছিলাম আমি। চারদিক অন্ধকার আর নিস্তব্ধ। কল্যাণাক্ষ নিশ্চয় পাশের 'মেশিন-শপে' সেঁধিয়েছিল। দেওয়াল ধরে ধরে এগিয়ে গিয়ে দরজাটার সামনে পৌঁছলাম। তারপর বেশ জোরে জোরে কয়েকবার টোকা মারলাম। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ ভেসে এল না ভেতর থেকে। কল্যাণাক্ষ নিশ্চয় শুনতে পায় নি। পাওয়াও সম্ভব ছিল না। কেননা, ঝড়ো বাতাস আর তুমুল বৃষ্টি প্রবলবেগে আছড়ে পড়ছিল দেওয়াল আর দরজা জানালার ওপর। প্রকৃতির সে নিষ্ঠুর আক্রমণে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছিল পাতলা ছাদ আর তারই গুম গুম শব্দ প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছিল ফাঁকা ঘরের মধ্যে।

মেশিন-শপের মধ্যে কোনদিন আমায় আমন্ত্রণ জানায় নি কল্যাণাক্ষ। আমন্ত্রণ তো দূরের কথা, কারোরই প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে—শুধু একজন ছাড়া। পাকা ধাতুর কারিগর সে। তার নাম ভৈরব আর স্বভাব অল্প কথা বলা—এ ছাড়া লোকটি সম্বন্ধে আর কেউই কোন খবর রাখত না। কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় আমার তখন এমনই অবস্থা যে আদবকায়দা, বিধিনিষেধ আর কিছুই মনে ছিল না। কাজেই, সাড়া না পেয়ে খুলে ফেললাম দরজা। ঘরের মধ্যে যে দৃশ্য দেখলাম, যা

দেখামাত্র দেখতে দেখতে তিরোহিত হলো আমার যাবতীয় দার্শনিক ভবিষ্যদ্‌বাণী।

ছোট্ট একটা টেবিল। একদিকে আমার পানে মুখ করে বসে কল্যাণাক্ষ। একটি মাত্র মোমবাতি জ্বলছে টেবিলের ওপর। এবং এই মোমবাতির আলো ছাড়া ঘরের মধ্যে আর দ্বিতীয় আলো নেই। ওর ঠিক বিপরীত দিকে, আমার দিকে পেছন ফিরে বসে আর একজন লোক। দু'জনের মধ্যে টেবিলের ওপর রয়েছে একটা দাবার ছক। দেখেই বোঝা যায় দু'জনেই খেলায় মেতে উঠেছে। দাবা খেলা আমি সামান্যই জানি। কিন্তু ছকের ওপর মাত্র কয়েকটা ঘুঁটি পড়ে থাকতে দেখে বুঝলাম খেলা শেষ হয়ে এল বলে। তন্ময় হয়ে গেছিল কল্যাণাক্ষ, নিবিড়তম আগ্রহের দ্যুতি থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল ওর দুই চোখে। কিন্তু আমার মনে হলো, ওর এই নিঃসীম আগ্রহ উৎকণ্ঠা ব্যগ্রতা খেলার সম্বন্ধে যত না হোক, তার চেয়েও যেন অনেক বেশি প্রতিপক্ষ সম্পর্কে। কেননা, বড় বড় চোখে এমনভাবে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল কল্যাণাক্ষ যে তার দৃষ্টিরেখার আর একপ্রান্তে দোরগোড়ায় আমি দাঁড়িয়ে থাকা সত্বেও আমাকে দেখতে পেল না সে। পাণ্ডাসপানা নিরক্ত সাদা হয়ে উঠেছিল ওর মুখ, বীভৎস রকমের ফ্যাকাশে সে মুখচ্ছবি দেখলে অজানিতেই শিউরে উঠতে হয়। দুই চোখ দু'টুকরো হীরের মত জ্বলছিল দপ্‌ দপ্‌ করে। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের শুধু পেছনটাই আমার চোখে পড়ল এবং তাই যথেষ্ট। তার মুখ দেখার কোন স্পৃহাই জাগ্রত হলো না আমার মনে।

লোকটা উচ্চতায় পাঁচ ফুটের বেশি বলে মনে হলো না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশালাকৃতি দেখলে গরিলার কথা মনে পড়ে যায়। বেজায় চওড়া অতিকায় এক জোড়া কাঁধ; মোটা আর খাটো ঘাড়; বিশাল, চারকোণা মাথা—গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের ওপর টকটকে লাল রঙের একটা ফেজটুপী। পরনে রক্তবর্ণের একটা ঢলঢলে আলখাল্লা। কোমরের কাছে বেল্ট দিয়ে বাঁধা। লোকটা বসেছিল একটা বাক্সের ওপর, তাই পা দেখা যাচ্ছিল না। বাঁ হাতটা মনে হলো কোলের ওপর রাখা—চাল দিচ্ছিল ডান হাত দিয়ে এবং অস্বাভাবিক রকমের লম্বা সে হাত—বেমানান, বেয়াড়া।

পিছু হটে এসেছিলাম আমি। এখন দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার আড়ালে ছায়াঘন আঁধার জায়গাটিতে। এদিকে তাকালে দরজাটাকে শুধু খোলা দেখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেত না কল্যাণাক্ষ। কিন্তু প্রতিপক্ষের মুখ না দেখে তার

কাঁধের ওপর দিয়ে দরজার দিকে তাকানোর মত কোন লক্ষণ দেখলাম না ওর মধ্যে কিসের তর্জনীহেলনে আমি ঢুকতেও পারলাম না, যেতেও পারলাম না। কি জানি কেন বিচিত্র একটা অনুভূতি জেগে উঠল আমার মনের কোণে। মনে হলো, এখুনি যেন একটা অতি ভয়াবহ বিয়োগান্তক দৃশ্য অভিনীত হবে এ ঘরের মধ্যে। দূরায়ত বিপদের দ্রিমি দ্রিমি ডম্বরুধ্বনি যেন শুনতে পেলাম কি এক আশ্চর্য অননুভূতপূর্ব উপায়ে। মনে হলো, সে বিপদে বন্ধুকে সাহায্য করার জন্যে আমার থাকা একান্তই দরকার। তাই, চোরের মত ঘাপটি মেরে দেখার মত অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিজয়কেতন উড়িয়ে দুরু দুরু বুকে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি দরজার আড়ালে।

দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠেছিল খেলার গতি। চাল দেওয়ার সময়ে ছকের দিকে কল্যাণাক্ষ প্রায় তাকাচ্ছিল না বললেই চলে। আমার আনাড়ি চোখে মনে হলো, ও যেন সবচেয়ে হাতের কাছে থাকা ঘুঁটিটাকেই নার্ভাসভাবে চকিত হাতে সরিয়ে দিচ্ছে। ওর প্রতিপক্ষের দিক থেকেও সাড়া আসছে তৎক্ষণাৎ। কিন্তু তার হাত নাড়ার ভঙ্গিমাটাই কেমন জানি মন্থর। বৈচিত্র্যবিহীন। বার বার সেই একই রকমের যন্ত্রসুলভ হাতনাড়া দেখে আমারও সহিষ্ণুতা ফুরিয়ে আসে। লোকটার সব কিছুর মধ্যেই কি এক অপার্থিব রহস্যের ছোঁয়া রয়েছে। ভেতরে ভেতরে থর থর করে কেঁপে উঠি আমি। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে কপালে।

দু'বার কি তিনবার ঘুঁটি সরানোর পর সামান্য মাথা হেলালে আগন্তুক। এবং প্রতিবারই লক্ষ্য করলাম রাজাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কল্যাণাক্ষ। তারপরেই, আচমকা সহস্র বিদ্যুৎ-চমকের মতই সত্যের আলোয় নিমেষ মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মস্তিষ্কের প্রতিটি অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রে-সেল। লোকটা বোবা। এবং সে একটা মেশিন—স্বয়ংক্রিয় দাবা-খেলোয়াড়! তখনই মনে পড়ল কল্যাণাক্ষ একবার গল্প করেছিল বটে এরকম ধরনের একটা যন্ত্র নাকি সে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু সে যে সত্যি সত্যিই তা তৈরি করে ফেলেছে, তা আমি ভাবতেই পারি নি। মেশিনের চেতনা আর ধীশক্তি নিয়ে এত লম্বা লম্বা বক্তৃতার অর্থ কি তাহলে এই বিচিত্র যন্ত্র দেখিয়ে আমাকে তাক লাগিয়ে দেওয়া? এত কথা কি তাহলে সবই নিছক ভূমিকা? মেশিনটার যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রতিক্রিয়া যাতে আমার ওপর আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে, তা দেখার জন্যেই কি আমাকে এ রহস্যের অন্ধকারে রেখে দেওয়ার এত প্রচেষ্টা?

'দার্শনিক চিন্তাধারার সীমাহীন বৈচিত্র্য আর উত্তেজনা' তখন অন্তে পৌঁছেছে! বিরক্ত হয়ে ফিরতে যাচ্ছি, ঠিক এমনি সময়ে এমন একটা কাণ্ড ঘটল যে নিমেষের মধ্যে আবার চন্‌মনে হয়ে উঠল আমার কৌতূহল। আচম্বিতে সামনের বিশালবপু বস্তুটাকে তার অতিকায় দুই কাঁধ ঝাঁকাতে লক্ষ্য করলাম। এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকানি দিলে যেন মেজাজ খিঁচড়ে গেছে তার। ব্যাপারটা এমনই মানবোচিত আর এতই স্বাভাবিক যে, জড়পদার্থ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞানলাভ সত্ত্বেও রীতিমত আঁৎকে উঠলাম। শুধু তাই নয়, মুহূর্ত পরেই মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত দিয়ে সজোরে দমাদম শব্দে টেবিলের ওপর কয়েকটা ঘুষি মারলে সে। কল্যাণাক্ষ তো তাই দেখে যেন আরও ঘাবড়ে গেল, আরও ফ্যাকাশে হয়ে উঠল তার ছাই-ছাই মুখ। নিদারুণ ভয় পেয়ে চট করে চেয়ারটাকে একটু পিছিয়ে নিতেও দেখলাম তাকে।

এবার কল্যাণাক্ষের চাল দেওয়ার পালা। এক হাত মাথার একদম ওপরে তুলল সে। তারপর, নিরীহ চড়ুইয়ের ওপর যেমন ছোঁ মেরে নেমে পড়ে বাজপাখি, ঠিক তেমনিভাবে হঠাৎ হাত নামিয়ে এনে একটা ঘুঁটিকে চেপে ধরেই চীৎকার করে উঠল—'কিস্তিমাৎ'! সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল সে এবং চকিতে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল চেয়ারের পেছনে। নিশ্চল হয়ে বসে রইল যন্ত্র-মানুষটা।

বাতাসের জোর কমে এসেছিল, স্তিমিত হয়ে এসেছিল ঝড়ের প্রকোপ। কিন্তু সে জায়গায় ক্ষণে ক্ষণে অল্প বিরতি দিয়ে, গুরু গুরু মেঘের ডমরুধ্বনি বেজে উঠছিল থমথম আকাশের কোণে কোণে। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল মেঘের এই বুক-কাঁপানো দামামা-শব্দ। কিন্তু ঐ যে ক্ষণিক বিরতি, তার মাঝেই এবার আমি শুনতে পেলাম নতুন একটা আওয়াজ। ক্ষীণ গুন্‌গুনে একটা শব্দ—অনেকটা দূরায়ত মেঘমন্দ্রের মতই। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল শব্দটা, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল একটা ঘরর্ ঘরর্ শব্দ। শব্দটার উৎপত্তি যে মন্ত্র-মানুষের দেহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না আমার অনেকগুলো চাকা ঘুরলে যেরকম অদ্ভুত চাপা শব্দ হয়, এ যেন ঠিক তেমনি শব্দটা শুনেই আমার মনে হলো যন্ত্রের ভেতরে কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কন্ট্রোল-বোর্ডের আওতার বাইরে চলে গেছে যন্ত্রের একটা অংশ। দাঁতওয়ালা চাকার একটা দাঁত ভেঙে গেলে যেরকম করবর করবর শব্দ হয়—এ যেন ঠিক তেমনি। শব্দটার প্রকৃতি সম্বন্ধে বেশি কিছু অনুমান করার

আগেই যন্ত্রদানবটার অদ্ভুত রকমের অঙ্গভঙ্গি দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। আচমকা দানবটার প্রতিটি প্রত্যঙ্গে, হাতে, মাথায়, দেহে, জেগে উঠল এক বিচিত্র কাঁপন। দেখতে দেখতে এ মৃদু কাঁপন পর্যবসিত হলো ভয়ংকর আক্ষেপে। দারুণ শীতে মানুষ যেমন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে অথবা আতীব্র বেদনায় দুমড়ে মুচড়ে উঠতে থাকে তার সর্বদেহ, হুবহু তেমনি ভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রচণ্ড হয়ে উঠতে লাগল দানবটার যান্ত্রিক খেঁচুনি। সমস্ত দেহটার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠল ভয়াবহ উত্তেজনা। আচম্বিতে জ্যামুক্ত ধনুকের মত তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই সে ধেয়ে গেল সামনের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে; জলের মধ্যে উঁচু থেকে ঝাঁপ দেওয়ার সময়ে সাঁতারুর মত ভঙ্গিমাতেই ছিটকে গেল সে সামনের দিকে। বন্দুকের গুলির মত এমনই অসম্ভব দ্রুতগতিতে সামনে লাফিয়ে পড়ল যে আমার চোখও ব্যর্থ হলো তার গতিরেখা অনুসরণ করতে। কল্যাণাক্ষ লাফিয়ে ওর নাগালের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলে, কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছিল। পলক ফেলার আগেই সভয়ে লক্ষ্য করলাম বিকট বস্তুটার সাঁড়াশির মত হাত চেপে বসেছে কল্যাণাক্ষের গলায়। কল্যাণাক্ষ দুই হাত দিয়ে চেপে ধরেছে দানবটার কব্জিজোড়া। তার পরেই উল্টে গেল টেবিলটা, মোমবাতি মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে একবার খাবি খেয়ে নিবে গেল, অন্ধকারের সমুদ্র চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে, চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল সব কিছু। কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলাম ধ্বস্তাধ্বস্তির ভয়ানক শব্দ এবং সব কিছু ছাড়িয়ে উঠেছিল রুদ্ধশ্বাস কল্যাণাক্ষের গলার ঘড় ঘড় শব্দ—তার সাথে মিশে ছিল শ্বাস নেওয়ার আকুল প্রচেষ্টায় করুণ কুঁই কুঁই আওয়াজ। বীভৎস শব্দ লক্ষ্য করে অন্ধকারের মধ্যেই ধেয়ে গেলাম ঘরের মধ্যে অসহায় বন্ধুকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মাঝপথেই আচমকা সমস্ত ঘরটা চোখধাঁধানো ধবধবে সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং সে আলো আমার চোখের সুড়ঙ্গ বেয়ে মনের পটে যে দৃশ্যটির ছবি চিরতরে মুদ্রিত করে গেল, তা আর ইহজীবনে ভোলবার নয়। মেঝের ওপর দেখলাম দুই মল্লবীরকে। কল্যাণাক্ষ নীচে, আর তখনও দুই লৌহ-মুঠিতে ধরা রয়েছে তার গলা; মাথাটা হেলে পড়েছে পেছন দিকে, দুই চোখ নিঃসীম আতঙ্ক ঠেলে বেরিয়ে আসছে; হাঁ হয়ে গেছে মুখবিবর আর অবশ হয়ে জিবটা ঝুলছে বাইরে; আর—ওঃ, সে কি ভয়াবহ বৈসাদৃশ্য। তার বুকের উপর বসা খুনে মেশিনটার রঙ দিয়ে

আঁকা মুখে সুনিবিড় প্রশান্তি আর সুগভীর চিন্তার প্রতিচ্ছবি—যেন দাবা সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল ! এইটুকু দেখার পরেই সব অন্ধকার হয়ে গেল, হারিয়ে গেল নিতল নৈঃশব্দের অতলে।

তিনদিন পরে একটা হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পেলাম আমি। আস্তে আস্তে মস্তিষ্ক সুস্থ হয়ে ওঠার সাথে সাথে ফিরে এল সেই ভয়ংকর রাতের স্মৃতি। কল্যাণাক্ষের অনুচর ভৈরবকে চিনতে পারলাম। ওর দিকে তাকাতেই একটু হাসল ও।

ক্ষীণস্বরে কোনরকমে বললাম 'ভৈরববাবু, কি হয়েছিল, সব বলুন আমায়।'

'একটা জ্বলন্ত বাড়ির ভেতর থেকে আপনাকে বাইরে আনা হয়েছে। বাড়িটা আপনার বন্ধু কল্যাণাক্ষবাবুর। কি করে যে আপনি সেখানে গিয়ে পড়লেন, তা কেউ জানে না। আগুন যে কি করে লাগল, তাও খুব রহস্যময়। আমার নিজের ধারণা, বাজ পড়েছিল বাড়ির ওপর।'

'আর কল্যাণাক্ষ ?'

'কাল দাহ করা হয়েছে তাঁকে—মানে, তাঁর শরীরের যেটুকু পাওয়া গেছে—সেইটুকুরই।'

'আমাকে কে বাইরে নিয়ে এল ?'

'তাই যদি শুনতে ইচ্ছে যায় তো শুনুন, আমিই বাঁচিয়েছি আপনাকে।'

'ধন্যবাদ ভৈরববাবু, ভগবান আপনার ভাল করবেন। আপনাদের দক্ষ হাতে গড়া সেই আশ্চর্য জিনিসটা, মানে, সৃষ্টিকর্তাকে যে নিজের হাতে খুন করলে, সেই যন্ত্রদানব দাবা-খেলোয়াড়কে বাঁচাতে পেরেছেন আপনি ?'

আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ভৈরব। তারপর আবার ফিরে তাকালে আমার পানে। গম্ভীর মুখে বললে : 'আপনি তা জানেন ?'

'জানি। আমি নিজের চোখে সব দেখেছি।'

এ ঘটনা ঘটেছিল অনেক বছর আগে। মৃত্যুর পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই লিখে গেলাম সেই কাহিনী।...

ক্রিকেট খেলা কি বিজ্ঞান ? অজয় দাশগুপ্ত

জ্যামিতিক সবুজ একটি বৃত্ত। যার গায়ে কাল্পনিক অনেক রেখা টানা যায়। একেকবারের রেখাকে মুছে দিয়ে অন্য ছকে। আবার অন্যরকম রেখা। বারেবারেই এই ছক ছাঁদ বদলায়। সেই সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্ত এক মহা খেলাও চলতে থাকে।

এই খেলার সবটাই বিজ্ঞান—আবার পুরোটাই শিল্প। শিল্প আর বিজ্ঞানের এমন চূড়ান্ত রাজযোটক অন্য কোনো খেলায় নেই—আর নেই বলেই খেলাটি প্রাণবন্ত জীবন্ত ও অনিশ্চিত।

শিল্প বিজ্ঞানের হাত ধরে রুচি শৈলী প্রথা-প্রকরণ একসঙ্গে দাঁড়ায়। তাই এর আকর্ষণ চিরকালীন। শক্তিমত্তা মেধা এ খেলার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন—কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রয়োজন শক্তির সঙ্গে বুদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ।

সবুজ বৃত্তটির কেন্দ্রস্থলে, যে কোনো দুপাশ থেকে সমদূরত্বে তিনটে করে কাঠি পোঁতা। একচুল জ্যামিতির ভুল নেই। তিনটি কাঠির মধ্যের ফাঁক বা ব্যবধান সমান। ওপর দিকে ফাঁকটুকু ভরাট করে দু-টুকরো কাঠ। দুপাশের উচ্চতাও এক। তার মানে একটি বৃত্তের কেন্দ্রে দুটি কাঠি দুটো সমান্তরাল রেখা।

তিনকাঠির সোজা দুপাশে বৃত্তের পরিধির পেছনে সবুজ রঙের বিরাট দুটো পরদা। যারা ব্যাটধারী তাঁদের চোখের সোজাসুজি। যদি এই পর্দা দুটো না থাকত তো ব্যাটসম্যান অদ্ধেক বল দেখতে পেত না। ব্যাটধারীর চোখের সামনে শূন্যতা থাকলে এমন খেলার তিন ভাগই মাটি হয়ে যেত। এটা খুবই বৈজ্ঞানিক ব্যাপার—ব্যাটধারীর চোখ ওই পরদায় বাধা পাওয়ায় বোলারের হাতের বল তাঁর চোখে স্বচ্ছ, স্পষ্ট।

এই খেলার নাম ক্রিকেট। যে খেলার সবকিছুতেই বিজ্ঞান মেশানো। শুধু শক্তি দিয়ে দম দিয়ে এ খেলা খেলা যায় না। এর জন্য চাই বিজ্ঞান ও শিল্পকে একত্রে মেশানো। চাই খেলোয়াড়ের বৈজ্ঞানিক বোধ।

ব্যাটধারীরই শুধু বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ জ্ঞান থাকলে হবে না। ব্যাটিংই সব নয়। যে বল করবে তারও বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ জ্ঞান থাকা দরকার। বহু ধরনের বল করা যায় : জোরে, আস্তে ঘুরিয়ে, বেঁকিয়ে।

যে জোরে বল করে তাঁকে দ্রুত বোলার বলে। বলটা নতুন অবস্থায় চকচকে

পালিশ করা থাকে। দ্রুত বোলাররা এই পালিশটাকে হাওয়ার গায়ে এমন ভাবে ধাক্কা খাওয়ায় যাতে পালিশের গায়ে বিরুদ্ধ বাতাসের ধাক্কা তাকে শূন্যে বাঁকিয়ে দেয়। ব্যাটধারী সেই বাঁকে ভুল করে এমন ভাবে বলকে মারে যে তা ব্যাট ছুঁয়ে দাঁড়ানো ফিল্ডস্‌ম্যানদের হাতে যায়। পালিশটা উঠে গেলে হাওয়ার আর ধাক্কা খেয়ে বল বাঁকে না। তখন বোলার তাকে বাঁকানোর জন্য অন্য পন্থা নেয়।

ফিল্ডিং ও দলের অধিনায়কের বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গি খেলার গতিবিধিকে পাল্টে দেয়। যখন মাঠের আবহাওয়া ভারী থাকে হাওয়ায় থাকে তীব্রতা এবং বলটি নতুন থাকে তখন এবং পিচে (যে জায়গাটুকুয় দুদিকে কাঠি বা উইকেট পোঁতা থাকে) স্যাঁতসেতে ভাবকে কাজে লাগান। জোরালো বল হাওয়ায় এবং সেলাইয়ে বেঁকে ব্যাটধারীকে প্রতিটি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয়। এই সময় অধিনায়ক ফিল্ডিং বৃত্তকে ছোট করে আনেন। ব্যাটধারীর পেছনে ডানদিকে কোণাকুণি চারজন লোক রাখেন অর্ধবৃত্তাকারে। বাঁ-দিকে পায়ের কাছে দুজন ও বাঁ-দিকে কর্ণ টানলে যেখানে রেখা যেতে পারে সেখানে একজন। এদের প্রভাব কাটিয়ে ব্যাটধারীকে রান করতে হয়। এখানে মনোবিজ্ঞানকেও প্রয়োগ করা হয় চাপ সৃষ্টি করবার জন্য।

দ্রুত বোলাররা এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ বল করতে পারে না। তারা হাঁপিয়ে যায় অথবা বল পুরোনো হয়। পুরনো বলে সুইং জোর হয় না। পরিবর্তন করতে হয় বোলারের। পুরনো বলে বল করেন স্পিনাররা। এরা হাতের আঙুল বা কব্জির মোচড়ে বলকে মাটিতে পড়বার আগে পাক দিয়ে দেন। বলের সেলাইকে মাটিতে ফেলেন না স্পিনাররা, শরীরকে ফেলেন ; মাটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পাক থাকায় বল যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে না গিয়ে বিপরীত দিকে ধাওয়া করে। ভাসতে ভাসতে আসে।

ব্যাটধারী সময় ঠিক করতে ভুল করে। ঠকে যায়। বল তাকে ফাঁকি দিয়ে উইকেট ফেলে দেয় কিংবা পাক ধরা বল ব্যাট ছুঁয়ে উপরে ওঠে।

ক্রিকেট খেলা অনবদ্য বিজ্ঞানসম্মত। জ্যামিতির সবটুকুই যেন এই খেলার দেহকে ঘিরে রয়েছে। প্রতিটি মারে রয়েছে সময়জ্ঞান ও পরিমিতি বোধ। বোলার চায় সব সময় ব্যাটধারীকে বিভ্রান্ত করতে—ব্যাটধারী চায় সব সময় বোলারের ওপর প্রাধান্য বিস্তারে। ফিল্ডারদের সাজানো হয় বৈজ্ঞানিক ছক অনুযায়ী। তারা বল ছোঁড়ে ধরে দৌড়ায় সবই অভ্রান্ত বিজ্ঞাননির্ভর ভাবে। তাই ক্রিকেটে এত মজা।

হাঙ্গর

সমরজিৎকর

অদ্ভুত ব্যাপার!

শেষ পর্যন্ত কিনা হাঙ্গর নিয়ে এমন পাগলামী?

রোমের লিয়োনার্দো দা ভিনসি বিমান বন্দরে বসে কথাটা ভাবতে গিয়ে, কী বলবো, আমার নিজেরই মাথা খারাপ হওয়ার মত অবস্থা।

হ্যাঁ, একবার আড় চোখে দেখে নিলাম আমার পাশের সেই লোকটিকে। যেন আস্ত একটি হিমালয় পাহাড়। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট। কোমর? তা ইঞ্চি সত্তর হবে। গায়ে হলদে ডোরাকাটা একটি বুশ শার্ট। পরনে ফিকে নীল ট্রাউজার। আর মুখখানায়, ইটালীয়ানদের যেমন সচরাচর দেখায়, একেবারে গোবেচারা। সত্যিই বড় করুণ মনে হচ্ছিল তাঁকে।

কিন্তু গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে লোকটি আমাকে প্রায় পাগল করে তুলেছে। একটু সুযোগ পেলেই সেই এক কথা। হাঙ্গর। অমন পাহাড়ে চেহারা। অথচ এই কিছুক্ষণ আগেও ট্যাকসিতে চড়ে বিমান বন্দরে আসার সময় সে কি হাউমাউ কান্না। আর তার সঙ্গে বার বার এক কথা। ডঃ বাসু, বাঁচান আপনি আমাকে। আমাদের তিন পুরুষের ব্যবসা। উঠে গেলে একেবারে পেট সাহারা মরুভূমি হয়ে যাবে। হাঙ্গরগুলির বজ্জাতি আমি সইতে পারছি না। তারপর কত কথা। উদ্ভট কথাই বলবো। হাঙ্গর নিয়ে আমি গবেষণা চালিয়ে আসছি প্রায় দশ বছর। কই, এমন অভিজ্ঞতা কখনও তো আমার হয় নি?

গতকাল ক্রিস্টোফার তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আমাকে। ক্রিস্টোফার বললো কয়েকদিন তো ছুটি তোমার। একবার ঘুরে এসো ভাই ওঁর সঙ্গে তুমি। আমার ভগ্নীপতি বলেই তোমায় অনুরোধ করছি। আমার ধারণা তুমি গেলে কিছুটা সুফল পাওয়া যাবে। হাঙ্গর নিয়ে ব্যবসা, কোটি টাকার কারবার। ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, বেচারার সত্যিই পাগল হওয়ার মত অবস্থা।

তারপর প্রায় পাঁচবার এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আর যত বার তাঁর কথা শুনেছি, আমার বুদ্ধি যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। জানি না কেন,

শেষ পর্যন্ত আমিও কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। তারপর এই যে, তাঁর সঙ্গে চলেছি এখন সিসিলি দ্বীপে। দেখা যাক, বরাতে কী আছে আমার। পাঁচ পাঁচটি জাহাজের মালিক। হাঙ্গরের ফলাও কারবার। এমন জাত বড়লোকের কথা তো আর চট্ করে ঠেলে দেওয়া যায় না ?

বিমান বন্দরে এসে প্রথমে কাস্টম চেকিং। তারপর প্রায় চল্লিশ মিনিট নিশ্চুপ লাউঞ্জে বসে। আল ইটালীয়ার এখনও ঘন্টাখানেক দেরি। ভূমধ্যসাগরে হঠাৎ নাকি ঘূর্ণী ঝড় বয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। তার জন্যেই এই দেরী।

লাউঞ্জে ঢোকার পর চোখের পুরু গভীর কালো চশমা এঁটে সেই যে বসে পড়লেন তিনি, এই চল্লিশ মিনিট আর কোন কথা নেই। শেষ পর্যন্ত আমিই নীরবতা ভাঙলাম।

কী নাম যেন আপনার, স্যার ? কিছু মনে করবেন না। কারোর নাম পাঁচবার না শুনলে আমার মনে থাকে না। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আলবার্তো কার্ডিনি। উনি বললেন। যেন দশ বছরের রোগীর কণ্ঠস্বর।

ধন্যবাদ। তা সিনর কার্ডিনি, আপনার কথাগুলি ভূতের গল্পের মতই মনে হচ্ছে আমার কাছে। এমন উদ্ভট কাণ্ড এর আগে আর কখনও শুনিনি। সত্যিই কি আপনি ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন ? আমার প্রশ্ন।

আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে উঠলেন কার্ডিনি। তাঁর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়লো হতাশ'র চিহ্ন।

বললেন, আপনিও তা হলে আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, ডঃ বাসু ?

ঠিক অবিশ্বাসের কথা নয়, সিনর। আসলে গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে যা আপনি আমাকে বোঝাতে চাইছেন, তার সব কিছুই আমার মগজকে কেমন তালগোল পাকিয়ে তুলেছে। আমার উত্তর।

জানি। আপনার মত আরও অনেকেরও হয়ত তাই হবে। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখেছি, আপনি যদি মনে করেন, এই যে আপনার চোখের সামনেই বসে রয়েছি আমি, সেটাও মিথ্যে, তা হলে পাজী সেই হাঙ্গরগুলিও মিথ্যে। বললেন আল-বার্তো। হঠাৎ থেমে পড়লেন তিনি। মুহূর্তে তাঁর চোখ দুটি পাথরের মতো স্থির হলো।

লাউঞ্জের যে কোণটায় আমরা নিরিবিলি বসে কথা বলছিলাম, ঠিক তার উল্টোদিকে প্রায় কুড়ি ফুট দূরে একটি আসনের দিকে চাইলেন তিনি।

লোকটাকে দেখছেন, ডঃ বাসু? তাঁর কথায় আমি চমকে উঠলাম।

ওই যে। ওই কোণটায়। খবরের কাগজে মুখ আড়াল করে কেমন আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। দেখলে মনে হবে কী মন দিয়েই না খবর পড়ছে। কিন্তু আমার ভুল হয় নি। ওর চোখ দুটি আসলে আমার উপর। এই নিয়ে তিনবার দেখলাম। পরশু বিমান বন্দরে একই প্লেন থেকে নেমেছি আমরা। পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে ওর গা একবার আমার গায়ের সঙ্গে ঘষেও গিয়েছিল। তারপর গতকাল দেখেছি। যখন সন্ধ্যের দিকে আপনার সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলাম তখন। আপনার হোটেলের সামনেই রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিল। আর, এই এখন। পল, পল মরগ্যান ওর নাম। আমার চিরশত্রু পিটারের ম্যানেজার। তারও মাছের কলাও কারবার। কাল বুঝতে পারি নি। এখন মনে হচ্ছে ছোকরা একটা মতলব নিয়ে আমার পেছনেই লেগে রয়েছে।—না। আর কথা নয়। ভূমধ্য সাগরের জলে ডুবে আমি মরি, পিটার তো এটাই চায়। তাই লোক লাগিয়েছে আমার পেছনে।

আলবার্তোর কথা শুনে এবার সত্যিই আমি অবাক হলাম। একবার চাইলাম সেই কাগজমুখো লোকটির দিকে। তার মুখটি তখন পুরোপুরি কাগজের আড়ালে থাকায় দেখা সম্ভব হলো না।

মনে একটা রহস্যের স্বাদ পেলাম আমি। একটু শঙ্কিতও যে হলাম না, তা বলবো না। মাছের যত শক্তি যেমন জলে, শুনেছি এই জাহাজীদেরও যত পরাক্রম ওই সমুদ্রে। জাহাজ থেকে ডাঙায় নামার পর নাবিকরা সব ভেজা বেড়াল। কিন্তু জাহাজে উঠে সমুদ্রে ভাসলেই এক একজন বাঘ। কী জানি বাবা, ক্রিস্টোফারের কথায় আলবার্তোর সঙ্গে তো চলেছি। কী ভাগ্যে আছে কে জানে?

মাথার উপর শোনা গেল ঘোষিকার কণ্ঠস্বর। আল ইটালিয়ার ফ্লাইট নাম্বার ১০৩ যাত্রীদের বলছি। আপনাদের প্লেন প্রস্তুত। দয়া করে এবার প্লেনে আসুন আপনারা। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আবহাওয়া এখন ভালো। ধন্যবাদ।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো গুঞ্জন। যাত্রীরা সবাই লাউঞ্জের বাইরে যাওয়ার দরজার সামনে লাইন দিয়ে এগোতে শুরু করলো। দরজার দু পাশে স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে পাহারাদার। এই এক ফ্যাসাদ হয়েছে আজকাল। বিমান ছিনতাই-এর

দরুণ কড়া ব্যবস্থা। ছিনতাইকারীদের রোখার জন্যে বিমান বন্দরগুলো যেন সেনা-নিবাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্লেনে গিয়ে উঠলাম আমরা। আমি আমার জানালার পাশের আসনে গিয়ে বসলাম। আলবার্তো বসলেন আমার পাশে। ডি সি ৮ প্লেন। ব্যবস্থা ভালো।

মিনিট দশেকের মধ্যে প্লেন আকাশে উড়লো। জানালার ভেতর দিয়ে দেখলাম রোম শহরকে বাঁ পাশে ফেলে আমরা দক্ষিণ পশ্চিম বরাবর সরাসরি আকাশ পানে উঠে যাচ্ছি। নীচে ভূমধ্য সাগর। সেখানে ভেসে চলেছে জাহাজের সারি।

নীচের দৃশ্য দেখতে দেখতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার বাহুতে ঈষৎ খোঁচা। আলবার্তো আমার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, বদমাইশটা আমাদের পেছনেই বসে রয়েছে।

বদমাইশ? চমকে উঠলাম আমি।

পল। বললেন আলবার্তো।

ও! মুচকি হেসে আমি পেছন দিকে চাইলাম। দেখলাম আলবার্তোর পেছনের আসনে একজন বসে। তবে বিমান বন্দরের মত এখানেও মুখটি তার কাগজের আড়ালে ঢাকা।

এরপর বিশেষ আর কথা হয়নি। আলবার্তোর সঙ্গে। যথাসময়ে আমরা সিসিলি পেঁছিলাম।

আলবার্তো বললেন, এবার লঞ্চে চড়ে আমাদের বারো ঘণ্টার মত পথ ভেসে যেতে হবে পশ্চিম দিকে। আমরা এখন যাবো শার্ক দ্বীপে।

শার্ক দ্বীপ? এমন নাম তো শুনিনি কখনও? কৌতূহলী হলাম আমি।

মৃদু হাসলেন আলবার্তো। বললেন, ও আমার ঠাকুর্দার সম্পত্তি। দ্বীপটি তিনিই ইজারা নিয়েছিলেন। প্রায় তিন বর্গমাইল এলাকার ছাড়া এই দ্বীপের বাসিন্দা বলতে আমরাই। মানে আমি এবং আমার কর্মচারীরা। দ্বীপটিতে জাহাজ রাখার ভালো ব্যবস্থা আছে।

আলবার্তোর নিজের লঞ্চে চড়েই রওনা হলাম। এবং শার্ক দ্বীপে গিয়েও পেঁছিলাম শেষ পর্যন্ত। গিয়ে দেখলাম, এলাহি ব্যাপার। ঝাউ, মেপল, বার্চ, ইউক্যালিপটাসের বন। মাঝে মাঝে আঙুরের ক্ষেত। এক পাশে বিরাট

কারখানা আলবার্তোদের। বন্দরে দাঁড়িয়ে পাঁচ-পাঁচটি জাহাজ। মাছ ধরার জাহাজ। মাঝি-মাল্লা এবং অন্যান্য কর্মীদের ভিড়।

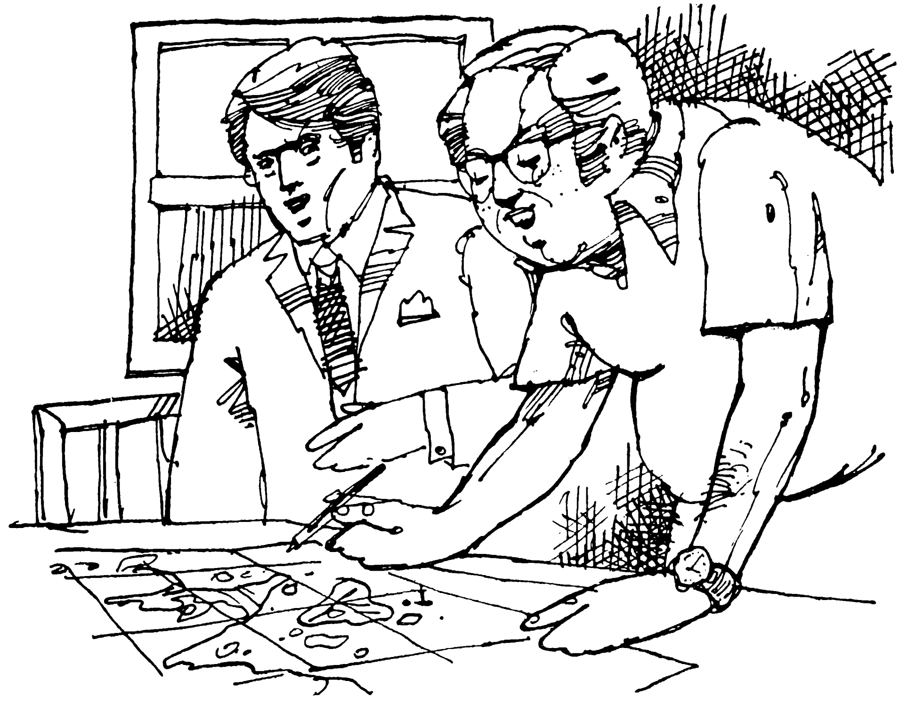

আলবার্তো টেবিলের উপর একটা ম্যাপ বিছিয়ে ধরলেন

লঞ্চ থেকে নামতেই দেখলাম সবার মধ্যে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। আলবার্তো আমাকে সরাসরি নিয়ে গিয়ে তুললেন তাঁর বাংলোয়। সেখানে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম, ভূমধ্য সাগরের বুকে তখন সন্ধ্যের ছায়া। লক্ষ্য করলাম, এখানে পেঁৗছানোর পর আলবার্তো যেন বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। রোমে যেমন ভেঙে পড়ার মত মনে হয়েছিল, এখন মনে হলো রীতিমত চট্পটে হয়ে উঠেছেন তিনি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম। আলবার্তো এবং আমি নিভৃতে বসে কফি পান করতে যেটুকু সময় গেল। এই যা। তারপর যে যার ঘরে গিয়ে স্নান সেরে নিয়ে রাত আটটার মধ্যে ডিনার শেষ করলাম।

এবার আমরা কিছু কথাবার্তা বলে নিই, কেমন? চলুন, আমরা বরং গিয়ে স্টাডিতে বসি, ডঃ বাসু। বললেন আলবার্তো।

বেশ তো। চলুন। বললাম আমি।

স্টাডিতে গিয়ে বসলাম আমরা।

আলবার্তো টেবিলের উপর একটি ম্যাপ বিছিয়ে ধরলেন। তারপর একটা লাল পেনসিল দিয়ে ম্যাপটাকে বোঝাতে শুরু করলেন তিনি।

এই যে, এখানটা দেখুন। এই হলো গিয়ে শার্ক দ্বীপ। মানে আমরা এখন যেখানে বসে রয়েছি। আর এই যে, এই অঞ্চলে রয়েছে ছোটখাটো বহু দ্বীপ। শার্ক থেকে এই দ্বীপগুলির দূরত্ব প্রায় তিরিশ কিলোমিটার। প্রচুর ডুবো পাহাড় আছে এখানে। ফলে জিব্রালটারের দিকে যে সব জাহাজ চলে, তারা এই অঞ্চলটা এড়িয়ে যায়। মোট চল্লিশটা দ্বীপ। এদের মধ্যে এই যে—এখানে আছে তিনটা হেলিকপ্টর।

হেলিকপ্টর কেন? আমার কণ্ঠে বিস্ময়।

কেন? মাছের আনাগোনা লক্ষ্য করার জন্যে আমি হেলিকপ্টরের ব্যবস্থা করেছি ডঃ বসু, হেলিকপ্টারে থাকে আধুনিক যন্ত্রপাতি। ওই যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমরা আগে থেকে দেখে নিই ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় সমুদ্রের স্রোত কেমন। কোথায় এক ধরনের বোয়াল জাতীয় মাছ ভীড় করছে। এ সব মাছ হাঙ্গরের খাবার। খুব পছন্দ করে। হাঙ্গরের ঝাঁক এদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। হেলিকপ্টরে আছে ইনফ্রা-রেড ক্যামেরা। এই ক্যামেরায় রাতের অন্ধকারেও হাঙ্গরঝাঁকের ছবি তোলা যায়। আর হ্যাঁ। এই হলো সেই জায়গাটা, এখন যেখানে হাঙ্গর ধরার কাজ চলছে।

আপনার সব কাণ্ডকারখানা শুনে আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি, সিনর।

না না। আরও আছে, ডঃ বাসু। লক্ষ্য করেছি হাঙ্গরের পাল মাঝে মাঝে কোথায় যেন উধাও হয়। সেটা আবিষ্কারের জন্যে একটা ডুবো জাহাজের ব্যবস্থা করেছি আমি। কী বজ্জাত, মশায়, কম লুকোচুরি খেলা খেলে ওরা আমাদের সঙ্গে? এই যে জায়গাটা দেখছেন না? সমুদ্রের নিচে এক সময় ছিল আগ্নেয়গিরি। তা বেশ কয়েকটি হবে। সেই সব আগ্নেয়গিরির এক একটি বড় বড় গহ্বরের মধ্যে বাস করে নানা রকম মাছ। দেখলাম, ওদিক দিয়ে মাঝে মাঝে চোরা স্রোত বয়ে যায় বিপজ্জনক স্রোত, মশায়। তার মধ্যে নৌকো পড়লে আর রক্ষে নেই আমরা আবিষ্কার করলাম, ওই স্রোত যখন আসে, হাঙ্গরের দল তখন ওই গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কালই তো যাচ্ছি এখানে। চলুন, গিয়ে আরও অবাক হবেন।

পরদিন আমরা ব্রেকফাস্ট সারলাম সকাল আটটার মধ্যে।

স্পিড্ বোট তৈরি, সিনর। সকাল সাড়ে আটটার সময় এসে জানালেন স্পিড বোটের পাইলট পিটার।

ধন্যবাদ। চলো, আমরাও প্রস্তুত। বলেই উঠে পড়লেন আলবার্তো—আসুন, ডক্টর। ডাকলেন আমাকে।

বাংলো থেকে বেরিয়ে আসতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস মনটাকে দারুণ প্রফুল্ল করে তুললো। আজকের আবহাওয়াও দারুণ মনোরম। পরিষ্কার আকাশ মাথার উপর। সামনে নীল সমুদ্র। এক ঝাঁক সিগাল তাদের শুভ্র ডানা মেলে সোরগোল তুলে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। শান্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে ছুটে চললো স্পিড বোট।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক টহল দিলাম আমরা।

আলবার্তো দেখিয়ে দিলেন, কোন কোন জায়গায় তিনি হাঙ্গর ধরেন।

দেখলাম, হাঙ্গরের পক্ষে বেশ স্বর্গই এই জায়গাটা। পরিষ্কার জল। মৃদু স্রোত। জলজ গাছপালাও চোখে পড়লো বিস্তর। তার মানে, যে সব মাছ খেয়ে হাঙ্গর বেঁচে থাকে, তাদের পক্ষেও জায়গাটা খুবই উপযুক্ত বলে মনে হলো।

আলবার্তোর সেই খুদে খুদে দ্বীপগুলিতে পৌঁছলাম দেড়টা নাগাদ। তারপর লাঞ্চ।

তা ভালই খেলাম লাঞ্চ। রোল, মাখন, টুনা মাছের স্যালাড, হাঙ্গরের চপ এবং সারডিনের রোল। তোফা খাবার। লাঞ্চের পর বসল মিটিং।

মিটিং-এ আলবার্তো এবং আমি ছাড়াও যোগ দিলেন আরও তিনজন। কামিলো, লুই এবং গিয়াক্কিনি। কামিলো বছর তিরিশের যুবক। খুব ফুর্তিবাজ মনে হলো তাঁকে দেখে। মাছ ধরার ব্যাপারে তিনিই প্রধান পরিচালক। লুই-এর উপর দায়িত্ব জাহাজ পরিচালনার। ওঁর বয়েস বছর চল্লিশ হবে। কিছুটা রাশভারি লোক। আর গিয়াক্কিনি হলেন মৎস্য বিজ্ঞানী। বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ। আলবার্তো আমার সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আলোর সংকেত দেবার মালিক আমাদের এই গিয়াক্কিনি, বুঝলেন কী না, ডঃ বাসু। বললেন আলবার্তো।

আলোর সংকেত মানে? আমার প্রশ্ন।

আলো দিয়েই তো মাছ ধরি আমরা। আলবার্তোর উত্তর।

তাজ্জব ব্যাপার। জাপানে আলোর সাহায্যে মাছ ধরে কেউ কেউ শুনেছি। তবে চোখে দেখিনি।

এবার নিজের চোখে দেখবেন।

হ্যাঁ, সেদিন রাতেই দেখলাম আলোর কারবার।রাত তখন প্রায় বারোটা।

আলবার্তোর সঙ্গে রওনা হলাম মাছ ধরার অপারেশন দেখতে। সে কী কাণ্ড!

বড় বড় দুটি জাহাজ। সমুদ্রের বুকে প্রায় এক কিলোমিটারের মত ব্যবধানে জাহাজ দুটি দাঁড়িয়ে। একটি জাহাজ থেকে গোটা দশেক ছোট ছোট বোট নামিয়ে দেওয়া হলো। প্রত্যেকটি বোটে চারটে করে বড় বড় রীল। ইলেকট্রিক কোম্পানির তার জড়ানো রীলের মত। সেই রীলের গায়ে জড়ানো রয়েছে নাইলনের কর্ড। কর্ডের সঙ্গে দুই মিটার ব্যবধানে ছোট ছোট কর্ড আটকানো। তাদের সঙ্গে বঁড়শি। বঁড়শির ডগায় ছোট ছোট এক ধরনের মাছ গেঁথে দেওয়া হলো। মাছগুলি দেখতে বোয়ালের মত। প্রত্যেকটি বঁড়শি লম্বায় প্রায় দশ সেন্টিমিটারের মত। তার পেছনে লাগানো নীল রঙের এক একটি বল। ব্যাস প্রায় পাঁচ মিলিমিটার। বোটগুলি সারিবদ্ধভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দ্বিতীয় জাহাজের দিকে। লম্বা কর্ডের সঙ্গে ঝোলানো এক একটি বঁড়শি নেমে গেল জলের ভেতর। মনে হলো বঁড়শিগুলি ঝোলানো হয়েছে প্রায় মিটার চারেক লম্বা নাইলনের সুতোর ডগায়। বোটগুলি দ্বিতীয় জাহাজে পৌঁছে কর্ডগুলি ওই জাহাজের গায়ে লাগানো এক একটি পুলির সঙ্গে আটকে দেওয়া হলো। তার মানে, উভয় জাহাজের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো একশটি কর্ড। আর সেই সব কর্ড থেকে অজস্র বঁড়শি ঝুলে রইলো জলের ভেতর।

ব্যাপারটা বুঝলেন তো, ডঃ বাসু? প্রশ্ন করলেন আলবার্তো। তাঁকে খুব স্মার্ট মনে হলো তখন।

বুঝলাম। হাঙর ধরার বঁড়শি ফেললেন জলে। আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ওই যে, ছোট ছোট বল দেখলেন না, ওগুলি এক একটি টুনি। কর্ডের সঙ্গে তার লাগানো রয়েছে। জলের মধ্যে ওগুলি কিছুক্ষণ পরেই জ্বালিয়ে দেব আমরা। সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে জ্বলে উঠবে ওই টুনি। টুনি থেকে বেরোবে বিশেষ ধরনের বেগুনী আলো। ওই আলো হাঙরদের আকর্ষণ করবে। আলোর আকর্ষণে তারা দলে দলে এগিয়ে আসবে বঁড়শির কাছে। আর তখন পাবে লোভনীয় ওই বোয়ালের

মত মাছ। সঙ্গে সঙ্গে খাবলা। তারপরই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে ?

জানি। বঁড়শির ডগায় গেঁথে যাবে এক একটি হাঙর। আমার উত্তর।

না। আরও একটু আছে। আমরা কোন রিস্‌ক নিতে চাই না। আরও একটি ব্যাপার করবো আমরা। একটু পরেই দেখতে পাবেন কী করি।

কর্ডগুলি দুই জাহাজের মধ্যে খাটাতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল।

বোটগুলি এগিয়ে এলো আমাদের জাহাজের সামনে।

এবার দেখলাম, একটি করে পিপে নামিয়ে দেওয়া হলো প্রত্যেকটি বোটে। পিপের মধ্যে এক ধরনের তরল পদার্থ।

আলবার্তো বললেন, বঁড়শির ডগায় যে মাছ দেখলেন না, এই সব পিপের মধ্যে রয়েছে সেই মাছের নির্যাস। আমাদের নির্দেশ পেলেই বোট থেকে ওই নির্যাস কর্ডগুলির আশপাশে ছড়িয়ে দেবে বোটের লস্কররা।

সে আবার কি ? আমার কণ্ঠে বিস্ময়।

বলেছি না আপনাকে, আমরা রিস্‌ক নিতে চাই না ? অনেক সময় শিকার সামনে পেলেও হাঙররা আক্রমণ করে না, ডঃ বাসু। তখন তাদের উত্তেজিত করতে হয়। তাই এই নির্যাস জলে ঢালার ব্যবস্থা করেছি আমরা। দুরকমের নির্যাস আছে এই সব পিপেয়। ওই বোয়াল মাছের নির্যাস এবং হেরিং মাছের নির্যাস। কারণ কোন কোন বঁড়শির ডগায় টোপ হিসেবে হেরিংও গেঁথে দিয়েছি। বললেন আলবার্তো।

এলাহি কাণ্ডই বটে !

তাহলে সব কিছুই পাকা হয়ে গেল। এবার আসুন অপারেশন শুরু করা যাক। ভবিষ্যৎ কি, আমার জানা আছে। মানে সব ফাঁকা। তবু ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস করুন আপনি, এটুকুই আমি চাই। বলেই একে একে নির্দেশ দিলেন তিনি।—লুই, তুমি জাহাজের ভার নাও। হ্যাঁ, কামিলো আলোর সংকেত চালু করবে তুমি,—দাঁড়াও। হাতঘড়িটা একবার দেখে নিলেন আলবার্তো। তারপর বললেন, বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। এর মধ্যেই আমরা নিচে নেমে প্রস্তুত হতে পারবো। তুমি ঠিক বারোটায় কাজ শুরু করবে। ব্যস ! এবার আসুন, স্যার !

ওই মোটা শরীর নিয়ে দেখলাম কী ছোটাই ছুটতে পারেন আলবার্তো। তাঁর

সঙ্গে গিয়াক্কিনি এবং আমি ডেকের এক দিকে এগিয়ে গেলাম। ডেক তো নয়, যেন আস্ত একটি কারখানা। হাঙ্গরের মাংস কাটা, তেল নিংড়ে নেওয়া থেকে তাদের এনে প্যাক করা—সব ব্যবস্থাই আছে সেখানে।

ডেকের ডগার কাছে যেতেই—বাবা! ডুবো জাহাজও দেখছি একটা। মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে এলো আমার।

ঠিক ধরেছেন। এই ডুবো জাহাজে চড়েই আমরা নিচে নামবো। মন্তব্য করলেন আলবার্তো।

ছোট্ট ডুবো জাহাজ। জন ছয়েক বহন করতে পারে।

আমরা গিয়ে তার খোলের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

পরমুহূর্তেই বুঝলাম ডুবো জাহাজটি ধীরে ধীরে জলের উপর নেমে গেল। উভয় পাশে পাঁচটি কাঁচের জানলা। তাদের পাশে একটি করে আসন। তিন জন তিনটি আসনে বসলাম। আলবার্তো বসলেন আমার কাছে।

আলবার্তোর নির্দেশে জেরালড্ ডুবো জাহাজটি জলের নিচে নামিয়ে নিলো প্রায় চার মিটার গভীরে। জেরালড্ ডুবো জাহাজের পাইলট।

মিনিট দশ বিরতি। আর তারপর। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। পীচের মত কালো অন্ধকার পরিবেশ যেন হয়ে উঠলো দেওয়ালির রাত। বিচিত্র এক ধরনের বেগুনী আলোর সারি। আলোর বাল্বগুলি একে একে জ্বলে উঠলো।

এবার কি আমরা এগিয়ে যাবো, সিনর? জেরালড্ জিজ্ঞেস করলো।

এগোও। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন আলবার্তো। শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালানোর ঠিক পূর্বমুহূর্তে সেনাপতির কণ্ঠস্বর যেমন হয়, আলবার্তোর কণ্ঠস্বর তেমনই।

ব্যাপারটা এবার আপনি লক্ষ্য করুন, ডঃ বাসু। বললেন আলবার্তো।

ডুবো জাহাজের মধ্যেকার আলো টিমটিমে করা হলো। ধীর গতিতে এগিয়ে গেলাম আমরা। মিনিট পনের হবে তারপর।

হায় ভগবান! কী অপূর্ব ব্যাপার। সেই বেগুনী আলোর ফুলকির মধ্যে পরিষ্কার দেখতে পেলাম—হ্যাঁ, হাজার হাজার হাঙ্গর। রূপোর মত চকচকে গা। লম্বায় এক একটা সাত-আট ফুট হবে। কী ভয়ঙ্কর হাঁ রে বাবা! চোখগুলি জ্বলজ্বল করছে ওদের। যেন জীবন্ত বিভীষিকা এগিয়ে আসছে। প্রথমে ধীর গতিতে।

তারপর, হ্যাঁ, গতি বেড়েছে এবার। শিকার ধরার আগে হাঙ্গরের মধ্যে যে ক্ষিপ্রতা দেখা যায়, তাও দেখলাম। বঁড়শিগুলির কাছে—আরও কাছে এসে পড়েছে তারা।

আমার পাশে পাথরের মত বসে রয়েছেন আলবার্তো।

হায় ভগবান! পরক্ষণেই নিজের কপালে করাঘাত করলেন আলবার্তো।

তাজ্জব ব্যাপার! একই মুহূর্তে আমার কণ্ঠেও বিস্ময়।

পরিষ্কার দেখতে পেলাম হাঙ্গরগুলি বঁড়শির টোপে খাবলা মারার জন্যে ছুটে এল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালো। আর তারপর—হ্যাঁ, মনে হলো ভীষণ ভয় পেয়েছে যেন। পরমুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে একেবারে পিছন পানে দে ছুট!

বিশ্বাস হলো তো, ডঃ বাসু? বললেন আলবার্তো।

দেখলাম। আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

সে রাতে জাহাজের কেবিনে ফিরে এসে ঘুমনোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুমতে পারলাম না। সারারাত মাথার মধ্যে শুধু হাঙ্গরই ঘোরাফেরা করতে লাগলো। হাঙ্গরগুলি কি ভয় পেয়েছিল তখন? যদি পেয়ে থাকে, কেন পেল? ভাবতে গিয়ে একটা কথা মনে হলো আমার। এ অঞ্চলে এমন কোন জলজ প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেনি তো, যাদের হাঙ্গর ভয় পায়। পৃথিবীটাই তো খাদ্য-খাদকের ব্যাপার। এক ধরনের প্রাণী আর এক ধরনের প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে আবার তাকে খেয়ে বেঁচে থাকে অপর প্রাণী। এই তো পৃথিবীর নিয়ম। হেরিং খায় ছোট মাছ। হাঙ্গর খায় হেরিং বা বোয়াল জাতীয় মাছ। কে বলতে পারে, হঠাৎ এই সমুদ্র অঞ্চলে হয়ত এমন কোন প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা হাঙ্গরের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তাদের খাদ্য হাঙ্গর। পেছনে ধাওয়া করছিল। তাদের ভয়েই হাঙ্গরগুলি ওই ভাবে পালিয়ে গেল। পরদিন আলবার্তোকে কথাটা বললাম। ঠিক করলাম, ডুবো জাহাজ নিয়ে এখানকার সমুদ্রের ভেতর অনুসন্ধান চালাবো। সেই মত ব্যবস্থা হলো।

গিয়াক্কিনি, আলবার্তো এবং আমি সমুদ্রে টহল দিলাম পর পর চারদিন। খুব যে গভীর এ অঞ্চলের সমুদ্র তা নয়। সমুদ্রের নিচে দেখলাম বড় বড় গহ্বর—প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে।

আলবার্তো বললেন, এক সময় এগুলো ছিল আগ্নেয়গিরি। ওই গর্তগুলি হলো তার জ্বালামুখ। দেখলাম সেই প্রশস্ত গর্তগুলির মধ্যে নানা রকম জলজ

গাছ। মাছের একেবারে স্বর্গরাজ্য! এখানেই তো হাঙ্গরের বড় ডেরা, তাই তো আমাকে বলেছিলেন, সিনর?

তাই তো জানতাম। কিন্তু এখন তো আর এখানে হাঙ্গরের নাম গন্ধ নেই দেখছি। আলবার্তোর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

তা হলে গেল কোথায় তারা? এই গর্তগুলির মধ্যে সুড়ঙ্গ নেই তো? কোথাও কোথাও পাহাড়ের মধ্যে থাকে সুড়ঙ্গ। প্রকৃতিই সে সুড়ঙ্গ তৈরি করে। তেমন কোন সুড়ঙ্গ এখানে থাকলে হাঙ্গরগুলো তার মধ্যেও গা ঢাকা দিতে পারে?

সমুদ্রের নিচেকার সেই গহ্বরগুলি দেখে ফিরে আসছি যখন, কিছুটা দূরেই চলে এসেছে আমাদের ডুবো জাহাজ—হঠাৎ মনে হলো ওই গর্তের জায়গাটায় বেশ বড় বড় বুদ্‌বুদ্‌। মনে হলো, এক ঝাঁক বুদ্‌বুদ্‌ গহ্বরের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে জেরাল্ডকে বললাম, ভাই, ডুবো জাহাজটি কোন পাথরের আড়ালে স্থির করে দাঁড় করান তো একবার।

দুপুর তখন প্রায় বারোটা। সমুদ্রের গভীরে সূর্যের ফিকে আলো। সেই আলোয় দেখলাম বুদ্‌বুদের ফোয়ারা।

দেখলেন, সিনর? গিয়াক্কিনি, আপনিও দেখছেন নিশ্চয়। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলাম আমি আলবার্তো এবং গিয়াক্কিনির দিকে।

আশ্চর্য! বললেন আলবার্তো।

ডঃ গিয়াক্কিনি, আপনি তো মৎস্য বিজ্ঞানী। এ তল্লাটটায় নিশ্চয় আপনি এর আগে অনুসন্ধান চালিয়েছেন? এমন বড় বড় বুদ্‌বুদ্‌ কি আপনার চোখে পড়েছে?

না। গিয়াক্কিনির উত্তর।—কেন বলুন তো? তাঁর পাল্টা প্রশ্ন।

ভাবছিলাম, জায়গাটায় এক সময় আগ্নেয়গিরি ছিল তো। অতএব এখানকার ভূস্তরে কিছু কিছু ফাটল থাকা স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় ওই ফাটল দিয়ে পৃথিবীর গভীর অঞ্চল থেকে নানা রকম গ্যাস বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। সেই গ্যাসের জন্যেই এ ধরনের বুদ্‌বুদ্‌ দেখা দিতে পারে। বললাম আমি।

তেমন এখানে কখনও আমি দেখিনি, ডঃ বাসু। বললেন গিয়াক্কিনি।

• কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে আমার। মনে মনেই বললাম কথাটা।

জেরাল্ড বললো, সিনর, ডুবো জাহাজটি অনেকক্ষণ জলের নিচে রয়েছে। জাহাজটি বরং একটু জলের উপর ভাসিয়ে নিই, কেমন? জাহাজের খোলে বদ্ধ হাওয়ার গুমোট। উপরকার তাজা বাতাসে মনটা একটু ঝরঝরে করে নেওয়া দরকার।

তাই বরং কর। জলের নিচে বেশিক্ষণ এভাবে ডুবে থাকতে আমার ভালো লাগে না। বললেন আলবার্তো।

ডুবোজাহাজ জলের উপর ভেসে উঠতেই রাগে গজরাতে লাগলেন আলবার্তো।

—দেখুন, দেখুন, ডঃ বাসু। পাজিটা যেন ছিনে জোঁক হয়ে লেগে রয়েছে আমাদের পেছনে। বলেই অদূরে ভাসমান একটি মোটর লঞ্চের দিকে আঙুল দেখালেন তিনি।—লক্ষ্য করুন। পল। ওই যে পল দাঁড়িয়ে লঞ্চের ডেকের উপর। নির্ঘাৎ ও পলই। আমার ভুল হতে পারে না। চোখের উপর সাঁটা দূরবীনটি তিনি এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

তা হলে এই হলো আপনার পল। দূরবীনটি চোখের উপর সেঁটে কথা বললাম আমি।—খুব চটপটে ছোকরা তো? কী করছে ওখানে? দাঁড়ান, দাঁড়ান। লঞ্চ থেকে একটি কাছি জলের মধ্যে নেমে গেছে না? কাছিই তো। একটি পুলির সাহায্যে কাছিটি তুলে নিচ্ছে একটি লোক, পল তার পাশে দাঁড়িয়ে। কী ব্যাপার বলুনতো, সিনর আলবার্তো?

আমার মাথা আর মুণ্ডু! কে জানে কী করছে ও ওখানে। প্রায়ই তো দেখি একটি লঞ্চ নিয়ে পল ঘোরাফেরা করে ওখানে। রাগে গরগর করতে লাগলেন আলবার্তো।—ব্যাটা আস্ত শয়তান। ওই তো ভাগিয়ে নিয়ে গেল সামুয়েলকে।

সামুয়েল? সে আবার কে? আমার জিজ্ঞাসা।

ভারী ভালো ছেলে ছিল, মশায়। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস হলে কী হবে। দু বছর আমার জাহাজে ছিল। প্যারিতে ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। হাঙ্গরের নাড়ি-নক্ষত্র ওর জানা। বলতে কী, হাঙ্গর ধরার বহু নতুন পদ্ধতি ওর কাছেই আমরা জেনেছি! বছর দুই এ কারবার আমার ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। তারপর কী যে হলো। এক দিন এসে বললো, 'আমার আর কাজ করতে ভালো লাগছে না,

সিনর।' বলেই চাকরি ছেড়ে চলে গেল। পরে শুনেছি, ও পলের সঙ্গে রয়েছে।

হঠাৎ মনে হলো, সামুয়েল —নামটা কেমন যেন চেনা চেনা। মাদ্রিদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একবার আলাপ হয়েছিল একজনের সঙ্গে। আলবার্তো যে বয়েস বললেন, ওই রকমই বয়েস হবে তার। জিব্রালটারের মুখে বছর পাঁচ হাঙ্গরের উপর গবেষণা করে দারুণ নাম করেছিল সে। এই সামুয়েল সেই সামুয়েল নয় তো?

মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সেরা হাঙ্গর বিশেষজ্ঞ, হ্যাঁ সামুয়েল তার নাম—একবার আমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। মানে—

ঠিক তাই! সামুয়েল তো মাদ্রিদেই ছিল বহুকাল। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দিলেন আলবার্তো।

সত্যি? আমার কণ্ঠে চমক।

কী ব্যাপার বলুন তো, ডঃ বাসু? গিয়াক্কিনির প্রশ্ন।

না। মানে—

মুহূর্তে চমকে উঠলাম আমি। আরে।—আরে। দেখুন তো ডঃ গিয়াক্কিনি, পলের লঞ্চের পাশে একটা কালো রঙের কী যেন ভেসে উঠলো না? বলেই আমার দূরবীনটি এগিয়ে দিলাম গিয়াক্কিনির দিকে।

গিয়াক্কিনি দূরবীনটি চোখে সেঁটে একবার ব্যাপারটা দেখে নিয়ে বললেন, একটা ডিমের মত কালো রঙের কী যেন। পল কাছি ধরে সেটি জলের উপর তুলে নিচ্ছে।

দেখি, দেখি? গিয়াক্কিনির হাত থেকে দূরবীনটি নিয়ে চোখে লাগালেন আলবার্তো।—ঠিক। কালো ডিমের মতো বটে!

ব্যাথাইস্ফিয়ার! আমার মন্তব্য।

তার মানে? আলবার্তোর জিজ্ঞাসা।

মানে আবার কী? গভীর সমুদ্রের নীচে নামার যান। ওর ভেতরে বসেই তো বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের গভীরে গিয়েই অনুসন্ধান চালায়। বললাম আমি।

তা—ব্যাথাইস্ফিয়ার না কী বললেন তা নিয়ে পল ওখানে কী করছে?

একটু সবুর করুন, সিনর। আপনি ওটার ওপর একটু নজর রাখুন শুধু।

মিনিট তিন বিরতি। তারপর প্রায় চিৎকার করেই যেন উঠলেন আলবার্তো।—

আরে আরে! এ যে সামুয়েল। না না, কোন ভুল হয় নি আমার ওই ডিমের ভেতর থেকে সামুয়েলই তো বেরিয়ে এল। তার সঙ্গে আর একজন চিনি না। হ্যাঁ, এই তো, সামুয়েল লঞ্চের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে। পলের সঙ্গে কথা বলছে।

আলবার্তোর হাত থেকে এক ঝটকায় দূরবীনটা ছিনিয়ে নিলাম আমি।— ঠিক। সামুয়েলকেই তো দেখছি।—জেরাল্ড, আপনি ডুবো জাহাজটি এবার জলের নিচে নামিয়ে নিন তো। আমি চাই না, ওরা আমাদের দেখুক।

মুহূর্তে ডুবো জাহাজটি জলের নিচে নামিয়ে নিলো জেরাল্ড।

কী ব্যাপার? জিজ্ঞেস করলেন আলবার্তো।

যদি আমার অনুমান ঠিক হয়, আগামীকালের মধ্যেই আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সিনর আলবার্তো। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলাম।

কী বলছেন, ডঃ বাসু। সত্যিই কি তা সম্ভব হবে? আলবার্তো আবেগে আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরলেন।

সে দিনের মত আমরা জাহাজে ফিরলাম। লাঞ্চের পর কী কী করতে হবে বুঝিয়ে বললাম আলবার্তোকে। কামিলো, লুই এবং গিয়াক্কিনি মন দিয়ে আমার কথাগুলি শুনলেন।

বললাম, মন দিয়ে শুনুন, স্যার। গত কালের মত ঠিক রাত বারোটায় আবার আপনারা হাঙর ধরার ব্যবস্থা করুন। এবার এ দায়িত্বটা আপনারা আপনাদের সহকারীর উপরই দিন। বঁড়শির ডগায় বেগুনি আলো জ্বলার আগে আমরা ডুবো জাহাজে চড়ে এবার কিছুটা দূরত্ব রেখে বঁড়শিগুলির সামনের দিকে অবস্থান করবো। হাঙরগুলি পালাতে শুরু করলেই আমরা অনুসরণ করবো তাদের। সিনর লুই, আপনার কাছে বেশ ভালো একটি ম্যাগনেটোমিটার আছে তো?

আছে। লুই-এর জবাব।

খুব ভালো। আমার উত্তর।

রাত এগারোটার সময় প্রস্তুত হলাম আমরা। বঁড়শিগুলি মাছ গেঁথে আগের রাতের মতই জলের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হলো। আমরা ডুবো জাহাজ নিয়ে জলের ভেতর অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ডুবো জাহাজের জানালার ভেতর দিয়ে যেটুকু ক্ষীণ আলো বাইরে গিয়ে

পড়েছিল সেই আলোয় ভেসে উঠলো হাঙ্গরের মুখ। দুই একটি হাঙর এসে জানালায় ঠোকরও মেরে গেল। কী বীভৎস মুখ!

রাত বারোটা। বঁড়শির ডগায় জ্বলে উঠলো হাজার বাতি।

হ্যাঁ, হাঙ্গরগুলি সারিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আলোর দিকে। এক মিনিট, দুই মিনিট—পাঁচ মিনিট। হ্যাঁ, আলোর কাছাকাছি হয়ে পড়েছে তারা।

আর তারপরই—না। মোটেই ভুল হয় নি আমার। মুহূর্তে মনে হলো আমার সামনে রাখো ম্যাগনেটোমিটারটির কাঁটা হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠলো এবং এক পাশে সরে গেল।

যাক! অনুমান তা হলে আমার মিথ্যে নয়। আমার কণ্ঠে উচ্ছ্বাস।

ডঃ বাসু, ওই দেখুন, হাঙ্গরগুলি পালাচ্ছে। বললেন আলবার্তো।

আমি জানতাম ওরা পালাবে সিনর। বলেই জেরালডের দিকে চাইলাম আমি। বললাম ওদের অনুসরণ করুন।

জেরাল্ড্ ডুবো জাহাজের তীব্র সার্চলাইটটি জ্বেলে দিল। আমরা ছুটে চললাম মাছগুলির পেছন পেছন। কিন্তু হাঙ্গরের গতির সঙ্গেই বা আমরা পারবো কেন? কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা অদৃশ্য হলো।

ঠিক আছে। আপনি এগিয়ে চলুন, জেরাল্ড। হ্যাঁ, ঠিক ওই দিকে চলুন। জেরাল্ডকে আমি নির্দেশ দিয়ে চেয়ে রইলাম ম্যাগনেটোমিটারের দিকে।

হ্যাঁ, ম্যাগনেটোমিটারের কাঁটা আরও সরে যাচ্ছে। তার মানে আমরা আসল জায়গার কাছাকাছি হয়েছি—আরে? এইতো—এইতো সেই ডুবো পাহাড়। এই তো সেই জ্বালামুখ। সেই গহ্বর। বড় বড় বুদ্‌বুদ্ চোখে পড়ল না?

সবাই থ হয়ে বসে আছেন। কথা বলছি শুধু আমি।

জেরাল্ড, গহ্বরটির ব্যাস কতটা হবে, বলতে পারেন? আমার প্রশ্ন।

দুশ মিটার। জেরালডের উত্তর।

ডুবো জাহাজটা কি গহ্বরের মধ্যে নামানো যাবে? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

খুবই বিপজ্জনক কাজ, তবে আমি চেষ্টা করছি। বললেন জেরাল্ড।

গহ্বরের মধ্যে নেমে এলাম আমরা। বেশি নয়। মাত্র কুড়ি মিটার। তারপরই দেখলাম সামনে একটি সুড়ঙ্গ! কী বলবো, নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস

করা যায় না। ডুবো জাহাজের তীব্র আলোয় দেখতে পেলাম অগণিত হাঙ্গর। কী একটা বস্তুর দিকে ভীড় করে ছুটোপুটি করছে।

ডঃ বাসু ! ওই দেখুন—সেই কালো ডিমের মত—কী যেন বলেছিলেন আপনি ? হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন আলবার্তো।

তাই তো ? এ যে ব্যাথাইস্ফিয়ার দেখছি।

জেরালড। লক্ষ্য রাখুন, ব্যাথাইস্ফিয়ার যেন হাতছাড়া না হয়। ডুবো জাহাজটি আপনি ওর পাশে গিয়ে ভেড়ান। নির্দেশ দিলাম আমি।

মুহূর্তে ব্যাথাইস্ফিয়ারটির পাশে ডুবো জাহাজটি ভেড়ালেন জেরালড। পুরু ইস্পাতের তৈরি কালো সেই গোলকের পাশে ছিল একটি জানালা। জানালায় কার যেন মুখে ভেসে উঠলো। জেরালড আমাদের ডুবো জাহাজের কৃত্রিম হাত দিয়ে ব্যাথাইস্ফিয়ারটিকে আঁকড়ে ধরে রইলেন।

চার পাশের সার্চ লাইটগুলি জ্বালিয়ে দিন, সিনর লুই।

লুই আলো জ্বালালেন। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের সব কিছু দিনের মত পরিষ্কার।

ঠিক। যা ভেবেছিলাম, তাই। চোখের সামনে পর পর কয়েকটি মোটা কেবল। কেবলের মাঝখানে কাটা। তাদের কাটা মুখগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের মধ্যে কিছুটা ফাঁক বজায় রেখে চলেছে। কেবলগুলির অপর প্রান্ত বড় বড় বাক্সের সঙ্গে জোড়া। হাঙ্গরগুলি ওই কেবলের ফাঁকের মধ্যেই ভীড় করেছে।

বুঝলেন, সিনর আলবার্তো ? গোলমালটা কোথায় বুঝলেন তো ?

কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না, ডঃ বাসু। এখানে এমন তার এল কী করে ? হাঙ্গরগুলিই বা করছে কি এখানে ? বিস্ময়ে প্রায় ভেঙে পড়লেন আলবার্তো।

পরে বলছি। সবই বলবো আপনাকে। তার আগে ওই ব্যাথাইস্ফিয়ারটির ব্যবস্থা করা যাক।—হ্যাঁ, জেরালড। ব্যাথাইস্ফিয়ারটির সঙ্গে একটি নাইলনের কাছি লাগানো আছে। ওটা কেটে ফেলে, ব্যাথাইস্ফিয়ারটি আপনার ডুবো জাহাজের আংটার সঙ্গে বেঁধে ফেলুন তো। চলুন, আমিও এ কাজে সাহায্য করছি।

বলেই আমরা ডুবুরির পোশাক পরে ডুবো জাহাজের বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপর কাছি কেটে ব্যাথাইস্ফিয়ারটি বেঁধে দিলাম ডুবো জাহাজের বাইরে লাগানো

একটি আংটার সঙ্গে। কাজ সেরে ডুবোজাহাজের খোলের মধ্যে ঢুকে জেরাল্ডকে বললাম, উপরে ভাসান আপনার জাহাজ।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই জাহাজ সমুদ্রের উপর ভেসে উঠলো। আর সেই মুহূর্তেই লক্ষ্য করলাম, অদূরে একটি মোটর লঞ্চ। দ্রুত ছুটে চলেছে। আমি যদি ভুল না করি, তাহলে বলবো, আপনার পল পালিয়ে যাচ্ছে।

বলতে কি, আলবার্তো এতক্ষণ হতভম্বের মত বসেছিলেন যেন। লুই এবং গিয়াক্কিনি যেন পাথরের মূর্তি। আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই এত দ্রুত এবং অভাবিত ভাবে ঘটে গেল যে, কি যে হচ্ছে সেটা বোঝার মত অবস্থাও তাঁদের ছিল না।

জেরাল্ডকে বললাম, জাহাজে চলুন। তারপর নিশ্চুপ বসে রইলাম আমি।

জাহাজে যখন ফিরলাম, তখন ভোরের আলোয় চারদিকটা পরিষ্কার।

ডুবো জাহাজটি তুলে নেওয়া হলো ডেকের উপর।

আমি ব্যাথাইস্ফিয়ারটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার উপরকার দরজাটি খুলে ফেললাম। পরমুহূর্তে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সামুয়েল।

সা-মু-য়ে-ল! আলবার্তো হতবাক্। মাঝিমাল্লা থেকে যারাই সেখানে ভিড় করেছিল হতবাক তারা সবাই। ভয়ে এবং হতাশায় সামুয়েলের মুখ ফ্যাকাশে।

আলবার্তোকে দেখে মনে হলো বুঝি তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েন। অবস্থাটা সামলে নেবার চেষ্টা করলাম আমি। দ্রুত তার সঙ্গে করমর্দন করে বললাম, আমাকে হয়ত চিনতে পেরেছ সামুয়েল, সেই মাদ্রিদে একবার দেখা হয়েছিল।

ডঃ বাসু। মৃদু উত্তর দিলো সামুয়েল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপাততঃ তুমি বিশ্রাম কর। তারপর তোমার কথা আমরা শুনবো এখন, কেমন? বলেই তাকে নিয়ে আমার কেবিনে চলে এলাম।

তাকে কেবিনে রেখে বাইরে আসতেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে হাজির হলেন আলবার্তো। কী ব্যাপার, ডঃ বাসু। তাঁর জিজ্ঞাসা।

ফাঁদ। আমার উত্তর।

ফাঁদে মানে?

শুনুন, সিনর গতকাল যখন সমুদ্রের নিচের ওই গহ্বর থেকে বুদ্‌বুদ্ বেরুতে দেখেছিলাম, তখনই আমার মনে সন্দেহ জাগে। লুই যখন বললেন, এর আগে ওই

রকম বুদ্বুদ এখানে তিনি দেখেন নি, তখন কেন যেন হঠাৎ আমার মনে হল, এর মধ্যে মানুষের হাত আছে। তারপর আপনার মুখেই শুনলাম সামুয়েলের কথা। আপনি বললেন, সামুয়েল পলের সঙ্গে চলে গেছে। পল আপনার ব্যবসার প্রতিপক্ষ। শত্রু। আমার সন্দেহ আরও বাড়লো। তারপর সাগরের বুকে দেখলাম পলের লঞ্চ। সেই লঞ্চে তোলা হলো ব্যাথাইস্ফিয়ার। আর সেই জায়গা থেকেই ব্যাথাইস্ফিয়ারটিকে লঞ্চে তোলা হল যার নিচে সেই ডুবো পাহাড়ের গহ্বর। আমার সন্দেহ এবার বাড়লো। তা হলে কিছুক্ষণ আগে যে ডুবো পাহাড়ের গহ্বর থেকে বুদ্‌বুদ্‌ বের হতে দেখলাম সেই বুদ্‌বুদ্‌ কি ওই ব্যাথাইস্ফিয়ার থেকে বেরিয়ে এসেছিল? অর্থাৎ তার মধ্যে নিশ্চয় কোন মানুষ ছিল। ব্যাথাইস্ফিয়ারের বিষাক্ত গ্যাস (শ্বাস প্রশ্বাসের দরুণ যা জমতে পারে) ছেড়ে দেওয়ার দরুণই ওই বুদ্‌বুদ্‌ দেখেছিলাম আমি।

তারপর? আলবার্তোর জিজ্ঞাসা।

সামুয়েলকে আমি জানতাম। গত কয়েক বছর ধরেই হাঙর নিয়ে সে নানা রকম গবেষণা চালিয়ে আসছে। আপনারা হয়ত জানেন না, জলের কোন জায়গায় যদি কৃত্রিম উপায়ে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করা যায়, হাঙরের ঝাঁক সেই ক্ষেত্রের দিকে ধেয়ে যায়। সামুয়েল এই নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা করেছে। আর হাঙরগুলিকে আপনার বঁড়শির কাছ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে এই পদ্ধতিই কাজে লাগিয়েছে সামুয়েল। জলের নিচে ওই যে কেবল দেখলেন, তাঁদের মাঝখানে ফাঁক। ওরা হলো ইলেকট্রোড। যে বাক্সগুলি দেখলেন, ওগুলি ব্যাটারী। ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে ওই ইলেকট্রোডের সাহায্যে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরির ব্যবস্থা করেছিল সামুয়েল। যে মুহূর্তে হাঙরের দল আপনার বঁড়শির সামনে হাজির হতো, সে ওই ব্যাটারী চালিয়ে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি করত। আর তার আকর্ষণে হাঙরগুলি তার দিকে ছুটে যেত। ঠিক কখন ব্যাটারী চালু করতে হবে, সমুদ্রের উপর থেকে আপনাদের ব্যবস্থাপনা দেখে নির্দেশ পাঠাতো পল। পলের লঞ্চের সঙ্গে জোড়া থাকত কাছি। সেই কাছি দিয়ে ব্যাথাইস্ফিয়ারে করে সামুয়েলকে গহ্বরের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হত। কাছির সঙ্গে জোড়া তার। সেই তারের ভেতর দিয়েই টেলিফোনের সাহায্যে পল যোগাযোগ রাখত সামুয়েলের সঙ্গে।

আপনি কি আগে বুঝতে পেরেছিলেন এমন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে ? লুই প্রশ্ন করলেন।

প্রথমে ছিল অনুমান। পরে আমার অনুমান প্রমাণিত হল, যখন দেখলাম, আমার হাতের ম্যাগনেটোমিটার চঞ্চল হয়েছে। আশপাশে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটলেই চৌম্বক যন্ত্র সাড়া দেয়। এতো জানেনই আপনি। আমার উত্তর।

বুঝতে পারছি, সামুয়েলকে এ সব কাজে পলের মাস্লিকই সাহায্য করেছে। কিন্তু একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না, ডঃ বাসু—সামুয়েলের মত অমন ভাল ছেলে এ ভাবে আমার ক্ষতি করতে গেল কেন ? ওকে আমি ছেলের মত ভালবেসেছিলাম, ডঃ বাসু। আলবার্তো কেঁদে ফেললেন যেন।

বলতে কী, ব্যাপারটা আমার কাছেও অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। কারণ যতটুকু আমি জানতাম, সামুয়েল অত্যন্ত সরল ছেলে।

সেদিন ব্রেকফাস্টের সময় হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো সামুয়েল। আলবার্তোর হাত জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না। বললো, পলের বদ্ মতলবটা আমি বুঝতে পারিনি, সিনর কারডিনি। আসলে ব্যাপারটা হল—বিশ্বাস করুন। হাঙ্গর নিয়ে আমি কাজ কারবার তো এই প্রথম করছি না ? ওদের চালচলন সবই আমার জানা। আপনিও দেখেছেন, কত ভাবেই না আপনাকে ওদের ধরার ব্যাপারে সাহায্য করেছি। কিন্তু কী বলবো আপনাকে—আপনার এই জাহাজে কাজ করতে এসে কেমন যেন আমি হয়ে গেলাম। দেখতাম হাজার হাজার জ্যান্ত হাঙ্গর আপনারা ডেকের উপর টেনে তুলছেন। উঃ! কী চমৎকার তাদের চেহারা। কত পৌরুষ তাদের ভাবভঙ্গীতে। ক্রমে হাঙ্গরের উপর আমার কেমন যেন মমতা হতে শুরু করলো। চোখের সামনে আপনারা তাদের হত্যা করছেন, তাদের মাংস ছাড়াচ্ছেন, তেল বের করছেন—দিনের পর দিন এ সব দেখতে দেখতে আমার প্রায় পাগল হওয়ার মত অবস্থা। না, এ সব কথা কোন দিনই আপনাকে বলি নি। শুধু নিজের মনেই গুমড়ে গুমড়ে মরেছি, আর ভেবেছি, প্রকৃতির এমন প্রাণীকে এমন ভাবে হত্যা করার অধিকার মানুষের থাকা উচিত নয়। কী করে এদের হত্যা বন্ধ করা যায়—শেষ পর্যন্ত আমি ভাবতে বসলাম। সিসিলিতে একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পলের সঙ্গে। পল আমার কথা শুনে বললো, সে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে। বললো, সেও হাঙ্গরকে ভালবাসে। তখন বুঝি নি, সে একজন আস্ত প্রতারক। এরপর কী আমি করেছি, ডঃ বাসু, সবই তো আপনি জানেন। আপনাকেও ধন্যবাদ! একজন প্রতারকের হাত থেকে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। সামুয়েল তার কথা শেষ করলো।

তোমার জন্যে আমি দুঃখিত, সামুয়েল। স্নেহবিজড়িত কণ্ঠে বললেন আলবার্তো। আর মনে মনে আমি ভাবলাম, এমন পাগলও দুনিয়ায় আছে ?

আমার পড়াশোনা

তমোঘ্ন চট্টোপাধ্যায়

"The onward march of civilization would have been in static position, if not science ushered an era of man's triumph over nature"—এই উক্তির মধ্য দিয়েই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে সভ্যতার যে বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ, তার মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। সে উৎস হলো বিজ্ঞানের অসংখ্য আবিষ্কার, অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা এবং অফুরন্ত সম্ভাবনা। মানব সভ্যতা তার প্রায়ান্ধকার আলোছায়াময় প্রারম্ভ থেকে উজ্জ্বল পূর্ণতার দিকে নিরন্তর যাত্রা করে চলেছে বিজ্ঞানেরই অজস্র অবদানে পুষ্ট হয়ে। তাই, আজকের এই গতিময় বিশ্বে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গেও যেন বিজ্ঞান জড়িত। বিজ্ঞান-বর্জিত মানবসভ্যতার অসহায়, করুণ, প্রকৃতিনির্ভর, দৈববশ রূপটি কল্পনা করাও আজ ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। তাই মানবসভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান বা জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের নিবিড় ও অতিপ্রত্যক্ষ সংযোগ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতার জন্যই বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রায় প্রারম্ভ থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়।

বিদ্যায়তনে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন আজ সর্বজন-স্বীকৃত। বিদ্যালয় জীবনের শেষে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও বিজ্ঞানের জ্ঞানার ওপর পরীক্ষা নেওয়া হয়। একজন ছাত্রের মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান বিষয়ে কিরকম ভাবে পড়া উচিত, সে বিষয়ে সর্বজন স্বীকৃত বা সর্বজন-প্রযুক্ত কোনো নির্দেশ দেওয়া সম্ভবপর নয়, তবে এক্ষেত্রে আমি আমার নিজের অনুসৃত পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পারি। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে কটি বিষয়ের উপর আমি গুরুত্ব দিয়েছি তার মধ্যে প্রথমত—পাঠ্যপুস্তক কিছু উচ্চমানের রেফারেন্স পুস্তক নির্বাচন ও পঠনপাঠন এবং দ্বিতীয়ত, সংগৃহীত পুস্তকের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বহুতথ্যসমৃদ্ধ নোট প্রস্তুতি। নোট প্রধানত বিষয় (টপিক) অনুসারেই প্রস্তুত করা উচিত। প্রশ্নানুসারে নয়। কারণ

এক একটি বিষয়ের উপর বিষয়ভিত্তিক নোট প্রস্তুত থাকলে, সেটিকে অবলম্বন করেই একাধিক প্রশ্নের উত্তর করা যায়। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে গেলে একই বিষয়ের উপর অফুরন্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তাই সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে টিপিক অনুসারে নোট প্রস্তুতিই পরিশ্রমের দিক দিয়ে সুবিধাজনক বলে আমার বিশ্বাস। তৃতীয়ত—সমগ্র পাঠক্রমের উপর নোট লেখা সম্ভবপর না হলেও অন্তত: গুরুত্বপূর্ণ ও নির্বাচিত বিষয়গুলির উপরই নোট প্রস্তুত করা উচিত। চতুর্থত—বহু পুস্তক থেকে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ নিয়ে প্রস্তুত নোটটি মাননীয় শিক্ষক মহাশয়দের দিয়ে সংশোধন করিয়ে নেওয়া দরকার। পঞ্চমত—সব কিছুর উপর নোট প্রস্তুত না করলেও পাঠক্রমের কোনো অংশই যেন অপঠিত বা অপ্রস্তুত না থাকে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো অংশই বাদ দেওয়া উচিত নয় এবং প্রতিটি অংশই যথাসম্ভব বিস্তৃতিতে ও গভীরতায় পঠিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ষষ্ঠত—উপযুক্ত পঠনপাঠনের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা দরকার এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মুখস্থবিদ্যা পরিত্যাগ করে পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে বিষয়টি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সপ্তমত—এইভাবে বিষয় সম্পূর্ণ আয়ত্তে এলে তার উপর টেস্ট পেপার থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে এবং উত্তর সবসময়েই লিখতে হবে ঘড়ির সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে। অষ্টমত—বিজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর করার ব্যাপারে প্রশ্নের সাথে সম্ভব হলেই ছবি আঁকার দরকার বলে মনে হয়, তা প্রশ্নে ছবি চাওয়া হোক বা না হোক। মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ হবে তখনই যখন তাতে থাকবে নির্ভুল তথ্য, যথাযথ প্রকাশ এবং তথ্যকে পরিস্ফুট করার উপযোগী চিত্রের সুসমঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার। সর্বোপরি, বিজ্ঞান শিক্ষাকে শুধু মাত্র পুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখা অনুচিত। বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান-যাদুঘর, বিজ্ঞান পত্রিকার সাথে যোগাযোগ থাকা চাই। এ ছাড়া প্রয়োজন গ্রন্থাগারের সহযোগিতা ও পরীক্ষাগারে হাতেকলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন। এইসব সম্ভব হলেই ছাত্রছাত্রীর বিজ্ঞান শিক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে।

মোটামুটি ভাবে এই ছিলো আমার বিজ্ঞান পড়ার পদ্ধতি। তবে আবারও বলি, প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব প্রবণতা ও স্বতন্ত্র মানসিকতা আছে। তাই আমার অনুসৃত পন্থাই যে সঠিক বা সবার কাছেই ফলপ্রসূ হবে, সে কথা বলার কোনো অধিকারই আমার নেই। আমি শুধু বললাম আমার অভিজ্ঞতার কথা। এই পদ্ধতিতে যদি কারও উপকার হয়, তবে তা আমার সৌভাগ্য এবং যারা এই পদ্ধতিতে পড়াশোনার পক্ষপাতী নন তারাও নিশ্চয়ই তাদের নিজ নিজ মানস প্রবণতা অনুযায়ী প্রস্তুত হবেন ও সাফল্যলাভ করবেন—এই শুভেচ্ছাই জ্ঞাপন করলাম।

নীল মানুষ

মোহিত রায়

নীল শিয়ালের গল্প কে না জানে? কিন্তু নীল মানুষের কথা?

মানুষের গায়ের রং সাধারণত হয় সাদা, কালো, হলদে ও তামাটে।

আজগুবি নয়—আজব দুনিয়ার এমন মানুষও আছে—যাদের গায়ের রং নীল।

আফরিকা মহাদেশের সাহারা মরুভূমি। তার মরুদ্যানে বাস করে বেদুইন বাগুইশাট পাহাড়ী উপজাতি। তারাই নীল মানুষ! হারিয়ে যাওয়া মহাদেশ আটলান্টিসের শেষ অধিবাসী বলে নীলমানুষদের অনেকে মনে করেন।

বিচিত্র তাদের জীবন। কিন্তু এদের গায়ের রঙ নীল কেন?—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও মেলেনি তবে গবেষণা চলেছে নিরন্তর।

খুব ছোটবেলা থেকেই এরা আলখাল্লা ধরনের ঢিলা পোশাক পরে, গাঢ় নীল রঙের পোশাক। এই পোশাক তাদের গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে মিশে থাকে। মেয়েরা মুখে নীল উলকি কাটে। মজার কথা হল যে ছেলেরা পর্দানশীন, মেয়েরা নয়। সবকিছুর উত্তরাধিকার পায় মেয়েরা। এক কথায় সেখানে মেয়েদেরই রাজত্ব।

কিন্তু, মেয়েদের বাধ্য হলেও ছেলেরা খুব দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক। সারা সাহারা অঞ্চলে তারা ত্রাস বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে। আফরিকার কালো মানুষেরা নীল মানুষদের দৌরাত্ম্যে তাদের ভয়ের চোখে দেখে! নীল মানুষেরা নৃশংস লুঠতরাজ অত্যাচার করে। মানুষকে খুন করতে তাদের এতটুকু দ্বিধা নেই। গৃহপালিত পশু তাদের আছে, সেগুলি তারা বেচাকেনাও করে। প্রত্যেক পরিবারে গড়ে দশটি করে গরু আছে। অনেকে আবার লবণের ব্যবসাও করে।

মরককো ও আলজেরিয়ার দক্ষিণে তিনলক্ষ ও মালিতে দুলক্ষ নীলমানুষ বাস করে।

নীল মানুষের হাতে এখন বন্দুক আর পাইপগান এসে গেছে। এছাড়া, নানা ধারালো অস্ত্র তো আছেই। আর আছে বিষ মাখানো তীর। দেহে বিঁধলেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু! উটের পিঠে তারা চড়ে বেড়ায়।

একবার মালি সরকার তাদের গবাদি পশুর উপর কর ধার্য করেছিলেন।

কর আর আদায় হয় না। কর আদায় করতে গিয়ে কেউ আর ফিরে আসে নি, সবাই নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়েছে তাদের হাতে। শেষে মালি সরকার নীল মানুষের উপর চালায় এক পরিকল্পিত সামরিক অভিযান। তারা পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে গেরিলা কায়দায় মালির সামরিক শিবিরগুলিতে আক্রমণ চালিয়ে নাজেহাল করে তুলল। বাধ্য হয়েই মালি সরকারকে পিছিয়ে আসতে হল।

নীল মানুষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হল আফরিকার আর এক দুর্ধর্ষ উপজাতি টাডজিকেট। তাদের সঙ্গে প্রায়ই নীল মানুষদের লড়াই হয়। নীল মানুষেরা হেরেও যায় মাঝে মাঝে।

মরককোর শহরে বন্দরে নীল মানুষদের দেখা যায়। তারা মরককোর মরুস্থান উপশহর জাগোবা আর গুনিমাইনেও বাস করে।

নীল মানুষদের উৎসব হল গুয়েদ্রা। প্রতি শনিবার রাতে নীল মানুষেরা উৎসব মেতে ওঠে। সামুদায়িক পানভোজনের পর মিলিত নাচের অনুষ্ঠান। মাদল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র সমবেতভাবে বাজিয়ে বিড়বিড় করে তারা গান করে, আনন্দ করে। এই গুয়েদ্রা উৎসবও পরিচালনা করে মেয়েরা।

বিজ্ঞান ভাবনা

সুশীলকুমার গুপ্ত

একদিকে কল্যাণ, আর দিকে ধ্বংস ;
বিজ্ঞানী হবে আজ কৃষ্ণ না কংস ?
গ্রহে গ্রহে রকেটের দুর্জ্জয় যাত্রা,
তবু বাড়ে অ্যাটমিক রণভয়মাত্রা !
বিজ্ঞান হাতিয়ার, মানুষের দখলে ;
রাখবে না মারবে তা ভেবে দেখ সকলে।
মন যদি ঠিক থাকে, বিজ্ঞান দৃষ্টি
সকল বাঁদর থেকে হবে শিবসৃষ্টি।

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনার

৫০ তম

গ্রন্থ

বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা
আপনি খসে, তাতেই মাটিকে করে
উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে সকলের
অজ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলো কেবলই
ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে
চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম
জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে
আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক
হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে
নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের
অকৃতার্থ করে রাখছে।...
আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা
বলা বাহুল্য। কিন্তু বাল্যকাল থেকে
বিজ্ঞানের রস-আস্বাদনেআমার
লোভের অন্ত ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর